কবি সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সারা দেশে এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আর সেই সুযোগে অর্ধসত্য এবং মিথ্যা তথ্যে পূর্ণ লেখায় বাংলা দেশের সাহিত্য প্রাঙ্গণও ভরে উঠছে। এই সমস্ত লেখার কিছু কিছু আমার হাতে এসেছে, কিছুটা বা অন্যের কাছে শুনেছি। কখনও দেখেছি কারুর কাছে সুকান্তর করুণ আবেদন—কবিতা লেখার জন্য কিছু কাগজ ভিক্ষা চাই। অথবা সুকান্তর তথাকথিত কোনো উপদেষ্টা পাড়াতুতো দাদার পরামর্শে সুকান্তর কোন কোন কবিতা রচনার কাহিনী। এর দ্বারা কেবল সুকান্তর স্মৃতিরই অবমাননা করা হচ্ছে না, সেই সঙ্গে তার দেশপ্রেম ও মানবিকচেতনাকে, সর্বোপরি তার কবি প্রতিভাকে যে হীন করা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। আরও দেখেছি আগাছার মত গজিয়ে ওঠা সুকান্তর মাতৃস্থানীয়া কিছু শুভানুধ্যায়ীকে যাঁরা বর্তমানে সুকান্তর দুঃখে তাঁদের নাক ও চোখের জলের সঙ্গম ঘটাচ্ছেন। এদের সঙ্গে সুকান্ত জীবিত অবস্থায় কোনো দিন কোনো কথা পর্যন্ত বলেছে কিনা আমার সন্দেহ। এ ছাড়া কত অগণিত তথাকথিত বন্ধু-বান্ধব এবং শুভার্থীর ছড়াছড়ি। এঁরা সব সুযোগ পেলেই কলম ধরেন সুকান্তর জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরতে। যে সব কবিতা আজ প্রকাশিত হয়ে গেছে সে সব নাকি কারো বাড়ীর বৈঠকখানায় কিংবা শোবার ঘরে অথবা চৌবাচ্চার গায়ে সুকান্ত স্বহস্তে লিখেছিল বলে এঁদের দাবী। কিন্তু মজার কথা এই সুকান্তর বইগুলো প্রকাশিত হবার আগে এঁদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। সুকান্তর জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত কত সভা-সমিতিতে দেখেছি এই সব সুকান্ত-প্রেমীদের মিথ্যা তথ্যের জাল বোনা। সুকান্তর জীবন-দর্শনকে বিকৃত করে বেনামীতে ছায়াছবিও তৈরী হয়েছে। (শুনছি ইদানীং আমার বেনামেও সুকান্তর ওপর একটা বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে)। ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে এই কারণে যে সুকান্ত-স্মৃতি বিষয়ক সংকলনগুলিতে নানা অসত্যের সঙ্গে সুকান্তর সত্যিকারের সুহৃদ্ ও ঘনিষ্ঠদের তথ্যনিষ্ঠ লেখাও আছে। অথচ তার ফলে সেগুলিও অসত্য বলেই মনে হচ্ছে।

এই সব দেখে দেখে অসহ্য বেদনা বোধ করেছি। আমি জানি না সভ্য সমাজে কি রীতি আছে এই মিথ্যার প্রতিবাদ করার। ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় স্বজন ও সুকান্তর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গেও এ নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে। এই সব আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে এ ক্ষেত্রে একমাত্র সত্যতথ্যের পরিবেশন করেই মিথ্যাকে বিনাশ করা যেতে পারে।

তাই আমি কলম ধরেছি। সুকান্তর ব্যক্তিগত জীবনের কথা আমি লিখেছি। আমি সাহিত্যিক নই, তবুও নিরুপায় হয়েই কলম ধরতে বাধ্য হয়েছি। আজ পঁচিশ বছর পরে সুকান্তর কথা লিখতে বসা একটু অস্বাভাবিক বৈকি। কিন্তু কি করব? এখনও যদি আগাছার জঙ্গলে কোদাল না চালাই তবে আর কারো কাছে না হোক নিজের বিবেকের কাছে, সুকান্তর অন্যান্য অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে, বিশেষ করে বিমল ভট্টাচার্য (খোকন মামা), রমেন ভট্টাচার্য (ঘেলু), রমা চক্রবর্তী (রমা), মনোজ ভট্টাচার্য (নতেদা), রাখাল ভট্টাচার্য (মেজদা), সুশীল ভট্টাচার্য (সুশীলদা), অরুণাচল বসু প্রমুখের কাছে অপরাধী হব নিশ্চয়ই। আজ বেশ কয়েক বছর ধরে এঁদের অনেকেই আমাকে প্রতিনিয়ত আমার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আর তাই অন্তত এঁদের উপরোধ অনুরোধ ঠেলতে না পেরে এই কর্মে ব্রতী হয়েছি।

কর্ম-জীবনে আমি ব্যাংক-কর্মী, বাংলা ভাষা থেকে বহু দূর দিয়ে আমার আনাগোনা। তাই লেখাটি কতখানি সুখপাঠ্য হয়েছে তা জানি না। তবে বইটি প্রামাণিক তথ্য সমৃদ্ধ এই দাবী আমি করতে পারি।

কলম ধরেই প্রথম যাঁর কথা মনে হয়েছে তিনি হলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়; কারণ তিনি 'সুকান্ত-সমগ্র' পুস্তকের ভূমিকায় আহ্বান জানিয়েছিলেন' সুকান্তর বন্ধু-বান্ধবদের তার পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাহিনী প্রকাশে অগ্রণী হতে। তা ছাড়া এ স্বীকৃতি জানাতেও আমি ইচ্ছুক যে সুকান্ত প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের, বিশেষ করে অরুণাচল বসু ও অশোক ভট্টাচার্যের রচনা আমার স্মৃতিকে জাগরূক করতে সাহায্য করেছে। এ ছাড়া এই পুস্তক রচনায় যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং প্রেরণা লাভ করেছি তাঁদের নাম উল্লেখ করা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। তাঁরা হলেন স্নেহভাজন কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ফণি কর। পাণ্ডুলিপি

সম্পূর্ণ করার কাজে অরূপ রায় সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া উল্লেখ করবো আমার স্ত্রী শীলার কথা। সে আমার মত মজলিশপ্রিয় মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে এই কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে না দিলে এ কাজ সম্পূর্ণ হত কিনা সন্দেহ। তবু বলে রাখি, কুঁড়েমী আর আড্ডার নেশায় এই বইটি লিখতে আমার দু-বছর সময় লেগেছে।

গত পঁচিশ বছর ধরে সারস্বত লাইব্রেরী সুকান্তর সাহিত্যকে প্রচার করে আসছে। তাই তার পক্ষ থেকে সুকান্তর অনুজেরা আমার বইটি সাগ্রহে প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। বইটি প্রকাশে বাণী বসু যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

আমার অনুমান আমার এই রচনা পড়ে অনেকেরই এমন সমসাময়িক বহু ঘটনার কথা মনে পড়বে। তাই সুকান্তর অন্তরঙ্গ সবার কাছেই অনুরোধ রইল যদি কারোর কোনো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে তবে তাঁরা যেন সারস্বত লাইব্রেরীর ঠিকানায় অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়।

আমার লেখা অন্তরঙ্গ সুকান্ত প্রকাশিত হতে চলেছে। তাই স্বভাবতই আমি আনন্দিত। কিন্তু এ বই পড়ে বিশেষ আনন্দিত হতেন এমন কয়েকজন আমার রচনা চলাকালে এবং বই প্রকাশের সময় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই দুঃখ আমার মনে বারবার বাজছে। আমার মা স্বর্ণময়ী দেবী, নতুন-বৌদি রেণু দেবী (হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী), এবং আমাদের সকলের সেজদা ও সুকান্তর দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের মৃত্যু এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। তাছাড়া সুকান্তর ঘনিষ্ঠ এবং আমাদের সকলেরই পারিবারিক বন্ধু শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সমকালীন বিখ্যাত ছাত্র নেতা, সুকান্তর সহযোগী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের জীবনাবসানও সমান বেদনাদায়ক। এ সুযোগে আমি সকলের স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে জানাই, পাঠকদের সুবিধার জন্যে বইয়ের শেষে গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় ও বিস্তৃত চিত্র-পরিচিতি দেওয়া হল।

ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কথায় বলে, মামার শালা পিসের ভাই, তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। মামার শালার সঙ্গে যদিও আমার এখনও কোন সম্বন্ধ হয় নি, পিসের ভাই-এর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল আমার জন্মেরও বহু আগে। আমার পিসেমশায়ের ছোট ভাই আমার মেসোমশাই। অর্থাৎ সোজা কথায় স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং তাঁর ভ্রাতা স্বর্গত নিবারণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যথাক্রমে আমার পিতার এবং মাতার ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন। তাই এঁরা ছিলেন আমার পিসেমশাই এবং মেসোমশাই।

স্বর্গত নিবারণচন্দ্র ছিলেন কবি সুকান্তর পিতা এবং স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র তার জ্যেঠামশাই। সুকান্তর মা আমার সেজমাসীমা এবং তার জ্যেঠিমা আমার পিসিমা।

স্বর্গত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন আমার এবং সুকান্তর মাতামহ। তাঁর পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র। কন্যারা বড় এবং পুত্ররা ছোট। আমার মা তাঁর সবচেয়ে বড় মেয়ে এবং সুকান্তর মা স্বর্গতা সুনীতি দেবী তৃতীয় মেয়ে। বর্তমানে আমার মা এবং ছোট মাসীমা জীবিত আছেন। আমাদের মামা দুজন—বড়মামা এবং ছোটমামা। ছোটমামা খোকন (বিমল ভট্টাচার্য) আমাদের অর্থাৎ আমার ও সুকান্তর ছোটবেলার সব সময়ের সঙ্গী। আমরা মোটামুটি সমবয়সী, তাই পরস্পরের অতি কাছের মানুষ, প্রিয়বন্ধু। সুকান্তর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের সঙ্গে আমি এবং খোকন শৈশব থেকেই একাগ্রভাবে মিশে গিয়েছিলাম। সুখে দুঃখে, হাসি তামাশায়, কাজে-অকাজে, গল্পগুজবে আমরা কাটিয়েছি অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যা ও রাত্রি।

গত কুড়ি বাইশ বছর যাবৎ ভেবেছি সুকান্তর জীবন-কথা লিখব, কিন্তু নানা কাজে এবং অকাজে সময় চলে গেছে। স্মৃতি হয়েছে ক্ষীণ।

সু-কথা-১

থেকে ক্ষীণতর, কিন্তু কলম ধরা হয় নি। ভয় হয়েছে আশঙ্কা হয়েছে, ভেবেছি, আমাদের পরম প্রিয় সুকান্তর জীবন-কথা ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারব কিনা, স্পষ্ট করে তার জীবনের নানা ঘটনার কথা ফুটিয়ে তুলতে পারব কিনা। এ সম্বন্ধেও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ, যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। ভয় হয় পাছে তার পুণ্যকথা বিকৃত করে ফেলি। যাকে নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারি নি, তাকে কি অপরের কাছে ঠিকমত তুলে ধরতে পারব? কিন্তু আবার মনে হয়েছে, যদি এখনও আমার জানা এবং দেখা তার জীবনের বিচিত্র ঘটনার কথা না লিখি, কালে কালে তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। রামধনুর বৈচিত্র্যময় ছটার মতই যা একদিন আমাদের অন্তরে এনেছিল প্রবল আলোড়ন, তা অচিরেই মিলিয়ে যাবে ঘন মেঘের অন্ধকারে।

সে চলে গেছে, আমি রয়েছি স্মৃতি নিয়ে; কত কথাই না আজ আমার মনে ভিড় করছে। তাই কলম ধরেছি আমাদের প্রিয় বন্ধু সুকান্তর বৈচিত্র্যময় জীবন-কথা যা একদিন উল্কার মত দেখা দিয়ে চারিদিকে চমক সৃষ্টি করে আবার অকস্মাৎ মিলিয়ে গেছে—সেই কথা লেখার একান্ত আগ্রহে। মানুষ সুকান্ত কেমন ছিল তার পরিচয় হয়ত পাওয়া যাবে আমার এ রচনায়। বহুর কাছে সে ছিল কবি এবং অনেকের কাছে ছিল একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়, কিন্তু আমাদের কাছে সে ছিল আর পাঁচজনের মতই রক্তমাংসে গড়া এক কিশোর। তাই বলে কিন্তু সে সাধারণ একজন মানুষ ছিল না, আমাদের মধ্যেও সে ছিল এক পরম বিস্ময়।

॥ ২ ॥

কবি সুকান্তর জন্ম হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৩ সালে। জন্মস্থান ৪২, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, অর্থাৎ আমাদের মামার বাড়ী। কবির জন্ম-তারিখটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি মহর্ষি অরবিন্দের জন্ম-তারিখ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের

তারিখও ১৫ই আগস্ট। জন্ম-মাসটিও আর একটি কথা মনে করিয়ে দেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল এই মাসে। ভাবলে বিস্ময় লাগে কবিগুরুর জন্ম-মাস অর্থাৎ বৈশাখ মাসেই হয়েছিল কবি সুকান্তর মৃত্যু।

আমাদের মামাবাড়ী অর্থাৎ সুকান্তর জন্মস্থান ছিল ভারি মজাদার জায়গা। মামাবাড়ীর আবদার বলতে যা বোঝায় তা এখানে পুরোমাত্রায় বজায় ছিল! দুধভাতের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর, কারণ মামাবাড়ীতে গরু ছিল। ছিল না কিলচড়ের বালাই, আর মামী এসে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়াবার সম্ভাবনাও ছিল সুদূর পরাহত; কারণ মামারাও ছিল আমাদেরই সমবয়সী, তাই তাদের বিয়ে হতে অনেক দেরী। সেখানে ছিল শুধুই অনাবিল আনন্দের মেলা বা সব পেয়েছির আসর।

পিতামহ সতীশচন্দ্রের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। প্রায়ই তাঁর মেয়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঁচ ছ মাস পর্যন্ত কাটিয়ে আসতেন বাপের বাড়ীতে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা বজায় থাকায় মেয়েদের অর্থাৎ আমার মাসীদের শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে এতদিন পিত্রালয়ে থাকায় কোন অসুবিধে ছিল না। আমাদের জন্মের আগেই দুই মাসীর বিবাহ হয়েছিল। বাকী দুই মাসীর বিবাহ আমরা দেখেছি এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে বাঁধ ভাঙার আনন্দ উপভোগ করেছি।

যখন অন্যান্য মাসীরা আর তাদের ছেলেমেয়েরা মামাবাড়ীতে জড় হত তখন এই ৪২, মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ীতে আমাদের মনে কি যে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত তা বুঝিয়ে বলা কষ্টকর।

মামাবাড়ীর সঙ্গে সুকান্তরও স্বভাবতই ছিল নিকট সম্বন্ধ, যেমন ছিল আমাদেরও। আমাদের দাদামশায় ছিলেন আপাতগম্ভীর, কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর রসের ধারা। এই সরল সুন্দর মাটির মানুষটি বহুর কাছে হয়েছিলেন প্রতারিত, নষ্ট করেছিলেন অনেক অর্থ অনেকের কাজে, কিন্তু তিনি বিমুখ করেন নি কাউকে কখনও। তাঁর চেহারা ছিল অনেকটা মুনি ঋষিদের মতই। তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, সুগঠিত দেহ ও উজ্জ্বল চকচকে বড়বড় চোখ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুর মত। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিও ছিল ভারি সুন্দর।

কোন মজার কথা বলার সময় কথা শেষ হবার আগেই নিজে হেসে উঠতেন হো হো করে ! ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনীদের নিয়ে জমিয়ে গল্প করতে তিনি ভালবাসতেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। এনট্রান্স পাশ করার পরেও তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করেছেন। তাঁর ঘরে দেখেছি মোটা মোটা বহু ইংরেজি বই। বড় হয়ে জেনেছি, এর মধ্যে ছিল এক সেট বুক অব নলেজ আর মেন্টাল এফিসিয়েন্সি সিরিজের বই। এ ছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। মামাবাড়াতে দাদামশায়ের কেনা চেরোর বইও আমরা দেখেছি।

তিনি ছিলেন বাঙলার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বংশের সন্তান, যাঁদের আদি নিবাস পূর্ব বাঙলায়। কিন্তু দাদামশায় ছিলেন সমস্ত রকম গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বিরোধী। ব্রাহ্মণোচিত প্রাচীন সংস্কার এবং রীতিনীতির প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। আজও একটা কথা আমার মনে পড়ে। আমরা তখন সবিস্ময়ে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে দেখতাম যে, দাদামশায় রোজ সকালে একটা কাঁচা মুরগীর ডিম খান। এটা আমার এবং সুকান্তর কাছে ছিল পরম বিস্ময়। কারণ আজ থেকে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে আমাদের ঠাকুমা পিসিমা বা অন্যান্য গুরুজনের, যেমন আমার জ্যেঠামশাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, পিসেমশাই বা কবির পিতা নিবারণচন্দ্রের দৃষ্টিতে এটা ছিল নিশ্চয়ই অনাচার। তখনও আমাদের বা সুকান্তদের ঘরে পেঁয়াজ, মুরগীর ডিম বা মুরগীর মাংস ছিল নিষিদ্ধ বস্তু। তাই মামাবাড়ী এলে আমরা নিষিদ্ধ বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করে নিয়মের বেড়া ভাঙার আনন্দে অধীর হতাম। তৃপ্তিলাভ করতাম নতুনত্বের আস্বাদনে।

আমৃত্যু আমাদের দাদামশায় শরীরচর্চা করেছেন। এখনও মনে পড়ে তিনি প্রতিদিন সকালে প্রবল বেগে লাঠি ঘোরাতেন শরীর চর্চার অঙ্গ হিসেবে। আমরা তাঁর নাতি-নাতনীরা কিন্তু পারতাম না অমন প্রবল বেগে সুন্দর ভাবে লাঠি ঘোরাতে। এ ছাড়া ডন-বৈঠক দিতেন আর খালি হাতেও ব্যায়াম করতেন তিনি।

তিনি কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না।

নিয়মিত প্রতি শনিবারে আমাদের মামাবাড়ীতে ঘটা করে শনি ও সত্যনারায়ণের পূজো হত। তিনি সারাদিন উপবাস করে রাত্রে ফলাহার করতেন। এই মানুষের চরিত্রে দেখেছি অসাধারণ দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না।

আশ্চর্য! দাদামশাই রোদ্দুর দেখে মোটামুটি সময়টা বলতে পারতেন। তাই মামাবাড়ীতে কোন টেবিল ঘড়ি বা দেওয়াল ঘড়ি ছিল না।

দিদিমা ছিলেন আমাদের কল্পতরু। যে কোন আবদার তাঁর কাছে গ্রাহ্য ছিল। আমরা কখনও নিরাশ হই নি, আমাদের প্রার্থনা কখনও বিফল হয় নি তাঁর কাছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাঁর এই কল্পতরু স্বভাবের জন্যে তিনি দাদামশায় এবং তাঁর মেয়েদের কাছে তিরস্কৃত হতেন। আর তাতে রাগ হত আমাদের। তিনি অবশ্য এই সব তিরস্কার গ্রাহ্য না করে আমাদের আবদার হাসি মুখে সহ্য করতেন। নানা রকম খাবারওয়ালা ডাকতেন তিনি সবার অগোচরে। আমাদের পছন্দমত খাবার কিনে দিতেন আর বলতেন, মায়েদের যেন আমরা এ কথা না বলি। নিষেধের অবশ্য কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না আমরা এই গোপনীয়তার মূল্য বুঝতাম এবং এ কথা প্রকাশ হলে দিদিমা যে মৃদু তিরস্কৃত হতেন, তা আমাদের অনভিপ্রেত ছিল।

মামাবাড়ীর সামনে সহদেবের মিষ্টির দোকানের সঙ্গে মামাদের মাসকাবারী বন্দোবস্ত ছিল। অর্থাৎ খাতায় লিখে সহদেব মামাবাড়ীতে মিষ্টির যোগান দিত প্রয়োজন মত। আর দাম নিত মাসের শেষে হিসেব করে। দিদিমা গোপনে এই খাতাটা আমাদের হাতে তুলে দিতেন আর আমরা, মাসতুত ভাইবোনেরা দোকানে গিয়ে মনের আনন্দে পছন্দসই মিষ্টি খেয়ে আসতে পারতুম। মামারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত। যদি কখনও ধরা পড়ে যেতুম মা বা কোন মাসীর কাছে, তখন দিদিমার জন্যে আমাদের ভারি দুঃখ হত।

এখনকার মত কলকাতায় আগে এত ভিড় ছিল না; তাই দোকানের কেনাকাটাগুলো সাধারণত সকালে এবং সন্ধ্যায় হয়ে যেত। মনে হয়

মিষ্টিওয়ালা সহদেব এই সুযোগেই দুপুর বেলা ঘুমিয়ে নিত। তাই আমরা বলতাম, "তুমি দুপুরে দোকান খুলে রেখে ঘুমোও, যদি কেউ চুরি করে খেয়ে যায়?" ও হেসে বলত, "ঘুমুলেও আমি সব দেখতে পাই।" খোকন ও আমি ঠিক করলাম সহদেবের এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই একদিন দুপুর বেলা চুপিচুপি সহদেবের দোকানে গেলাম। সে তখন নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। আমরা চুপিচুপি খান দুই ছানারগজা তুলে নিলুম। কারণ ঐ মিষ্টির ওপরেই আমাদের লোভ ছিল বেশী। বিকেলে ওকে বললাম, "তুমি মোটেই ঘুমের মধ্যে দেখতে পাও না। কারণ আজকে আমরা তোমার খাবার চুরি করে খেয়েছি।" ও তখন জানতে চাইল আমরা কি কি মিষ্টি নিয়েছি। আমি আর খোকন গর্ব করে বেশ বাড়িয়ে 'নানা রকম মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে নিয়েছিলাম একথা বললাম এবং উপভোগ করলাম সহদেবের অসহায় অবস্থা। কিন্তু হায়! সহদেব প্রথম সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করল। সেই মাসকাবারী মিষ্টির খাতাখানা হাতে পডতেই ও লিখে রাখল এই সব দামী দামী মিষ্টির কথা। ফলে মাসকাবারে দাদামশাই এবং তাঁর মেয়েরা মনে করলেন এ মিষ্টি নিশ্চয়ই দিদিমা কিনে দিয়েছেন ছোটদের। এজন্য অকারণে দিদিমাকে তিরস্কৃত হতে হল। এ ব্যাপারে ভারি মন খারাপ হয়ে গেল আমাদের। আমার আর খোকনের অবস্থা তখন খুবই করুণ। না পারি সত্য প্রকাশ করতে, না পারি দিদিমাকে বাঁচাতে। দিদিমা আবার কানে খুব কম শোনেন। তাই এই সব আলোচনা তিনি জানতে পারলেন না। মাঝে মাঝে তাঁর মেয়েরা করছেন তাঁকে তিরস্কার। তিনি বুঝতেই পারলেন না কেন এই রাগারাগি। সুকান্ত পরে আমার আর খোকনের এই ঘটনা শুনে একাধারে যেমন মজা উপভোগ করেছিল, তেমনি দিদিমার অকারণ লাঞ্ছনায় হয়েছিল ব্যথিত।

আমাদের দিদিমার চরিত্রে ছিল অসাধারণ মাধুর্য। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন আন্তরিকভাবে। ছোট বড় উঁচুনিচু ভেদাভেদ ছিল না তাঁর কাছে। সবাইকে তিনি অন্তর দিয়ে কাছে টানতেন। পরের দুঃখে হতেন দুঃখী, পরের সুখে সুখী।

পরনিন্দা পরচর্চার আসরে তাঁকে পাওয়া যায় নি কখনও। তিনি ছিলেন নিন্দাস্তুতির বাইরে।

দেখা গেছে তিনি বহু সময় বাড়ীর ঝিয়ের বা ঘুঁটেওয়ালীর শিশু সন্তানের চোখ মুখ নাক নিজের আঁচল দিয়ে পরিস্কার করে দিচ্ছেন অসীম মমতায়, অথবা তাকে কোলে করে বসে আছেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। হয়ত কোন ভিখারিণী এসেছে, কোলে তার বাচ্চা। দিদিমাকে বলতে দেখা গেছে, "বাছা, তুমি এই বাচ্চা কোলে নিয়ে রোদে কষ্ট করে ঘুরবে? ওকে রেখে যাও। আমি স্নান করিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। তুমি ফিরতি পথে ওকে নিয়ে যেও।" এতে বাড়ীর অন্যান্যরা অসন্তুষ্ট হলেও অপরিবর্তনীয় ছিল আমাদের দিদিমার স্বভাব।

প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে তিনি সব সময় এগিয়ে যেতেন। গয়লা এসে দুধ দুয়ে গেলে দিদিমা সবার অগোচরে আঁচলের আড়ালে এক ঘটি দুধ নিয়ে পাড়ার কোন না কোন দুঃস্থ পরিবারকে দিয়ে আসতেন। অন্যান্য সময় কিছু না বললেও বাড়ীতে যখন নাতি-নাতনীর ভিড় লেগে থাকত, তখন কিন্তু এই দুধ বিলির ব্যাপারটা তাঁর মেয়েরা বা স্বামী পছন্দ করতেন না। কিন্তু বৃথা এ অসন্তুষ্টি। বাস্তবিক, এমন খাঁটি আর সংস্কারমুক্ত মানুষ বর্তমান যুগে বিরল।

আমাদের দাদামশাই দিদিমা ছিলেন আদর্শ দম্পতি। মামাবাড়ীর এই পরিবেশে সুকান্তর শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে—এ কথা মনে রাখলে সুকান্তর চরিত্রের মাধুর্য, তার সংস্কারমুক্ত মন এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। জানা যাবে সুকান্ত কোথায় পেল এমন উদারতা আর গোঁড়ামির-বাহুল্য-বর্জিত মমতায় ভরা মন। বোঝা যাবে সাধারণের প্রতি সেবার মনোভাব সে কেমন করে পেল। আমাদের মাতামহের স্বভাব ছিল একটু মুখচোরা অর্থাৎ অপরিচিত জায়গায় কথা বলতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। যেচে কারোর সঙ্গে আলাপ করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁর এই স্বভাব কবি সুকান্তর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। কবিও ছিল কিছুটা মুখচোরা, লাজুক।

।। ৩ ।।

আগেই বলেছি, মামাবাড়ী ছিল আমাদের কাছে অনাবিল আনন্দের মেলা। এখানে আমাদের দিনগুলি কাটত অসীম পরিতৃপ্তির মাঝে। কোন রকম নিয়ম বা নিষেধের বাধা না থাকায় আমরা ছিলাম ভারি খুশী। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আমাদের পছন্দমত। দাদামশাই বা দিদিমার মধ্যে কোন গোঁড়ামি বা সংস্কার না থাকায় আমরাও ছিলাম মুক্ত বিহঙ্গ। এ স্বাধীনতা আমাদের বাড়ীতে ছিল অকল্পনীয়। বাস্তবিক এমন আনন্দের মেলার কথা এখন যেন ভাবাই যায় না। দিদিমার সান্নিধ্য ছিল আমাদের পরম কাম্য এবং শুধু মামাবাড়ীতে বলেই নয়, আত্মীয় স্বজনের কোন উৎসবের বাড়ীতে তাঁর সান্নিধ্য ছিল বড়দের কাছেও পরম কাম্য। তিনি কানে খাট ছিলেন তাই তাঁর কানে কথা বলবার জন্যে কাজের বাড়ীতেও তাঁর মাথা নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। দিদিমার প্রতি আমাদের আকর্ষণের কারণ হল এই যে, তিনি পুরাণের গল্পগুলি বলতেন আমাদের কাছে ভারি সুন্দর সহজ করে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল ভারি মধুর। আমরা রস গ্রহণ করতাম অতি সহজেই। আমাদের ছোটমাসী ও তাঁর বন্ধুরা নানা রকম ব্রত পালন করতেন দিদিমার নির্দেশনায়। যেমন, পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল ইত্যাদি। এ ব্রতগুলো আমাদের কাছে বিশেষ আমোদের ব্যাপার ছিল। এর কিছু কিছু স্মৃতি আজও মনে পড়ে।

মামারা, তাদের বন্ধুরা এবং আমরা মাসতুত ভাই বোনেরা নানা রকম খেলায় মত্ত থাকতাম। আমরা যখন লাট্টু, গুলি, ঘুড়ি, ডাংগুলি, বাঘবন্দি, চোর-চোর খেলায় ব্যস্ত তখন কিন্তু সুকান্তকে দেখা যেত কোন গল্পের বই নিয়ে নিভৃতে বসে থাকতে। বাস্তবিক, ওর বই পড়ার নেশা ছিল প্রবল। যদিও আমরাও বই পড়তে ভালবাসতাম এবং হেমেন রায়ের যকের ধন, আবার যকের ধন ইত্যাদি বই পড়তাম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। ও কিন্তু পড়ত নানা রকম বিদেশী গল্পের অনুবাদ এবং অন্যান্য নানা রকমের বই। খেলাধূলার প্রতি ওর আগ্রহ ছিল বরাবরই কম। আমরা যখন বিমল কুমার

রামহরি বাঘা অথবা জয়ন্ত মানিক সুন্দরবাবু—এদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানায় উত্তেজিত হয়ে উঠতাম, ও তখন আমাদের সঙ্গে সে সব আলোচনায় যোগ দিলেও এ সব ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাত না। ও বই পড়ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, শেষ না করে উঠত না। পরবর্তীকালেও দেখেছি ওর পড়ার আগ্রহের হেরফের হয় নি। তবে বাছাই করে পড়াই ছিল ওর রীতি।

মাঝে মাঝে আমরা ছোটরা মামার বাড়ীতে নাটক অভিনয় করতাম। দর্শক আমরা ছোটরা, মা মাসীরা, তাঁদের বন্ধুরা এবং দিদিমা ও দাদামশাই। এ সব ব্যাপারে সুকান্তর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। সে নিজেই নাটক লিখত এবং পরিচালনার ভারও নিত। 'বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয়' নামে ও একটা নাটক লিখেছিল, অভিনয় হয়েছিল মামাবাড়ীতে। তখন ওর বয়স দশ এগারর বেশী নয়। এ ছাড়া আর একটা নাটকও লিখেছিল এবং অভিনয় হয়েছিল মামাবাড়ীতে। এটা সম্ভবত 'লঙ্কাকাণ্ড'। এই নাটকে সুকান্ত একাধিক ভূমিকায়, যেমন বিভীষণ হনুমান ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় করেছিল। হনুমানের লেজের পরিকল্পনা এবং তার হুপ হুপ নৃত্য—সবই ওর নিজস্ব সৃষ্টি। এই লঙ্কাকাণ্ড জমেছিল বেশ!

দাদামশাই দিদিমা এবং আমার মা'র উৎসাহে আমরা কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো, যেমন, যাদুঘর চিড়িয়াখানা ইত্যাদি দেখতে যেতাম দল বেঁধে। আমার দাদামশায়ের একখানা নিজস্ব নৌকো ছিল। মাঝে মাঝে সেই নৌকোয় চড়ে আমরা বহুদূর পর্যন্ত বেড়াতে যেতাম। ঢাকুরিয়া লেক তখন সবে তৈরী হচ্ছে। মনে পড়ে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে এই লেকের চারপাশে আমরা ঘুরতে যেতাম। কালীঘাটের মন্দিরেও আমরা যেতাম দিদিমা বা মাসীদের সঙ্গে। পাঁঠা বলির নিষ্ঠুরতা আমাদের শিশুমনকে পীড়ন করত। এ সব স্মৃতি আজও আমাকে উদ্বেল করে তোলে।

মামাবাড়ীর কথায় আমার উপনয়নের কথা মনে পড়ল। সালটা বোধ হয় ১৯৩৮-৩৯। এই সময় আমার উপনয়ন হয়। আমাদের বাড়ীর নিয়ম অনুসারে এগার দিন আমাকে দণ্ডীঘরে থাকতে হয়। এ সময়ে কোন শূদ্রের মুখ দেখা চলবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও কঠিন

নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। শুধু আতপ চালের ভাত, ঘি, দুধ আর সামান্য ফল—এই আমার খাদ্য। তাও একবেলা।

পোষাক ছিল গেরুয়া বসন ও উত্তরীয়। তার ওপর মুণ্ডিত মস্তক এবং হস্তে ভিক্ষার ঝুলিসহ বেলগাছের দণ্ড। খাওয়া-দাওয়ার সময় কথা বলা অত্যন্ত নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। আমি যখন দণ্ডীঘরে বন্দী অবস্থায় কাল কাটাচ্ছি এমন সময় শুভ সমাচার কানে এল, ছোটমাসীর বিবাহ স্থির হয়েছে এবং মামাবাড়ী যেতে হবে। অতএব সবার সঙ্গে আমিও যাত্রা করলুম মামাবাড়ীর উদ্দেশে গেরুয়া বসন ও দণ্ডীসহ। খোকন ত ওখানে আছেই, সুকান্তও জড়ো হবে। সুতরাং মজাটা জমবে ভাল। আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন ছিল বেশী, তাই ঘোড়ার গাড়ী এলো দরজায়। আমি যখন গেরুয়া বসনে দণ্ডীসহ গাড়ীতে উঠছি তখন ঘোড়াগাড়ীর মুসলমান গাড়োয়ান আমাকে তার অনভ্যস্ত চোখে লক্ষ্য করছিল। কারণ শূদ্রের মুখ যাতে না দেখতে হয় তাই মাথায় আমার ঘোমটাও ছিল। সে হয়ত ভাবছিল, এটা আবার কি বস্তু! আমিও তখন ঘোমটার আড়াল থেকে দেখছি গাড়োয়ান আমাকে দেখছে কি না। ঠিক এমনি সময় চারি চক্ষুর মিলন। এমন ঘটনা ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নি। মামাবাড়ী পৌঁছতে নয়া ব্রহ্মচারী ও মুসলমানের মধ্যে শুভদৃষ্টির গল্প শুনে সুকান্ত আর খোকন খুব একচোট হাসাহাসি করল।

রাত্রে যখন বিবাহের উৎসব জমে উঠেছে, লুচি লুচি, জল মিষ্টি ইত্যাদি ধ্বনিতে বাড়ী সরগরম, সে সময় দাদামশায়ের খাটের নীচে আমি বন্দী হয়ে রয়েছি। মা'র কঠিন নির্দেশ হাজার গণ্ডা লোকের সামনে আমি যেন বাইরে না আসি। মার আশঙ্কা আবার না কোন শূদ্রের মুখ দেখে ফেলি।

সন্ধ্যার কিছু পরে খোকন আর সুকান্ত এলো আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। বাড়ীর গুরুজনরা তখন ভারি ব্যস্ত। আমি বললাম, "হ্যাঁরে, মাসীর বিয়ের ভোজ থেকে কি আমি বঞ্চিত হব?" ওরা দুজনে একবাক্যে রায় দিল, "কখনই নয়।" অতএব ওরা খাবার নিয়ে এল—লুচি, সঙ্গে মাছ মাংস আর মিষ্টি। খাটের নিচে সবার অগোচরে ভোজন-পর্ব জমে উঠল। দীর্ঘদিন মাছ মাংস না খাওয়ায় আর বিশেষ করে ব্রহ্মচারী অবস্থায় মাছ-মাংসের স্বাদ

আমার বড় মধুর লাগল। সুকান্ত আমার সামনে বসে, "ওরে খা, খা, এটা খা, ওটা খা, মাংসটা আর একটু খা, না খেলে আমার মাথা খা," এই রকম কৃত্রিম যত্নে আর আদরে আমায় খাওয়াল। খোকন আর সুকান্ত এই কচি ব্রহ্মচারীর দফা রফা করে দিল এমনি পরম কৌতুক ভরে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে। আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে পেঁয়াজ, মুরগীর ডিম বা মুরগীর মাংস একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। উপনয়নেব আগের দিন খোকন প্রস্তাব করল, মুরগীটা আমার খাওয়া দরকার। এর আগে আমার মুরগীর মাংস চেখে দেখা হয় নি। তাই ও বলল যে, বলা যায় না জীবনে হয়ত আমার রামপাখি ভোজন হবে না ; কারণ ওর আশঙ্কা আমার পৈতের পরে আমার বাড়ীর গোঁড়ামি হয়ত বেড়ে যাবে। তাই ওর কথায় রাজী হলাম, বিশেষ করে খরচটা যখন ওর এবং আহ্বানটা যখন আন্তরিক। তাই খেলাম পরম তৃপ্তি ভরে রামপাখির ছানা।

আমাকে যখন খোকন আর সুকান্ত মাসীর বিয়ের লুচি আর মাংস পরম আদরে ভোজন করাচ্ছে তখন খোকনের মুখে আমার এই মুরগী ভোজনের কাহিনী শুনে আমার এই বাঁধ ভাঙার ব্যবস্থায় সুকান্ত খুবই কৌতুক অনুভব করল এবং হাসতে হাসতে আমাকে জানাল যে এ ব্যাপারে অনেক আগেই সে খোকনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

আমাদের এই আনন্দ-নিকেতন সুকান্তর জন্ম-স্থান ৪২, মহিম হালদার স্ট্রীটের দোতলা বাড়ীখানা আমাদের দাদামশাই বিক্রি করে দিলেন ১৯৪০ সালে। তখন হিটলারের জয়-জয়কার। যুদ্ধের হিড়িকে লোক চলে যাচ্ছে কলকাতার বাইরে। এই অনিশ্চিত অবস্থায় কলকাতার সম্পত্তি কিনবে কে ? তাই বাড়ীটির দাম মিলেছিল মাত্র দশ হাজার টাকা।

১৯৪৬ সালে অল্প কদিন রোগে ভোগার পর আমাদের দিদিমা পরলোকগমন করেন। এর আগেই অবশ্য আমাদের সেজমাসীমা এ সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। দাদামশায় ইহলোক ত্যাগ করলেন ১৯৪৯ সালের এক শীতের সকালে।

প্রথমে গেল বাড়ীখানা। তারপর একে একে দিদিমা দাদামশাই বিদায় নিলে মামাবাড়ীর সেই সুন্দর দিনগুলো হারিয়ে গেল।

আমার সেজমাসীমা সুনীতি দেবী সুকান্তর মাতা। দেবীর মত সুন্দর তাঁর দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা, মুখে মধুর হাসি। আমার মাসীমাদের মধ্যে সেজমাসীমাই ছিলেন সবচেয়ে বেশী ফর্সা। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও মধুরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল। রাণীর মত মাথা উঁচু করে তিনি চলতেন। তিনি ছিলেন দারুণ আত্মাভিমানী এবং তেজী। তাঁর গৃহে গেলে তাঁর কাজে কর্মে, সাজে পোষাকে এবং গৃহসজ্জায় সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যেমন নিজে থাকতে ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর ছেলেদেরও পোষাকে পরিচ্ছদে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা ছিল তাঁর স্বভাব।

একবার আমাদের সেজমেসোমশাই ছোটদের জন্য অতি সাধারণ কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ এনেছিলেন যা পরিমাণে ছিল প্রচুর। সেজমাসীমা রাগ করে সে পোষাক ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ. বাহুল্য নয়—সুন্দর অল্প পোষাকই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার তিনি সুকান্তর জন্য অতি সুন্দর একটা পোষাক কিনে এনেছিলেন বেশী দামে। সে পোষাকে সুকান্তকে মানিয়ে ছিল সুন্দর। তাঁর চরিত্রে এমন একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ছিল যা স্বভাবতই অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। এখনো মনে আছে, মামাবাড়ীর বারান্দায় তাঁকে দেখা যেত কিছুটা আপন মনে তিনি পায়চারী করছেন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। কিছুক্ষণ বাদেই যেন মনে হত তিনি অন্য জগতে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে বহুদূরে! এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে আমরা ছোটরা ভয় পেতাম।

আমার মাসীর সব গুণাগুণ মিশে গিয়েছিল কবির চরিত্রে। কিন্তু তবু ভাবি সে কদিনই বা তার মা'র সাহচর্য পেয়েছে। মাসীমার অকালমৃত্যুর কথাই আজ মনে পড়ে। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবির জীবন এত সংক্ষিপ্ত হত না।

ভাবলে অবাক লাগে মাত্র এগার বছর বয়সে মাসীমার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই অল্প বয়সেই তাঁর ব্যক্তিত্বের কী বিকাশ!

একদিকে যেমন তাঁর ছিল তেজ আর নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, অপরদিকে তেমনই ছিল দারুণ হৃদয়াবেগ এবং ন্যায়বিচারবোধ। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল। রাত্রিবেলা কালীঘাটে মামাবাড়ীতে আমরা কয়েকটি মাসতুত ভাইবোন ঘরের আলো নিভিয়ে গল্পে খুব মেতে উঠেছি আর সেজমাসীমা তখন অন্য ঘর থেকে তাঁর বড়ছেলে সুশীলকে ডাকছেন বারবার কি একটা কাজে। কিন্তু গল্পে আমরা সবাই এত মশগুল যে, সে ডাক শোনবার অবকাশ আমাদের কোথায়। সেজমাসীমা তাই রাগ করে অন্ধকার ঘরে ঢুকে মারলেন এক চড় সুশীলের পিঠে। কিন্তু চড় খেয়ে কেঁদে উঠল সুশীল নয়, আমার মেজদাদা হীরেন। সেজমাসীমা হতভম্ব। মজা হয়েছে এই, অন্ধকারে মাসীমা সুশীলের বদলে মেরেছেন হীরেনকে—ভুল হয়েছে সুশীলের অবস্থান স্থির করতে। সুশীলদা তখন খুব হাসছে, আর হাসছে বাড়ীর আর সবাই। এদিকে সেজমাসীমার আপসোসের শেষ নেই। ভুল করে বিনা কারণে অপরকে শাস্তি দিয়েছেন বলে তাঁর মনে ভারী দুঃখ—তাই হীরেনকে দিলেন একটা টাকা। আমাদের ছোটদের মহলে তখন দারুণ উত্তেজনা। সবাই ব্যাপারটা উপভোগ করছি, আলোচনা করছি, হাত ফসকে যদি চড়টা আমাদের কারোর পিঠে পড়ত তবে আমাদের কপালে ঘটত অর্থলাভ।

সেজমাসীমা তখন হরমোহন ঘোষ লেনের ৫৫নং বাড়ীতে বাস করছেন। আমি গেলাম মাসীর বাড়ী বেড়াতে। সুকান্ত বলল, "মা, ভূপেন আলু-পোস্ত খেতে ভালবাসে, ওর জন্য চাই সে ব্যবস্থা।" মাসীমা যখন আমাদের খেতে দিলেন তখন ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে আমার ত চক্ষুস্থির। যতখানি ভাত দেওয়া হয়েছে আলু-পোস্ত দেওয়া হয়েছে তার সমান। আমি যত বলি, "এতখানি পোস্ত খাব কেমন করে?" মাসীমা বলেন, "আহা, তুই যখন ভালবাসিস তখন খেয়ে নে না।" সুকান্ত আন্তরিক আগ্রহে আমাকে উৎসাহ দেয় "খা খা"। সে এক মনোরম সুন্দর পরিবেশ। এ সব স্মৃতি এখনও আমাকে মাঝে মাঝে আনমনা করে তোলে।

লেখাপড়ার প্রতিও সেজমাসীমার আগ্রহের শেষ ছিল না। গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি বই পড়া তাঁর নিত্যকার কাজ ছিল। বাড়ীতে

ছিল কাশীরাম দাসের একখানা পূর্ণাঙ্গ মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সব কাজের অবসরে তিনি মাঝে মাঝে বই নিয়ে বসতেন। সুর করে পড়তেন, আমরা গোল হয়ে বসে শুনতাম—বেশ ভাল লাগত।

সেজমাসীমা ছিলেন অল্পেই তুষ্ট এবং সব ব্যাপারেই ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। খাওয়া-দাওয়া, বেড়ান এবং নানা রকম বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী। তাঁর কেমন সংশয় হয়েছিল তাঁর ছেলেদের লেখাপড়া হবে না। এই নিয়ে তাঁর আশঙ্কার অবধি ছিল না। তাঁর বড় ছেলে সুশীল যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করল তখন সেজমাসীমার আনন্দের সীমা ছিল না। আজ ভাবলে দুঃখ লাগে, তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখেছে ভাল করেই, আর তাঁর মেজ ছেলে সুকান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পেয়েছে প্রতিষ্ঠা—এ সব তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

সেজমাসীমার সস্নেহ প্রশ্রয়ে আমি আর সুকান্ত সাইকেল ভাড়া করে হরমোহন ঘোষ লেনে চড়ে বেড়াতাম। সুকান্ত দু-চাকার সাইকেল তখনও চালাতে শেখে নি, তাই তিন-চাকার সাইকেল চালাত। আমাকে মাসীমা ঘুড়ি সুতো কিনে দিয়েছিলেন ও-সব আমার ভাল লাগে বলে। একদিন যখন আমার ঘুড়ি কেটে গেল, সুকান্ত তখন হো হো করে হাসছে। মাসীমা তখন আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই বলে, যে ঘুড়ি আমায় কেটে দিয়ে গেল তার মালিক নিশ্চয়ই আমার থেকে অনেক বড়।

হরমোহন ঘোষ লেনের এই বাড়ীর দোতলায় থাকত ছোটছোট তিনটি ছেলে—আমাদের সমবয়সী। তারা তিন ভাই। সুকান্ত তাদের নাম দিয়েছিল—'বিল্বপত্র', কখনও বা বলত 'ত্রিশূল'। আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল, শিবের মাথায় সংযুক্ত তিনটি বেলপাতা দিতে হয়। তিনটি বেলপাতা যেমন একসঙ্গে থাকে এরাও তেমনই একই সঙ্গে ঘোরাফেরা করে—তাই ওরা বিল্বপত্র। ত্রিশূলের তিনটি মাথার মত ওরা তিনটি ভাই, তাই ওরা ত্রিশূল। এদের সঙ্গে সুকান্তর সদ্ভাব ছিল না, দু-একবার মারামারিও হয়ে গিয়েছিল।

সুকান্ত তাই বড় গলায় বলেছিল, বাগবাজারে তার বড়মাসীর ছেলে ভূপেন থাকে। সে এলে এদের তিন ভাইকে মেরে শেষ করে

দেবে। আমি মাসীর বাড়ী আসতেই আমায় সুকান্ত সে কথা বলল এবং বাগবাজারের সুনাম রাখার গুরুদায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিল। অগত্যা আমাকে এগিয়ে গিয়ে মারামারি করতে হল। একদিকে তারা তিনজন আর অপর দিকে আমি ও সুকান্ত। বিশেষ কোন মীমাংসা হাওয়ার আগেই অবশ্য সেজমাসীমার হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা মিটে গেল। আমি যে বিশেষ বীরত্ব দেখাতে পেরেছি এমন বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সুকান্ত আমার প্রশংসা করল প্রচুর এবং বলল, এখন থেকে আমার নাম করলেই নাকি ওরা ভয় পেয়ে যাবে। আমার মনে অবশ্য অতখানি ভরসা ছিল না।

।। ৫ ।।

সুকান্তর পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ত্রিশ বছর বয়সে প্রথমা পত্নী বিয়োগে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন আমার সেজমাসীমা সুনীতি দেবীকে। তখন তাঁর একমাত্র পুত্র মনমোহন ভট্টাচার্য বর্তমান। আমার সেজ-মাসীমার ছয় পুত্র—সুশীল, সুকান্ত, প্রশান্ত, বিভাস, অশোক এবং অমিয়। নিবারণচন্দ্র ছিলেন আপাতগম্ভীর, কিন্তু রসিক এবং সৌখীন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, সাহসী, সৎ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী। স্বল্পভাষী এই মানুষটি ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান। তাঁকে বুঝে ওঠা ছিল কঠিন। তিনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। যজনযাজন এবং পূজার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিও ছিল অসাধারণ। স্পষ্ট কথাকে গল্পের মাধ্যমে ঘুরিয়ে বলতেন, সোজাসুজি আঘাত দিয়ে কথা বলা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর মনটি ছিল কোমল ও স্নেহশীল এবং ব্যবহারিক জীবনে তাঁর ছিল দৃঢ়তা।

তাঁর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি। একবার তাঁর কাছ থেকে জোর করে কোন এক দুর্বৃত্ত টাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি ছোরার আঘাতে আহত হয়েও আত্মরক্ষা করেছিলেন। পরে সেই দুর্বৃত্ত ধরা পড়ে। মেসোমশায়কে সনাক্ত করার জন্য ডাকা হলে তিনি বলেন, "ও যখন আমার

কোন ক্ষতি করতে পারে নি, তখন ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক।" আর একবার আমার দাদা শৈলেন ভট্টাচার্য ফুলবাগানের মুসলমান বস্তির সামনে একটা ছোট মুসলমান ছেলেকে সাইকেলে ধাক্কা দিয়েছিলেন। বর্তমানে নারকেল-ডাঙা ও ফুলবাগান দেখে আগেকার মুসলমান বস্তী পরিপূর্ণ ফুলবাগানের কল্পনা করা দুষ্কর। তখন এখানে ছিল বিরাট মুসলমান বসতি আর দেশের শাসক তখন ছিল মুসলিম লীগ ; যারা আপন স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ঘটাবার চেষ্টায় কখনও বিরত হয় নি। সেই অবস্থায় কোন মুসলমান বালককে মুসলমান পাড়ায় আঘাত করা যে কত ভয়াবহ ব্যাপার, তার সম্যক উপলব্ধি এখন দুরূহ। একদল মুসলমান দাদাকে ঘিরে ধরল। আমি ছিলাম কাছেই। দাদা আমায় বললেন, "সেজমেসোমশাইকে ডেকে আন্।" আমি ছুটলাম। কাছেই হরমোহন ঘোষ লেনে আমার মেসোমশাই-এর বাড়ী। মেসোমশাইকে ডেকে নিয়ে এলাম। আশ্চর্য! তিনি এসে দাঁড়াতেই ওরা দাদাকে ছেড়ে দিল, কোন হাঙ্গামা হল না।

আগেই বলেছি, সেজমেসোমশাই ছিলেন সৌখীন ব্যক্তি। তিনি ভাল পোষাক ব্যবহার করতেন। মনে আছে আমার ছেলেবেলায় তাঁর বাড়ীতে চোঙাওয়ালা কলের গান দেখেছি। আগে গ্রামোফোনের নাম ছিল 'কলের গান'। তখনকার দিনের নানা সঙ্গীতশিল্পীর প্রচুর রেকর্ড ছিল তাঁর। সুকান্ত মাঝে মাঝে সেই সব রেকর্ড বাজাত এবং আমরা কিছুটা ঈর্ষিত বিস্ময়ে তার এই স্বাধীনতা লক্ষ্য করতাম। কারণ আমাদের রেকর্ড বাজান দূরের কথা, বাড়ীতে কলের গানই ছিল না।

নাটক সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। আমার পিতা নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমার বাবা কাকা, তাঁদের বন্ধুরা আর মেজ ও সেজো মেসোমশাই মিলে সংস্কৃত নাটক অভিনয় করতেন। দেশে তখন সংস্কৃতচর্চার যথেষ্ট প্রসার থাকায় সংস্কৃত নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল এবং শিক্ষিত মহলে ছিল তার কদর। এ ছাড়া তাঁরা কিছু কিছু ঐতিহাসিক নাটকও অভিনয় করতেন। আমার পিতার লেখা নাটক 'অভিষেক' বেশ কিছুকাল 'রঙমহলে' নিয়মিত অভিনীত হয়েছে। এই নাটকের মুখ্য ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন তখনকার দিনের

কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। যেমন, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র, সন্তোষ সিংহ, সুহাসিনী দেবী, ঊষাবতী দেবী (পটল), রেণুকা রায় প্রমুখ। এই নাটক আগাগোড়া বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। এই নাটকের রচনায় আমার সেজোমেসোমশাই-এর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। মঞ্চে অভিনীত 'অভিষেক' নাটকের গানগুলি রচনা করেছিলেন শৈলেন রায়। কিন্তু যখন পুস্তকাকারে এ বই ছাপান হয় তখন অন্য গান দেওয়া হয়েছিল। বাবার অনুরোধে সুকান্তকে এই নাটকের জন্যে কয়েকটি গান লিখতে হয়েছিল। এখন আর অবশ্য বলতে পারছি না, তার লেখা গানগুলো এ নাটকে ছাপান হয়েছিল কিনা। আমার পিতা সুকান্তর লেখা গানগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। গানগুলি অবশ্য ভাল হওয়াই সম্ভব, কারণ গানগুলি ও লিখেছিল পরম নিষ্ঠাভরে, গুরুজনের কাছে স্বীকৃতি পাবার আশায়। এ সময়ে ওর বয়স ছিল তের-চৌদ্দ বছর।

নিবারণচন্দ্রের চরিত্রে ছিল দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আমরা ছেলেবেলায় ভয় করতাম এবং এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু বাড়ীর কোন উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গ ছিল লোভনীয়। তাঁর শখ ছিল নিজহাতে অমৃতি ভাজা। বাড়ীতে কোন খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হলেই তিনি অমৃতি ভাজার আয়োজন করতেন আর আমরা ছোটরা তাঁকে ঘিরে বসতাম সাহায্য করবার জন্য—সুকান্তও বাদ যেত না। কেউ কোন জিনিস এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা সদ্যভাজা অমৃতি রসে চেপে ধরছে 'ছানতা' দিয়ে—এমনই সব বড় বড় কাজে ব্যস্ত থেকে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম।

দাবা, পাশা এবং তাস—এই সব খেলায় তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। অবসর সময়ে আসর জাঁকিয়ে বসে তিনি এইসব খেলায় মেতে থাকতেন। পৈতৃক সূত্রে সুকান্ত দাবা খেলা শিখেছিল এবং এ খেলার প্রতি তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল।

নিবারণচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর পঞ্চম পুত্র অশোক ভট্টাচার্য তাঁর লেখা 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন নীচের কয়েকটি পঙক্তিতে :

"চাপা প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে বুঝে ওঠা দুষ্কর। কথা বলার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল তাঁর। তাঁর কথার সূক্ষ্ম কারুকার্য শিল্পীমনের পরিচয় বহন করত। হয়ত তিনি ছেলেদের কোন বিষয়ে কোন শিক্ষা দিতে চান। অমনি ধীর স্থিরভাবে শুরু করে দিতেন একটি গল্প। গল্পটিব রসে মজে যেত সবাই কিন্তু তাঁর বক্তব্য শেষ পর্যন্ত কাহিল করে ফেলত শ্রোতাদের।......তাঁর যে গুণটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল তাঁর শিল্পপ্রীতি। যৌবনে তিনি ছিলেন সৌখীন পুরুষ। নানা চিত্রে ঘর সাজান বা পাঁচালী পাঠের মধ্যে তাঁর সেই শিল্পীমনের স্ফূরণ ঘটেছিল। তাঁব এই শিল্পীসত্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর একাধিক সন্তানের মধ্যে।"

একবার আমি সুকান্তর কাছে গেছি সকালবেলায় দশটা-এগারোটা নাগাদ ওদের ২০নং নাবকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাড়ীতে। সুকান্ত বলল, "একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে বাড়ী যাবি, না হলে বাবা রাগ করবেন।" মাসীমা গত হয়েছেন কয়েক বৎসর আগে। রান্না-বান্না তখন মাইনে করা লোকের হাতে। স্বভাবতই সংকোচবশে 'না-না' করছিলাম। সেজ মেসোমশাই ঘরে ঢুকে সোজাসুজি বললেন, "ওরে, তোদের মাসীমা নেই বটে, তবু আমি তোর মেসো হই। না খেয়ে যাবি না।" একথা বলে উনি আবাব বাইরে চলে গেলেন। সুকান্তব চোখে তখন ইঙ্গিতপূর্ণ কৌতুক। ওখান থেকে না খেয়ে আসার সাহস সেদিন আমার ছিল না।

সুকান্ত সাধারণত সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে দেরী করত। ওর বাবা সেটা পছন্দ করতেন না। তাই মাঝে মাঝে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে সকাল-সকাল বিছানা ছেড়ে উঠতে বলতেন। ঘুমের মধ্যেও সুকান্তর অন্তরের অন্তস্থলে বাবার গুরুগম্ভীর গলার আওয়াজ পৌঁছে যেত। সুকান্ত বলত, "বাবা যখন আমার ঘুমের মধ্যে 'ওঠ' বলে ডাকেন, আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ওঠে।" এই নিয়ে আমরাও ওর সঙ্গে নানারকম রসিকতা করতাম। আমাদের কাছে রাত্রিবাস করলে সকালবেলা ওর কানের কাছে 'ওঠ ওঠ' করে অস্থির করে তুলতাম তার বাবার গলা

নকল করে। ও বলত, "ওরে, মানুষটা তোর আপন মেসোমশাই। তাই রসিকতার সময় সেটা স্মরণ রাখলে ভাল হয় না?" কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এই রসিকতার লোভ ছাড়তে পারতাম না।

সুকান্ত সাধারণত শ্যামবাজারে ওর জ্যেঠিমা (আমার পিসীমা) অথবা বাগবাজারে আমার মা (ওর বড মাসীমা)-এর বাড়ীতে থাকতে পছন্দ করত। কিন্তু তা আমার মেসোমশাইয়ের মোটেই পছন্দসই ছিল না। তিনি চাইতেন বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাকবে। তাই সুকান্তব অন্যত্র বাস করায় তাঁর মনে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ অল্পই হত কারণ সুকান্তর পিতা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর সুকান্ত তার বাবাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত।

সুকান্তের উপনয়নের দিন স্থির হয়ে গেছে। মেসোমশাই তাঁর বৌদি অর্থাৎ আমার পিসীমার বাড়ীতে এসেছেন শ্যামবাজারের সবাইকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য। ১১ডি, রামধন মিত্র লেনের তেতলায় পিসীমার পূজোর জায়গায় বসে দু'জনে কথাবার্তা বলছেন। আমি আর সুকান্ত তখন ঠিক তার সামনে ছোড়দার ঘরে বসে গল্পগুজব করছি। আমাদের বাইবে যাওয়ার বিশেষ দরকার। কিন্তু সুকান্ত বাইরে তার বাবার কাছে আসবে না। বাইরে বেরোলেই ওর সঙ্গে মেসোমশাইয়ের দেখা হয়ে যাবে। তাই আশংকা ওকে দেখলেই তিনি দু-একটি অপ্রীতিকর কথা শোনাবেন গল্পের ছলে। আমি ওকে বোঝালাম যে, ওঁরা দুজনে গল্পে ব্যস্ত আছেন। আমরা পাশ কাটিয়ে ধীরে নেবে যাব নীচে। উনি হয়ত লক্ষ্য করবেন না বা এসময়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর পক্ষে গল্প বলার মনোভাব নাও থাকতে পারে। যাই হোক, আমার তাড়ায় সুকান্ত বাইরে এল এবং আমরা দুজনে ওঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলাম। মেসোমশাই ওকে ডাকলেন, "ওবে সুকান্ত, শোন।" সে আমাকে চোখে তিরস্কার ক'রে তার পিতার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি সুকান্তর সামনে হাত দুটো জোড় করে বললেন, "বাড়ীতে ত মেজ ছেলের পৈতে, দয়া করে যাবেন, ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধার করবেন, অধীনের

এই নিবেদন।” পৈতেটা সুকান্তর নিজেরই। তাই তার চোখেমুখে কী অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল, তা ভাবলে আজও মনে আমার কৌতুক জাগে। মেসোমশাইয়ের এই কটি কথায় তখন বাড়ীতে উপস্থিত সকলের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেছে, সবার সঙ্গে আমিও হাসছি। সুকান্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে আমার পিঠে সজোরে এক কিল মেরে নীচে চলে গেল। পরবর্তী কালে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ওর সঙ্গে নানা রঙ্গ রসিকতা করতাম।

৬

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যালয়ে বেশী লেখাপড়া করার অবকাশ পান নি। কিন্তু তাঁর প্রাচীন শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অনুরাগ ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে স্বীকৃত দেবার জন্য এক পণ্ডিত সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক ডাঃ ভাগবত শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে নিবারণচন্দ্রকে ‘বিদ্যাভূষণ’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও গণনা করতে পারতেন। একবার ছোড়দা ঝাঁঝাঁয় গিয়েছিল। তার কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র না আসায় পিসীমা চিন্তিত ছিলেন। ছোড়দা নেপাল ভট্টাচার্য তাঁর তৃতীয় পুত্র। তিনি আমাকে মেসোমশাইয়ের কাছে পাঠালেন গণনার জন্য। যতদূর মনে পড়ে মেসোমশাই প্রথমে আমাকে একটি ফুল ও পরে একটি ফলের কথা মনে মনে ভাবতে বললেন। কিছুক্ষণ গণনার পরে আমাকে ফুলটির রং কি জানতে চাইলেন। আমি সেটা প্রকাশ করার পরে তিনি আবার কিছু গণনা করলেন এবং বললেন, “তোর পিসীমাকে গিয়ে বল যে, নেপাল আজ ফিরবে, নয়ত তার চিঠি আসবে।” কি আশ্চর্য সত্যিই সেদিন ছোড়দা ঝাঁঝাঁ থেকে ফিরে এলো। এই ব্যাপারে এত বিস্মিত হয়েছিলাম যে ঘটনাটি আজও আমার মনে গাঁথা আছে।

এই পরিশ্রমী, সৎ, বুদ্ধিমান, বিবেচক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি সারস্বত লাইব্রেরী নামক প্রকাশনটি প্রতিষ্ঠা করেন [illegible]৩ সালে। তাঁর
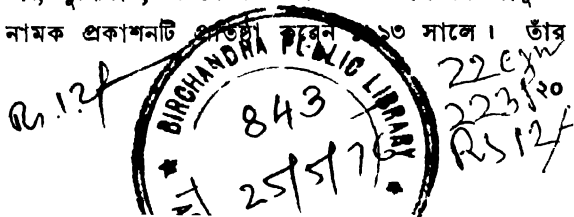
জীবিত পুত্রেরা পরম নিষ্ঠাভরে এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানটি আজও পরিচালনা করছে এবং এর উন্নতিসাধনে সচেষ্ট আছে।

সুকান্ত ছিল স্বভাব-কবি। ও শুধু লিখতেই পারত। কিন্তু কোন রচনা যত্ন করা বা তুলে রাখা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। নিজের আনন্দেই সে লিখত, সৃষ্টি করত তার অনবদ্য রচনাবলী। এই সম্বন্ধে সুকান্ত নিজেই লিখেছে"......আমার সমগ্র জীবনের লেখা তোদের ওখানে নিয়ে যাওয়া অসাধ্যসাধনসাপেক্ষ। কারণ লেখা আমি সঞ্চয় করি না কখনও, যেহেতু লেখার জন্য আমিই যখন যথেষ্ট, তখন আমার সঙ্গে একটা অহেতুক বোঝা থাকা রীতিমত অন্যায়। তবে প্রকৃতির প্রয়োজন বাঁচিয়ে যেগুলো এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত সেগুলো সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারি।" (পত্রগুচ্ছ : সুকান্ত সমগ্র)।

১৯৪১-৪২ সালের কথা। আমার ছোট ভাই সরোজ বলল, "সুকান্ত-দা আমায় একটা কবিতা লিখে দাও না।" সুকান্ত মৃদু হেসে জবাব দিল, "তোর একটা কবিতা চাই? তবে নিয়ে আয় কাগজ পেন্সিল।" এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখে গেল নীচের কবিতাটি—যেন মুখস্থ ছিল। আট দশ মিনিটেই শেষ। আমরা অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম। আমার বড় বৌদি ঠাট্টা করে সুকান্তকে বলল, "মনে হচ্ছে মুখস্থ করা বিদ্যে দেখালে।" জবাবে ও একটু মৃদু হাসল মাত্র। এই কবিতাটি আমার সম্পাদিত 'নাগরিক' নামক হাতে-লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল পুরোহিত ছদ্মনামে সুকান্তর অনুমতি নিয়ে। 'পুরোহিত' ওর নিজেরই ছদ্মনাম।

আজিকার দিন কেটে যায়

আজিকার দিন কেটে যায়,—
অনলস মধ্যাহ্ন বেলায়
যাহার অক্ষয় মূর্তি পেয়েছিনু খুঁজে
তারি পানে আছি চক্ষু বুজে।

আমি সেই ধনুর্ধর যার শরাসনে
অস্ত্র নাই, দীপ্তি মনে মনে,
দিগন্তের স্তিমিত আলোকে
পূজা চলে অনিত্যের বহ্নিময় স্রোতে।
চলমান নির্বিরোধ ডাক,
আজিকে অন্তর হতে চিরমুক্তি পাক।
কঠিন প্রস্তর মূর্তি ডেকে যাবে যবে
সেই দিন আমাদের অস্ত্র তার কোষমুক্ত হবে।
সুতরাং রুদ্ধতায় আজিকার দিন
হোক মুক্তিহীন।
প্রথমে বাঁশার স্ফূর্তি গুপ্ত উৎস হতে
জীবন-'সন্ধুর বুকে আন্তরিক পোতে
আজিও পায় নি পথ তাই
আমার রুদ্রের পূজা নগণ্য প্রথাই
তবুও আগত দিন ব্যগ্র হয়ে বারম্বার চায়
আজিকার দিন কেটে যায়॥

এই 'নাগরিক' পত্রিকার প্রয়োজনে ওকে দু-চার লাইনের আরও একটি কবিতা দিতে বলেছিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিল নীচের কবিতাটি :

যাহাদের বাঁচা শুধু
আমাদের বাঁচিবার তরে
তারা কেন জীবনের সর্বসুখ হ'তে
নিজেদের প্রবঞ্চিত করে।

আর একবার তাকে বললাম, "কোন বন্ধুকে বিজয়ার প্রাতি-সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বাজারের সাধারণ কবিতা আমার মনে লাগছে না, তুই দু-একটা লাইন লিখে দে!" ও সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিল :

মধুর আবেশে বিজয়ার প্রীতি
পাঠানু তোমার দ্বারে
হাসিয়া গ্রহণ করিও তারে।

ফিরে এসো তুমি বন্ধনহীন
এমন দিনে,
আবার তোমারে নতুন করিয়া
লইব চিনে।

এই রকম শত শত কবিতা তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধারণত এমনটি হয় না। আমার মাসীর বাড়ী আর পিসীর বাড়ী বলতে বেলেঘাটার একটি বাড়ী। তাই বেলেঘাটার আকর্ষণ আমার কাছে যেন দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিত। বেলেঘাটায় তখন আমার পিসেমশাই এবং মেসোমশাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার, লোকজনে পরিপূর্ণ জমজমাট এক পরিবেশ।

আমাদের শিশুকালে সুকান্তর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব অল্পই হত। কারণ আমি তখন শ্যামনগরে কাকার কাছে থেকে পড়াশুনা করতাম। সেই সময় আমাদের দেখা হত সাধারণত কোন পরিবারিক অনুষ্ঠানে, তা সে বাগবাজার, বেলেঘাটা অথবা কালীঘাট যেখানেই হোক না কেন। এছাড়া অবশ্য আমাদের নিয়মিত মিলন-স্থল ছিল আমাদের মামাবাড়ী, যখন আমার মা এবং অন্যান্য মাসীরা সেখানে এসে বাস করতেন কিছুকাল।

বেলেঘাটার এই পরিবারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং পরম মধুর চরিত্র ছিল আমাদের পিসতুত এবং সুকান্তর জ্যাঠতুত ভগিনী রাণীদি। বেলেঘাটায় বাড়ী করে চলে আসার আগে এই পরিবার বেশ কিছুকাল নিবেদিতা লেনে বাস করেছিলেন। রাণীদি ত সে-সময় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল এবং পড়াশুনায় তার খুব সুনাম ছিল, পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতো। রাণীদি ছোটদের বড় আপন-জন ছিল। ছোটদের সে খুব ভালবাসত এবং গল্পে, কথায়, কবিতায় মাতিয়ে রাখত। সুকান্তকে সে অসম্ভব ভালবাসত। সুকান্ত যখন নিতান্তই শিশু তখন সে তাকে নিয়ে কোলে কোলে ফিরত। আবার যখন ওরা

বেলেঘাটায় চলে আসে, তখনও সুকান্তকে সব সময় কাছে কাছে রাখতে ভালবাসত আমাদের রাণীদি। এই বাড়ীর একমাত্র কিশোরী রাণীদির কাছে সুকান্ত প্রথম কবিতার স্বাদ গ্রহণ করেছিল, হয়ত পেয়েছিল তার কবিতার অনুপ্রেরণা। কারণ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা রাণীদির কণ্ঠস্থ ছিল। তাই সুকান্তকে কোলে ক'রে ঘোরার ফাঁকে বা কাছে বসিয়ে রাণীদি বহু সময় আপন মনে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলো আবৃত্তি করত। কবিতার এই ঝর্ণাধারায় স্নান করে সুকান্তর শিশুমনেও হয়ত কাব্যের বীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে যা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। জমি যখন তৈরী তখন অতি সহজেই যে ফসল ফলবে এটাই তো স্বাভাবিক। অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ নয়। আগেই বলেছি, আমার সেজমাসীমা সুর করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়তে ভালবাসতেন। শিশু সুকান্ত জন্মাবধি ছন্দোময় এই সুন্দর মহাকাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তার মার সুললিত কণ্ঠের মাধ্যমে। বাড়ীতে এই সুন্দর পরিবেশে যেখানে বড়রাও কাব্যসাহিত্যে অনুরাগী এবং বিশেষ করে তার বাবার পাঁচালী পাঠ এবং জ্যাঠামহাশয়ের সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্র পাঠ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সেই পরিবেশের মধ্যে বাস করায় স্বভাবতই সুকান্তের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটা বিচিত্র নয়।

এই সমগ্র পরিবেশটাই সুকান্তর প্রতিভার উৎস, এর সঙ্গে হয়ত আরও একটা জিনিস, যেমন বিয়োগ-ব্যথা বা বিরহ যা মানুষের মনকে বিষাদময় ক'রে তোলে, হয়ত তার স্বাদও কবি পেয়েছে এই রাণীদির অকাল মৃত্যুতে। রাণাদিরও জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৯৩১ সাল নাগাদ উচ্ছল ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর কিশোরী রাণীদি সামান্য রোগভোগের পরে বেলেঘাটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাণীদির প্রিয় লেখক ছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু। তাঁর একটি রচনার একটি চরিত্র ছিল সুকান্ত—যার অকাল মৃত্যু হয়েছিল যক্ষ্মারোগে। এই 'সুকান্ত' নামটা ভারী মিষ্টি লেগেছিল রাণীদির কাছে, তাই তার আদরের ছোট ভাই-এর নাম দিয়েছিল 'সুকান্ত'। মণীন্দ্রলালের 'সুকান্ত'র মতই আমাদের সুকান্তও নিয়ে এসেছিল স্বল্পস্থায়ী জীবন।

৮

শিশুকাল থেকেই বেলেঘাটায় গেলে লক্ষ্য করতাম পিসতুত দাদারা সুকান্তকে 'কবি' বলে ডাকে। কথাটা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার পিসেমশাই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পছন্দ করতেন। যে কোন উপলক্ষে বাড়ীতে একটা ছোটখাটো উৎসব-আয়োজন ছিল তাঁর নিত্যকার ব্যাপার। তিনি রাশভারী মানুষ হলেও উৎসব আনন্দ পছন্দ করতেন।

আমার এখনও মনে পড়ে পিসীমার বাড়ীর কোন একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। পিসেমশাই চলচ্চিত্র দেখাবার আয়োজন করেছিলেন। এখন বেলেঘাটার যে চিত্র-গৃহটির নাম 'সন্তোষ' সে সময় তার নাম ছিল 'রবিন টকী'। এখানে তখন নির্বাক চিত্র 'দেবদাস' দেখান হচ্ছিল। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে অর্থাৎ মা, পিসীমা, জ্যেঠিমা, মাসীমা ইত্যাদির সঙ্গে আমরা সে ছবি দেখতে গেলাম। তখন আমি আর সুকান্ত নিতান্তই শিশু। এই চিত্রগৃহে মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা ছিল একদম পিছন দিকে। সামনে একটা পর্দার ব্যবস্থা ছিল। ঘর অন্ধকার হলেই সেই পর্দাটা টেনে সরিয়ে দিত কোন মহিলা-কর্মী যাতে মেয়েরা ছবি দেখতে পায়। আবার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা বিস্তার করা হত, যাতে মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকতে পারে, বসতে পারে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

এক উৎসবে একজন ভারী চেহারার ব্যক্তির ভোজনের সুন্দর বর্ণনা করে সুকান্ত মুখে মুখে একটা ছড়া বেঁধে ছিল। এ-সময়ে তার বয়স হবে পাঁচ-ছয় বছর এবং এটাই সম্ভবত তার প্রথম রচনা।

এক সময়ে এই ছড়া আমার পিসতুত বড়দা গোপাল ভট্টাচার্য এবং মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যের মুখে মুখে ফিরত। পিসেমশাইও এ ছড়া শুনে সুকান্তর অস্বাভাবিক ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছিলেন। ছড়াটি কেউ যত্ন করে লিখে রাখে নি, তাই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

সুকান্তকে বাড়ীর সবাই 'কবি' বলে ডাকত। এই সময় সুকান্তের সবে অক্ষর পরিচয় শুরু হয়েছে। ওকে কবি বলে ডাকা হত বলে আমার শিশুমনে হয়ত এজন্য কিছু ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল তাই এ ঘটনা আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এর পরে সুকান্ত আরও একটু বড় হ'য়ে অর্থাৎ আনুমানিক আট-ন বছর বয়স থেকে নানারকম অজস্র ছড়া রচনা করে ছিল। কোনটি লেখা হত, কোনটি বা মুখে মুখেই রচিত হত। সে সব ছড়াও কেউ যত্ন করে তুলে রাখে নি; তাই সেগুলোর বেশীর ভাগই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-সব ছড়াগুলো বড়দের নজরে এসেছিল এবং তারা মনে রেখেছিল তার কিছু পাওয়া গেছে। নীচে সেরকম কতগুলি ছড়া উদ্ধৃত করছি। এর কোনটি মুখে রচনা, কোনটি লেখা তা এখন আর জানা সম্ভব নয়, তেমনি কোনটি আগে রচিত এবং কোনটি পরে সে-কথা আজ আর বলা যাবে না। তবে সুকান্তর বয়স সে সময় আট-ন বছরের বেশী হবে না বলেই শুনেছি।

(১) ভগবান গাহি তব গান।
তোমার দয়াতে জল ও বায়ু,
তোমার দয়াতে পেয়েছি আয়ু।
তোমার মহিমা কত কব আর
এইখানে গান শেষ আমার।

(২) বল দেখি জমিদারের কোনটি ধাম ?
জমিদারের দুই ছেলে রাম ও শ্যাম।
রাম বড় ভাল ছেলে পাঠশালে যায়—
শ্যাম শুধু ঘরে বসে দুধ-ভাত খায়।

যে রচনাটি সুকান্তকে বড়দের মহলে স্থায়ী আসন এনে দিয়েছিল এবং ওর কবি নাম বা কবি প্রতিভা পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয়েছিল সেটি হল এই ছড়াটি:

রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন
দুই বোন রমা রাণী
সবে করে কানাকানি
দুইজনে হবে ভাল
করিবে যে ঘর আলো সীতার মতন।

সুকান্তের এই ছড়ায় তার খ্যাতি একান্নবর্তী পরিবারের গণ্ডী ডিঙিযে ছড়িয়ে পড়ল আত্মীয়স্বজন মহলে। সবাই জানলো সুকান্তর এই প্রতিভার কথা। এ সময় থেকে সে এই ধ.নেব বহু ছড়া এবং কবিতা রচনা করে ছিল। অবশ্য 'মিঠেকড়ার' ছড়াগুলো অনেক পরবর্তী কালের রচনা।

সুকান্তর একখানা বাঁধান খাতা ছিল। বড়দের কেউ হয়ত তার কবিতা লেখবার সুবিধার জন্য উপহার দিয়েছিল। এই খাতাখানা তার কাঁচা হাতের পাকা লেখায় ভরে উঠতে লাগলো। ছন্দেরও কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় এই সব রচনায়। যার দু-একটি নমুনা নীচে দেওয়া গেল ঃ

(ক) ওপাড়াব শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
'এক্ষুনি আলো আন।'
কী বিপদ তাহ'লে
আলো তার নাহলে
মার খাব আমরা ?
দিলে পরে উত্তর
রেগে বলে, ধুত্তোর
'যত সব দামড়া'।

কেঁদে বলি শ্রীপদে
বাঁচাও এ বিপদে—
অক্ষম আমাদের।
হেসে বলে শ্যামদা
নিয়ে আয় রামদা
ধুবড়ির রামাদের ॥

(খ) বাড়ী কোন গাঁয়ে?
বাড়ী বনগাঁয়ে।
ছেলে কাহাদের?
ছেলে সাহাদের।
চল আমরা
পাড়ি আমড়া।

সুকান্তর জ্যাঠতুত দাদা স্বর্গত গোপাল ভট্টাচার্য সুকান্তর রচনার ভারি ভক্ত ছিলেন। সুকান্তর শিশুকালে তিনি তাকে রচনার অনুপ্রেরণা জোগাতেন, উৎসাহিত করতেন। এমনি করেই তিনি চাইতেন সুকান্তর প্রতিভার স্ফুরণ। সুকান্ত যখন আট-ন বছরের বালক তখন তিনি কাজে বেরোবার আগে সুকান্তর সামনে হাততালি দিয়ে সুর করে আবৃত্তি করতেন সুকান্তর বিখ্যাত ছড়াটি 'রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন'। সুকান্তও এই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতো। সে এক ভারি মধুর দৃশ্য। অতি দুঃখের কথা, এই দাদা—আমাদের সবাকার বড়দা—১৯৩৮ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ৩৪, হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ীতে টাইফয়েড রোগে পরলোকগমন করেন। এই মৃত্যুও সুকান্তর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেনে ৺কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও সেজ-মেসোমশায় একত্রে বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এই বাড়ীর ঠিক সামনে একটা খাজনা-করা জমির উপরে পূর্ববঙ্গের কায়দায় এই সঙ্গে আটচালাও

নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা। এই বাড়ী দুটিতে এই একান্নবর্তী পরিবার বাস করেছিলেন কয়েক বছর। এর পরে সুকান্তর পিতা আমার মেসোমশাই আলাদা বাসা নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। বাকী পরিবার অর্থাৎ আমার পিসীমার বাড়ীর সবাই এই বাড়ীতে আরও কয়েক বছর ছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই বাড়ীতে আসার পর থেকে প্রায় প্রতি বছর মৃত্যু এসে একজনের পরে একজনকে গ্রাস করতে লাগল। সুকান্তর রাণীদি থেকে শুরু করে একে একে তার পিতামহী, বড়দা গোপালচন্দ্র এবং মেজদার শিশুকন্যাদ্বয় শ্রী ও মঞ্জু তারপরে সুকান্তর জ্যাঠামশাই, যিনি এই পরিবারকে সুদূর পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রাম থেকে শহরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই পরিবারে এনে দিয়েছিলেন সচ্ছল অবস্থা, সেই পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মৃত্যুর শিকার হলেন। এমনি করে একে একে অনেককেই বিদায় নিতে হল পৃথিবী থেকে মাত্র অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে। এ যেন এক মৃত্যুর মিছিল। এতগুলি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এবং মানুষের অসহায় ক্রন্দন এবং বেদনাবোধ কবির কোমল হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই মনে হয় এর পরে বেশ কিছুকাল সুকান্তর কবিতায় বিষাদের সুর ফুটে উঠেছে।

এই অবস্থায় অর্থাৎ এতগুলি মৃত্যুজনিত বিহ্বলবেদনায় আমার পিসীমা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা বেলেঘাটার এই বাড়ী ছেড়ে শ্যামবাজারে ৩০, (বর্তমান নম্বর ২৯এ) [illegible]পন মিত্র লেনের ভাড়া-বাড়ীতে বাস করতে চলে এলেন। বেলেঘাটার এই বাড়ী দুটির একটিতে সুকান্তর বৈমাত্রেয় ভাই মনমোহন এবং অপরটিতে অর্থাৎ টিনের বাড়ীতে বাস করেছিলেন সুকান্তরা পরবর্তীকালে কয়েক বছর। পরে এ বাড়ী বিক্রি হয়ে যায়।

৯

সুকান্তর পিতা নিবারণচন্দ্র বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনীতি দেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে। ১৯৩৮ সালে বড়দার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সেজমাসীমা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

পরে ধরা পড়ল, মাসীমা দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের কবলে পড়েছেন এবং এই রোগের নাম তখনই আমরা শুনলাম ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে। বেশ কিছুকাল ভুগলেন তিনি এবং এত শীর্ণ হয়ে গেলেন যে সাধারণ বিছানায় তাঁকে আর শোয়ান যেত না। সংসারের খরচ বাঁচিয়ে তিনি কয়েকটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন; একদিন নিজেই তা বার করে দিলেন রবারের তৈরী হাওয়া দিয়ে ফুলানো বিছানা কেনবার জন্য। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে চিকিৎসার জন্যে মাসীমা রইলেন কিছুকাল। ক্যান্সার হয়েছিল পেটের ভেতরে। চিকিৎসাবিজ্ঞান তখনও এতটা উন্নত হয় নি, তাই কোন উপকারই দেখা গেল না। সে সময়ের কয়েকজন 'বড় বড় নাম করা চিকিৎসককে দেখান হয়েছিল, কিন্তু বৃথা—পাওয়া গেল না কোন উপকার। নিরাময়ের সম্ভাবনা ক্রমশই যেন মিলিয়ে যেত লাগল হতাশার অন্ধকারে। রোগ জটিল হ'তে জটিলতর হল। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে নানারকম উপসর্গ। মেসোমশাইকে এসময়ে দেখেছি সবার সঙ্গে এ রোগ সম্বন্ধে কি করণীয় সেই পরামর্শে ব্যস্ত। তাঁকে দেখেছি বিচলিত বিহ্বল। তাঁর সরস কথাবার্তা হারিয়ে গিয়েছিল হতাশার তাড়নায়।

রোগের প্রথম আক্রমণের মুখে মধুপুরে গিয়ে মাসীমা সুস্থ হয়ে ফিরেছিলেন। সে সময়ে এটাকে সাধারণ পেটব্যথা হিসাবেই মনে হয়েছিল, তাই মধুপুরে যাওয়া সাব্যস্ত হয় এবং তখনকার মত সেজমাসীমার সেই পেটের ব্যথার উপশম হয়েছিল। চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে আবার মধুপুর গেলে তাঁর রোগের উপশম হবে। অতএব তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁকে আবার মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হল। তখন তাঁর চেহারা রুগ্ন, কঙ্কালসার। অমন রাণীর মত সুন্দর যে চেহারা তা কি ভয়াবহ শীর্ণরূপ নিয়েছিল তা ভাবলে আজও মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই বছরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মেজমাসীমা মধুপুরে। সেখানেই তাঁর শেষকার্য করা হয়। এই মৃত্যুতে সমস্ত পরিবারটি ছন্নছাড়া হয়ে গেল ডোরছেঁড়া মালাটির মত। যে মানুষটি সংসার করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন মানুষ করে তুলতে নিজের সন্তানদের, নিজের হাতে গড়তে

চেয়েছিলেন সুখী সুন্দর পরিবার, সে সব সাধ তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন কোন অচেনালোকের আহ্বানে, পেছনে পড়ে রইল তাঁর ছোট ছোট কয়েকটি অসহায় শিশু। তখন সুকান্তর বয়স মাত্র বারো বছর।

সুকান্ত তার মাতার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেনি, কারণ সে তখন তার জ্যেঠিমার কাছে থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল। পরপর এতগুলি মৃত্যু দেখার পর এই প্রথম সুকান্তকে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ আঘাত এবং তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দৃঢ়বন্ধনে বেঁধে ফেলল। অপর ভাইরা মাতৃহীন হয়ে মধুপুর থেকে চলে এল শূন্য মনে। তারপরে সুকান্ত শ্যামবাজারে পিসীমার বাড়ী থেকে মাতৃহীন পুরীতে ফিরে এল এবং প্রথম অনুভব করল মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ। মাতৃহীন বাড়ীঘর এবং সবকিছু নিশ্চয়ই তার কাছে অসহ্য হয়ে পড়েছিল। এই বিয়োগ-ব্যথা, এই অসহ্য শূন্যতা তার শিশুমনে যে কতখানি দুঃখ বেদনা সৃষ্টি করেছিল তা আজ আর জানা সম্ভব নয়, শুধু সমব্যথী মন নিয়ে অনুমান করা যেতে পারে। যারা ভাবুক এবং নরমপ্রকৃতির মানুষ, দুঃখ বেদনা মৃত্যু তাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়। যে মৃত্যু ছিল বাইরে, তা যেন অন্দরে এসে হানা দিল। সুকান্তর মনে অসীম শূন্যতার সৃষ্টি হল, তার শিশুমন দলিত, মথিত হয়ে গেল। সৃষ্টি হল এক বিরাট হাহাকার। বাড়ীর আবহাওয়া গেল বদলে। স্বাভাবিক হাসি-তামাশা, গল্প-গুজব যেন কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল। মায়ের স্মৃতি এই অসহায় বালককে যেন দিশাহারা ক'রে তুলত।

মাতৃহীন পরিবার যেন মেসবাড়ীর রূপ নিল! মাইনে করা লোক এসে রান্না করে দিয়ে যায়, কিন্তু দরদহীন, মমতাহীন পরিবারে সবার মন টিকলেও কবির মন স্বতন্ত্র। বাড়ীর বড়রা যে যার কাজে বেরিয়ে যায়, সময় মত ফিরে আসে রাত্রে। সুকান্তর জন্য অপেক্ষা করে থাকে সারাদিনের কর্মহীন শূন্যতা। ছোট ছোট ভাইগুলোকে নিয়ে সঙ্গীহীন বাড়ীতে থাকা—বড়দের ফেরার অপেক্ষায়। একেবারে ছোট ভাই অমিয় অবশ্য তখন দাদামশাই-দিদিমার কাছে রয়েছে।

অমিয়র তখন ২।৩ বছর বয়স। সে খালি বেলেঘাটা যেতে চায়; মার অনুসন্ধান করে অনুক্ষণ। কে ওই শিশুকে বুঝিয়ে বলবে মা তার ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁর দেখা আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। একদিন এই অবোধ শিশু বিকেলে সবার অগোচরে কালীঘাটের মামারবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়—বেলেঘাটা যাবার দুরন্ত বাসনায়। সন্ধ্যায় জানা গেল, শিশু অমিয়কে বাড়ীতে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি শুরু হল। আমি সে সময় মামারবাড়ী ছিলাম। মাতৃহারা শিশুর হঠাৎ অন্তর্ধানে সবাই তখন খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে। আশপাশের বাড়ীতে এবং সম্ভাব্য অন্যান্য জায়গায় বৃদ্ধ দাদামশাই দিশেহারা হ'য়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। রাত্রে ভবানীপুর থানায় পাওয়া গেল অমিয়কে। এই দুরন্ত শিশু থানা অফিসারকে জানাল যে, 'সে দাদামশাইকে চেনে না। থানা অফিসারের প্রশ্ন ছিল, এই বৃদ্ধ তার পরিচিত কিনা। সে আরও জানাল যে, সে তার মার কাছে বেলেঘাটায় যেতে চায়; মামাবাড়ী সে ফিরে যাবে না—কারণ ওখানে তার মা নেই। দাদা-মশাই তাকে ধমক দিয়ে উদ্ধার করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং এর কয়েকদিন বাদে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বেলেঘাটায়। সুকান্তর বয়স তখন ১২।১৩ বছর।

একদিন প্রশান্ত খেলার ছলে কামড় দিলে একটা জংলী গাছের শেকড়। ঠোঁট, মুখ ফুলে গেল। সে এক অসহায় অবস্থা। বড়রা বাড়ী এসে ঘটনা শুনল রাত্রে। তাদের দুশ্চিন্তা বাড়ল মাত্র, কারণ সমাধানের কোন রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তারা কাজকর্ম করবে, না সামলাবে ঐ ছোট ছোট কয়েকটি শিশু আর বালককে। যাই হোক শেষে অনেকের পরামর্শে সারাদিনের জন্য এক বৃদ্ধা মহিলাকে রাখা হল বাড়ীতে। তাঁর কাজ নিয়মিত রান্নাবান্না করা। এছাড়া অবশ্য একজন ঠিকা ঝি ছিল অন্যান্য গৃহকাজের জন্য। মেসোমশাই তখন যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন বলে মনে হত।

কিছু কাল পরে ওরা এল ২০ নং নারকেলডাঙা মেন রোডের ভাড়া বাসায়। পুরনো ছোট একটা বাড়ী—তার দোতলায় ওদের

বাস। পাশ দিয়ে মালগাড়ী যাবার লাইন—এ লাইন চলে গেছে বজ্‌বজ্‌, লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মণ্ড-হারবার ইত্যাদির পথে। এই রেল-লাইন আর তাদের বাড়ীর মাঝে অর্থাৎ পাশের বাড়ীতে তখনকার পুলিশের একজন বড়কর্তা রায় বাহাদুর সত্যেন মুখার্জী বাস করতেন। এটা তাঁর নিজস্ব বাড়ী। তিনি মেসোমশায়কে শ্রদ্ধা করতেন এবং ঐ পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যজমান ছিলেন।

রাস্তার ওপরে পশ্চিমদিকের ঘরটায় সুকান্ত তার শেষ জীবন কাটিয়ে গেছে এবং তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এখানে বসেই রচনা করেছে।

সুকান্তর বাড়ীর তখনকার দিনগুলো ছিল বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দময়। বৃদ্ধা রান্নাবান্না করে, সংসারে অগোছাল অবস্থা, পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। ছোটদের পোষাক-আশাক ময়লা ধূলিধূসর। এখানে ঢুকলে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, মন হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। নিতান্তই গতানুগতিক সাধারণ এক কর্ণধারহীন জীবনের চিত্র। যে সৌন্দর্যের পূজারী, যে কবি, যে আনন্দলোকের সন্ধানী তাকে যেন এই আবহাওয়া নিরন্তর পীড়িত করে, তার মন হয়ে পড়ে সংকুচিত, বিদ্রোহী। জানে না সে কেমন করে মুক্তির স্বাদ পাবে। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তার মন প্রতিনিয়ত ছট্‌ফট্‌ করে।

সুকান্তকে বোঝবার, তার কবিসত্তাকে অনুভব করবার, তাকে প্রেরণা দেবার মত সংবেদনশীল মনের অভাব ছিল তার বাড়ীতে। কারণ বাড়ীর আবহাওয়া ছিল ভারী এবং গম্ভীর—কিছুটা খাপছাড়া এবং নিরস। স্নেহ-মায়া বিবর্জিত বিচিত্র এক পরিবেশ, যার সঙ্গে একমাত্র মেসবাড়ীর তুলনা চলে। শক্তহাতে সংসারের হাল ধরার মত আপনজনের ছিল অভাব, মাতৃহীন পরিবারের এইটাই হয়ত স্বাভাবিক রূপ। সুকান্তর পিতা ছিলেন সদাচারী ব্রাহ্মণ। অগ্রজ সুশীলদা খুবই উদ্যোগী ও দায়িত্বশীল মানুষ। সমস্ত জিনিসটাকে বোঝবার, অনুভব করবার এবং প্রয়োজন মত যে কোন অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত মনোবল তার ছিল। মাথার ওপর তার গুরুদায়িত্ব—নিজে মানুষ হতে হবে, শিখতে হবে লেখাপড়া, মাতৃহীন ছোট ছোট ভাইদের মানুষ করে তুলতে হবে। এ

পরিবারের নিজস্ব ব্যবসা সারস্বত লাইব্রেরীর কর্মচারী ছিলেন প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ কালীরতন ভট্টাচার্য। তিনি যেন নিয়েছিলেন সুকান্তদের অগ্রজের ভূমিকা। বাড়ীর আবহাওয়া অসহ্য রকম আচার নিষ্ঠায় ভরা এবং কালীরতনের সুকঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা এবং নির্দেশনাই এর মূল কারণ। এই কালীরতন সম্বন্ধে শিশু সুকান্ত দেওয়ালে লিখে রেখেছিল: "কালীরতন/ চাঁদবদন।" কালীরতনের অবশ্য এটা পছন্দ হয় নি।

কবির ছিল সংস্কারমুক্ত মন, বাড়ীর এই আচার নিষ্ঠায় ভরা পরিবেশ তার কাছে খুবই অসহ্য লাগতো। তাই সুকান্ত মুক্তির সন্ধানে, বৈচিত্র্যের সন্ধানে, শিল্পী সুলভ মনের খোরাকের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া-আসা শুরু করল।

বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গেলে সে অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্যের সন্ধান পেত এবং চরিতার্থ করতে পারত কৌতূহল। বাইরের আবহাওয়ায় পেত সে বন্ধনহীন তৃপ্তি আর শান্তি।

আমরা নারকেলডাঙায় ওর বাড়ীতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ত বাড়ীর বাইরে মুক্ত হাওয়ায়। এখন নারকেলডাঙা মেন রোডে যেখানে শিশু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেখানে একটা বড় মাঠ ছিল। ধোপারা কাপড় কেচে এখানে শুকিয়ে নিত। এই মাঠে প্রায়ই শীতকালে ক্রিকেট খেলা হত এবং তখনকার দিনের কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়কে এসব খেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখেছি। সুকান্তর সঙ্গে আমি এবং খোকন এই মাঠে খেলা দেখতে যেতাম। ক্রিকেট খেলার আইন কানুন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলাম না। সুকান্তর কিন্তু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা ছিল এবং আমাদের বুঝিয়ে দিত। এই খেলাটির প্রতি ওর বরাবরই আগ্রহ ছিল।

মেসোমশাই-এর বেশ কয়েকঘর অবস্থাপন্ন শিষ্য এবং যজমান ছিল। প্রায়ই নানারকম ফলমূল মিষ্টির আমদানী হত ওদের বাড়ীতে। কিন্তু দরদী মন নিয়ে কে সে সব গুছিয়ে রাখবে এবং তুলে দেবে ছোটদের হাতে। একবার দুর্গাপূজার সময় সুকান্ত, খোকন আর আমি আমাদের

শ্যামবাজারের ৭/২, বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ীতে গল্পগুজবে সময় কাটাচ্ছি। এ সময় কথায় কথায় নারকেল নাড়ুর কথা উঠল। আমরা তিনজনই এই বস্তুটিকে খুব পছন্দ করতাম। সুকান্ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাব করল সবাই মিলে নারকেলডাঙায় যাওয়া যাক। কারণ ওখানে তখন ফল-মিষ্টি নাড়ুর ছড়াছড়ি। সেগুলো তার বাবার বিভিন্ন যজমান বাড়ী থেকে নিত্য আসতো গাদা গাদা। নাড়ুর রসাস্বাদনের আশায় আমরা তিনজন তখনই চলে গেলাম নারকেলডাঙায়, বলাবাহুল্য পায়ে হেঁটেই। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না এককণা নাড়ু। বৃদ্ধা রাঁধুনী বাড়ী ছিল না। সুকান্ত ভরসা দিল সে ফিরলেই পাওয়া যাবে আমাদের পরম লোভের সামগ্রী নাড়ু এবং সন্দেশ। যথা সময়ে সে ফিরল, কিন্তু বাড়ীতে নাড়ু এবং অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য সম্বন্ধে কোন আলোক-পাত সে করতে পারল না। সুকান্তর চোখেমুখে যে অসহ্য অসহায় অবস্থা, রাগ আর হতাশা লক্ষ্য করেছিলাম তা আমাদের উভয়ের মনে বড় ব্যথা দিয়েছিল। ওকে আমরা বোঝালাম, এই সামান্য ব্যাপারে এতটা উতলা হয়ে কি লাভ। ওর কথায় বুঝেছিলাম, সংসারের এই ছন্নছাড়া অবস্থা সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। পিতার প্রতি সমবেদনায় ওর চোখ দুটি সজল হয়ে গেল। ওর দুঃখ পিতার চেষ্টার ত্রুটি নেই সংসারের সুষ্ঠু পরিচালনার। কিন্তু ব্যয় বাহুল্য, অনিয়ম আর অবহেলা এই কয়েকটা বস্তু সংসারকে যেন পিষে মারছে!

সুকান্তর অন্যান্য ভায়েরা যখন এই ছন্নছাড়া অব্যবস্থা আর অনিয়মকে মেনে নিয়েছিল ধীরে ধীরে, ও কিন্তু কোনমতেই এই অবস্থা বরদাস্ত করতে পারে নি। ওর মন বেরিয়ে পড়ল বাইরের জগতে বৈচিত্র্যের সন্ধানে, মুক্ত হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাসগ্রহণ করবার জন্যে। ধোঁয়াশার শ্বাসরোধকারী অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার দুরন্ত বাসনায় সুকান্ত দৃষ্টি মেলে দিল আত্মীয়স্বজন মহলে। মাতৃহীন বালক হয়ে পড়েছিল স্নেহ-কাঙাল। দরদী স্নেহকাতর মমতাভরা মনের সন্ধান যেখানে সুকান্ত পেয়েছে সেখানে ও ধরা দিয়েছে, একাত্ম হয়ে মিশে গেছে। সুকান্তকে ভালবাসত সবাই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মহলে দেখেছি ও সবারই

প্রিয়। বাস্তবিক ওর প্রতি অপরের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। ওর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। ওর সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের জন্য সবাই ওকে কাছে টেনে নিতে চাইত। ওর সান্নিধ্য ছিল সকলেরই পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

যদিও সে ছিল স্নেহ-কাঙাল এবং দরদী-মন-সন্ধানী, তবুও ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট জায়গায়ই ছিল ওর যাতায়াত। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মামাবাড়ী, শ্যামবাজারে আমাদের বাড়ী আর ওর জেঠিমার বাড়ী, বৈমাত্রেয় বড় ভাই মনমোহন ভট্টাচার্যের বাড়ী এবং স্কুলের সহপাঠী অরুণাচলের বাড়ী।

প্রথম প্রথম সে এসব বাড়ীতে যাতায়াত করত, কিন্তু থাকা বা খাওয়া দাওয়া করত না। বাড়ী ফিরত সময়মত। পরে অবশ্য এসব জায়গার মধ্যে বিশেষ করে ওর জ্যেঠিমার বাড়ী, আমাদের বাড়ী আর মামার বাড়ীতে বেশী যাতায়াত করতো এবং থাকার অনুরোধ অনেক সময়ই ঠেলতে পারত না।

১০

রাণীদির স্মৃতি তখন ওর মনে অস্পষ্ট কিংবা তার কথা হয়ত আর মনেই পড়ে না। বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে আপন পরিবারের গণ্ডীর বাইরে ওর দৃষ্টি প্রথম পড়ে ওর বৈমাত্রেয় দাদা মনমোহন ভট্টাচার্য (সেজদা) এবং তাঁর স্ত্রীর ছোট্ট ছিমছাম গুছোন সংসারের প্রতি। এঁরা দুজনেই প্রাণময় এবং উচ্ছল। সুকান্ত লক্ষ্য করেছিল এদের ব্যবহারে অকৃত্রিম স্নেহ আর ভালবাসা। পেয়েছিল ওদের মধ্যে আপনজনের স্পর্শ। শেষ দিকে সে সম্পর্ক রক্ষিত না হলেও, সুকান্ত তার জীবনের একটি পর্যায় ওদের বড় ভালবাসত।

মনমোহন চিত্রশিল্পী, খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন তখন। ইনি কলেজ স্ট্রীটের অধুনালুপ্ত সাহিত্য মন্দির নামে পুস্তক প্রতিষ্ঠানের মালিক। একটু বেশী কথা বলে দাদা—কিন্তু মানুষটা ভাল এবং অসম্ভব খেয়ালী। এই খেয়ালী স্বভাবের জন্যেই সুকান্ত যেন তাঁকে আরও বেশী পছন্দ

করত। বিয়ের কিছুকাল পরেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছিলেন। সুকান্ত প্রথম প্রথম তাঁর বাড়ীতে খুবই যাতায়াত করত, কাটিয়ে দিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বৌদির সঙ্গে ওর ভারী মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক ছিল। মান-অভিমান, রাগারাগি, কথা-বার্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া—এসব ছিল নিত্যকার ঘটনা। নানা রকম রসিকতাও করত সুকান্ত বৌদির সঙ্গে। যেমন বৌদি হয়ত সুকান্তকে রোদ্দুর আসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিল, "সুকান্ত, দোর টা দে।" সুকান্ত অমনি সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। বৌদি বলে, "ওকি করছিস ?" সে জবাব দেয়, "তুমি দরজাটা চাইলে, তাই তোমাকে ওটা দেবার জন্যে খোলবার চেষ্টা করছি।" বৌদি হয়ত বলল, "তুই একটি বাঁদর।" সুকান্ত অমনি ব্যস্ত হয়ে কি যেন খোঁজাখুজি শুরু করে দেয়। বৌদির প্রশ্নের জবাবে জানায়, "বাঁ-দোর পাওয়া গেল ডান-দোরটা খুঁজছি।" সুকান্ত আসতেই বৌদি হয়ত প্রশ্ন করল, "আজ কি দিয়ে খেলি।" সুকান্ত অসীম বিস্ময়ের ভান করে বলে, "কেন! হাত দিয়ে।" বৌদি একদিন কৃত্রিম রাগ করে বলল, "এবার মার খাবি।" সুকান্ত ভারী খুশি হয়ে জবাব দেয় "বাবার ত বরাবরই খেলাম এবার না হয় মারই খাওয়া যাবে।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটা মজার কথা মনে পড়ল। সেজদার তখন বিয়ে হয়েছে। বাড়ীতে নতুন বৌ এসেছে সেজ বৌদি। মাসীমার কাজের কিছুটা অংশের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে মাসীমার পরিশ্রম কিছুটা লাঘব করবার চেষ্টা করছে নতুন বৌ। বাড়ীর ছোটরা খেতে বসেছে, সঙ্গে ছোটমামা আর আমি। সেজ বৌদি পরিবেশনে ব্যস্ত। সুকান্তর মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে যায় এবং দ্রুত নির্দেশ দেয় সকলকে—ভাতের হাঁড়ি খালি করতে হবে। ছোটদের মধ্যে থেকে বারবার আওয়াজ ওঠে "আর দুটি ভাত দাও।" সেজ বৌদিও হাসি মুখে পরিবেশন করে চলেছে। কিন্তু এতগুলো মুখের চিৎকার বন্ধ করা ক্রমশই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। কারণ একজনের পাতে ভাত দিতে না দিতেই আরেকজনের থালা খালি। ওধারে তার নবজাত

শিশু টার্জেন মাতৃ-সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে। সেজ বৌদি দিশেহারা হয়ে তখনও ছোটদের দুরন্ত ক্ষুধা মেটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে হাঁড়ি খালি এবং অতগুলি বালকের "ভাত চাই" "ভাত চাই" রবে সেজ বৌদি হতবুদ্ধি হয়ে কাঁদতে শুরু করল। এই প্রচণ্ড কোলাহল এবং কান্নাকাটির আওয়াজে মাসীমা ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং নিমেষেই অবস্থাটা বুঝে নিয়ে সুকান্তর পিঠে এক চড মারলেন। বাকি সকলে মুহূর্তেই নাগালের বাইরে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সুকান্তর আর একটি কীর্তির কথা, অর্থাৎ দুষ্টু পরিকল্পনার কথা মনে পড়ছে। খোকন আর সুকান্ত ওদের কলেজ স্ট্রীটের বাসায় স্নান করতে গেছে। এখানেও সুকান্তর একই ইচ্ছা— চৌবাচ্চা খালি করতে হবে। সেই ব্যবস্থা মত স্নানের ঘটা লেগে গেল। বেলা দ্বিপ্রহর, গরমের দিন, এধারে চৌবাচ্চাও খালি। বাড়ীওয়ালারা এই ব্যাপারটা দেখে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে রাগারাগি শুরু করল। মাসীমার বকুনির ভয়ে সুকান্ত আর খোকন নিমেষে ভিজে প্যান্ট পরেই পালিয়ে গেল বাড়ী ছেড়ে। দিনের শেষে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দুটি বালক চোরের মত বাড়ী ফিরল—প্যান্ট তখন শুকিয়েছে বটে, কিন্তু মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার রূপ নিয়েছে। মাসিমা কাঁদবেন, না হাসবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

সুকান্তর সঙ্গে তার সেজ বৌদির সম্পর্ক কেমন ছিল, সুকান্তর লেখা পত্রাংশে তার আভাস পাওয়া যায়। "......সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা বেশ অতিমাত্রায় খুশি ছিল, একটা সাধু সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেজবৌদির বাড়ীর উদ্দেশ্যে। কারণ কয়েকদিন আগে দাদার নতুন বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নিজের পৌরুষের ওপর ধিক্কার এসেছিল, তাই ঠিক করলাম, নাঃ, আজ বৌদির সঙ্গে আলাপ করে ফিরবই। যে বৌদির সঙ্গে আগে এত প্রীতি ছিল, যার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি, সাঁতার কেটেছি, রাতদিন বকবক করেছি সেই বৌদির সঙ্গে কি আর সামান্য দরজা খোলার ব্যাপারে রাগ করে লাভ আছে ....। সুতরাং মহানুভব (!) সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর বৌদির বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রথমে দাদা না থাকায় বৌদিই প্রথম কথা কয়ে লজ্জা ভেঙে দিয়ে অনেক সুবিধা করে দিলেন, তারপর

ক্রমশ অল্পে-অল্পে বহু কথা কয়ে, অন্তরঙ্গ হয়ে, বৌদির স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনে পরিতোষ লাভ করে, তারপর কিছু রাজনৈতিক কাজ ছিল, সেগুলো সেরে সন্ধ্যায় বৌদির ওখানে পুনর্গমন করলুম এবং সদ্য আলাপের খাতিরে বৌদির পরিবেশিত চা পান করে আবার বকবক করতে লাগলুম। সাড়ে আটটার সময় বাড়ী যাব ভেবে উঠলাম এবং সেদিন ওখানে থাকব না শুনে বৌদি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু দাদা এসে পড়ায় সেদিন আর বাড়ী ফেরা হল না।.........” (পত্রগুচ্ছ : সুকান্ত সমগ্র)

সুকান্তর দাদা মনমোহন বইয়ের ব্যবসায়ী, তাই বাড়ীতে তাঁর গাদাগাদা নতুন বইয়ের ছড়াছড়ি—ছোটদের আর বড়দের গল্প কবিতা নাটক উপন্যাস। কেমন যেন মিষ্টিমিষ্টি অচেনা গন্ধ। এই বইগুলো বালক সুকান্তকে আকর্ষণ করত। বই পড়তে ও ভালবাসত। বিশেষ করে কবিতার বইয়ের প্রতি ওর ছিল প্রবল আকর্ষণ।

যোগীন্দ্রনাথের ছড়া সুকান্তর শিশুমনে দাগ কেটেছিল। একটু বড় হয়ে সুকান্ত পরিচিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম, সুনির্মল বসু এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে। এই সব কবির বহু কবিতা ওর কণ্ঠস্থ ছিল। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ এবং সুনির্মল বসুর ছন্দোময় কবিতাগুলির প্রতি ওর এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। “রাঙা মামার ভাঙা আসর” নামে সুনির্মল বসুর একখানা বই আমাকে সে উপহার দিয়েছিল। কারণ আমিও সুনির্মল বসুর ভক্ত ছিলাম। বই পড়ার প্রতি ওর আগ্রহ বরাবরই ছিল একথা আগেই বলেছি। কাজী নজরুলের রচনার বিশেষ স্বাদ আমরা তখনও গ্রহণ করতে পারি নি; যদিও তাঁর ছন্দোময় কবিতা আমাদের মন্দ লাগত না। অগ্নিবীণার কবিতাগুলো কিন্তু সুকান্তকে অত অল্প বয়সেই আকর্ষণ করত। ওর মন যেন আমাদের আগে আগে চলত। ওকে দেখেছি, অবশ্য আরও একটু বড় হয়ে, ও বড়দের সঙ্গে সমান তালে সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় মত্ত হত। আমরা সে সময় সম্যক জ্ঞানের অভাবে চুপচাপ বসে থাকতাম। পথের পাঁচালি পড়ে ওর খুব ভাল লেগেছিল এবং আমাকে পড়তে দিয়েছিল। আমি কিন্তু সেই বয়সে ঐ বইয়ের রস গ্রহণ করতে পারি নি। পড়তে শুরু করেছি বহুবার, কিন্তু শেষ করতে উৎসাহ পাই নি। বাস্তবিক ও যখন বলত, ধর্মগ্রন্থের

মত এ বই সকলের ঘরে ঘরে থাকা উচিত, তখন আমি তার কারণ খুঁজে পেতাম না। স্বাভাবিক সংকোচে জিজ্ঞাসা করতেও পারতাম না, কেন এ বইয়ের গুরুত্ব এত ওর কাছে। এর আরও কিছুকাল পরে একদিন সে প্রবোধকুমার সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে" পড়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করল। হিমালয় নাকি ওকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করছে, ডাকছে হাতছানি দিয়ে! এ বইখানাও আমি তখন পড়তে উৎসাহ বোধ করিনি। আগেই বলেছি, ও আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল আর ওর মন ছিল অনেক পরিণত। ওর দাদার বাড়ীতে বসে আমরা তখন পড়তাম শিশুসুলভ এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বা দু-একটা ছোটখাট কবিতার বই।

বই পড়া ছাড়া সেজদার বাড়ীতে আর একটি জিনিসের প্রতি ওর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, তা হচ্ছে রেডিও। তখন ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না, ফলে আমাদের সঙ্গে তখন রেডিওর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি। ওর দাদার একটা মজাদার খেয়াল ছিল, রেডিও কত জোরে বাজতে পারে তার চেষ্টা করা। ৩৪ হরমোহন ঘোষ লেনে তার বাড়ীতে এত জোরে রেডিও বাজত যে রাস্তার মোড় থেকে তা শোনা যেত। যদি এই ব্যাপারে কেউ প্রশংসাবাণী শোনায়, দাদা তাহলে তার ওপর ভারী খুশি হতেন। এটা সুকান্তর কাছে একটা পরম কৌতুকের বিষয় ছিল। আমি একদিন ওখানে গেছি, সুকান্ত বলল, "দাদা ফিরলেই রেডিওটার প্রশংসা করবি, বিশেষ করে এর জোর আওয়াজের কথা উল্লেখ করবি।" আমি ভেতরের কথা বিশেষ জানতাম না। সেজদা ফিরতেই আমি সে কথা বললাম এবং তাঁকে বেশ খুশিখুশি মনে হল। বললেন, "আমি একটা এমন শক্তিশালী স্পীকার লাগাব যে পাড়ার আর কোন রেডিও শোনা যাবে না। আমি এসব মিনমিনে রেডিও দেখতে পারি না।" সুকান্তর চোখে মুখে তখন কৌতুকের হাসি।

এইখান থেকেই রেডিওর প্রতি সুকান্তর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। এই বাড়ীতে বসেই আমরা রেডিওর নানারকম অনুষ্ঠান শুনতাম।

দাদাকে সুকান্ত ভালবাসত আর একটা কারণে। দাদা চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। সুন্দর তাঁর তুলির টান। চর্চার অভাবে অবশ্য এখন তা নষ্ট হয়ে গেছে। এই ছবি আঁকা সম্বন্ধে সুকান্তর দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পরবর্তী জীবনেও সুকান্তর শিল্পপ্রীতি অটুট ছিল এবং সুযোগ সুবিধামত বিভিন্ন আর্ট এগজিবিশনে যাতায়াত করত। এসব ব্যাপারে খোকন এবং তার বন্ধু অরুণাচল বসুই ছিল তার সঙ্গী।

সুকান্তর উপনয়নের আগের দিন খুব সম্ভব ১৯৪১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সেজবৌদি সুকান্তকে একটা টাকা দিয়েছিল তার পছন্দ মত কিছু খাবার কিনে খাবার জন্যে। তখনকার দিনে এক টাকার বেশ মূল্য ছিল কারণ এখনকার মত জিনিসপত্রের দাম ছিল না এত বেশী। যতদূর মনে করতে পারি এক টাকা দিয়ে তখন চৌষট্টিটা রসগোল্লা এবং দুশো ছাপ্পান্নটা রসমুণ্ডি পাওয়া যেত। এক টাকায় চৌষট্টিটা কচুরী অথবা সমপরিমাণ সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত। ছোট কচুরি পয়সায় দুটো, সঙ্গে দিত ভালো ঘিয়ে তৈরী হালুয়া। তখন এক মণ চালের দাম ছিল চার পাঁচ টাকা এবং মাছ, মাংস ও অন্যান্য খাদ্য ছিল অনেক সস্তা। যেমন ডিমের জোড়া তিন পয়সা (বর্তমান মুদ্রায় পাঁচ পয়সা) । মাংস ছিল আট আনা সের আর কাটা পোনার দামও অনুরূপ। আস্ত ছোট মাছের দর চার আনার মধ্যেই ছিল অর্থাৎ বর্তমান পঁচিশ পয়সা। আর সিনেমার টিকিটও ছিল সাড়ে চার আনা (সর্বনিম্ন শ্রেণী) ।

এক টাকার মূল্য তখন চোষট্টিটি বড় তামার পয়সা। এছাড়া আধপয়সা এবং পাই পয়সাও ছিল। তখনকার দিনে এক টাকার সমমূল্য ছিল ১৯২ পাই পয়সা। এই পাইগুলোও তামার এবং বর্তমান পয়সার চেয়েও আকারে বড় ছিল। এক টাকা এক ভরি রূপোর সমান।

তাই তখনকার দিনের এক টাকার মূল্য বর্তমান হিসাবে কম করে পনের টাকা ধরা যেতে পারে। সুকান্ত এই টাকাটা নিয়ে আমার কাছে চলে এলো, জানতে চাইলো কেমন করে টাকাটা সদ্ব্যবহার করা যায়। তখন এক টাকায় অকৃটোফটো অর্থাৎ আটরকম ভঙ্গিমায় পাসপোর্ট মাপের আটখানা ছবি তোলা যেত। আমি সুকান্তকে সেরকম ছবি তোলার কথা বলেছিলাম। ও প্রথমে রাজী হয় নি। সিনেমা টিকিটের মূল্য অল্প থাকায় ও প্রস্তাব করল কোন চলচ্চিত্র দেখবার ও বাকি পয়সা দিয়ে কিছু খাবার। যাই হোক, দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। একটা পানের দোকানের আয়নায় ও

নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে বলল, "ভাবতে খারাপ লাগছে কালকে আমার মাথায় এই চুলগুলো আর থাকবে না। তাই তোর ছবি তোলার প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া যেতে পারে।"

ডানডাস হোস্টেলের পাশে স্টুডিও মেট্রোপোল নামে একটা স্টুডিও ছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণী) উপরে। এখনও সেখানে একটা স্টুডিও আছে; অবশ্য তার নাম স্বতন্ত্র। আটখানা ছবি তোলা হল। চারখানা সুকান্তর একক চিত্র এবং বাকী চারখানা আমার একক চিত্র। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সুকান্তর যে ফটোগুলো এখন দেখা যায় এগুলো সেই চিত্র। সুকান্তর গালে হাত দিয়ে তোলা ছবিটিরও একটা ইতিহাস আছে। আগের ছবিগুলো মোটামুটি একই ধরনের হচ্ছিল তাই বৈচিত্র্য আনবার জন্যে আমার কোটটা পরতে বলেছিলাম। যখন শেষ ছবিটা তোলা হচ্ছে তখন বললাম যে যেহেতু এটা শেষ ছবি তাই এ খানায় একটু বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। আমার কথায় ও তখন একটা নতুন ভঙ্গিমায় স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল এবং আমার অনুরোধে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। এ ছবিখানা অপূর্ব সুন্দর হল। সুকান্তর মৃত্যুর পর সেই স্টুডিওতে গিয়ে পুরনো নেগেটিভ বার করে কতকগুলো ছবি ছাপিয়ে সুকান্তর অনুরাগীদের দিয়েছিলাম। সারস্বত লাইব্রেরীর সুকান্তর ভায়েরা আমার সূত্রেই ছবিগুলো পেয়েছিল। পরে আরও কিছু ফটো যোগাড় করতে গিয়ে দেখলাম সে স্টুডিওটি উঠে গেছে এবং পরিবর্তে অন্য স্টুডিওটি চালু হয়েছে।

১১

সম্ভবত ১৯৩৮ সালেই বড়দা মারা যাবার পর আমার পিসীমার বাড়ীর অন্যান্যেরা বেলেঘাটার বাড়ী ছেড়ে শ্যামবাজারে বিপিন মিত্র লেনের বাড়ীতে আসেন একথা আগেই বলেছি। সুকান্ত তখন বেলেঘাটায় (৩৮.হরমোহন ঘোষ লেন) থাকে। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে এসময় আমি নতুন সাইকেল চড়তে শিখেছি, তাই সাইকেলের ওপর আমার দুর্দান্ত লোভ। আমাদের পিসতুত এবং সুকান্তর জ্যাঠতুত দাদা নতেদার (মনোজ ভট্টাচার্য) ও সুশীলদার

একবন্ধু প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য তার সাইকেল নিয়ে সাধারণত প্রতি শনিবারেই বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজারের বাড়ীতে আসতো এবং নতেদা ও প্রভাতদা যেত কোন না কোন চলচ্চিত্র দেখতে। সেই অবসরে ঐ সাইকেল নিয়ে ছুটতাম বেলেঘাটায় সুকান্তর কাছে। অন্তত ঘণ্টা তিনেক সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত, কারণ জানি এর মধ্যে আর সাইকেলের দরকার হবে না। কখনও বা ওখানে আড্ডা দিয়ে চলে যেতাম সুকান্ত এবং তার দু' একজন বন্ধুবান্ধব যেমন রবীন, ননীগোপাল, অরুণাচল এদের কাছে। বেশীর ভাগ দিন অবশ্য ওকে সাইকেলের পেছনে চাপিয়ে নিয়ে আসতাম শ্যামবাজারে। এমনি করেই যেন শ্যামবাজারে নিয়মিত আসবার অভ্যাস হয়ে গেল সুকান্তর। যখনই কারুর সাইকেল আমার হাতে আসত, তা দিনের যে কোন সময়ই হোক না কেন, আমি ছুটতাম সাইকেল নিয়ে বেলেঘাটায় এক দুর্নিবার আর্কষণে। আমার বাড়ীতে শাসন ব্যবস্থা তেমন কঠিন না থাকায় যখন তখন বাড়ীর বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে খুব অসুবিধা ছিল না। আমার এক বন্ধু ছিল নীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় যার সঙ্গে সুকান্তর পবিচয় হয়েছিল। নীরদের একখানা সাইকেল ছিল; সেখানা প্রায়ই আমি তার কাছ থেকে নিয়ে চড়তাম। বেলেঘাটা যাওয়ার আমার সাইকেলের পথ ছিল রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। এই পথ ধরে দুরন্ত বেগে সাইকেল চালিয়ে আমি ছুটতাম। জোরে সাইকেল চালানটা যেন আমার একটা নেশা ছিল। যে পথ দিয়ে ছুটে গেছি বেলেঘাটায়, তার কিছুক্ষণ পরেই হয়ত দেখা যেত যে আমি দুর্দান্ত বেগে সেই পথ ধরে ছুটে আসছি পেছনে সুকান্তকে নিয়ে। একদিন ওখানে গিয়ে দেখলাম খোকনও রয়েছে। সাইকেলের সামনে সুকান্তকে আব পেছনে খোকনকে নিয়ে হাওয়ার বেগে আমি শ্যামবাজারে পাড়ি দিলাম। পথে আসবার সময় সম্ভবত দুজন মনোমত সঙ্গী পাওয়ার আনন্দে সাইকেলের হাতল ছেড়ে চালাতে গিয়ে সকলে মিলে হুড়মুড় করে পডলাম রাস্তায়। উল্লাসে একটু গানও বোধ হয় গেয়ে উঠেছিলাম। পড়ে গিয়ে সকলেরই একটু-আধটু হাত-পা ছড়ে গেল। সুকান্ত রেগে গেল আমার এই অসাবধানতায়, বিশেষত বাহাদুরি করবার জন্য। তখনই সে ফিরে যেতে চাইল বেলেঘাটায়। যাই হোক, খোকনের মধ্যস্থতায় একটা মিটমাট হল।

আমরা আবার শ্যামবাজারে যাত্রা করলাম এবং আমাকে সাইকেলের গতিবেগ কমাতে হল।

এখনও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে গেলে এইসব ছোটখাট স্মৃতি আমায় উতলা করে তোলে। মনে পড়ে আত্মীয় স্বজন মহলে, বিশেষ করে বিপিন মিত্র লেনের বাড়ীতে তার ভারি আদর ছিল। এখানে তখন তার গুণমুগ্ধ জ্যাঠতুত ভাইরা, বড়বৌদি মেজবৌদি সব থাকে। এছাড়াও আর একজন এখানে থাকে, সে হল আমার জ্যাঠতুত বোন রমা। আমার জ্যেঠিমার অকাল মৃত্যুতে রমা পিসীমার বাড়ীতেই থাকত। সে আমাদের থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট, কিন্তু আমাদের সব সময়ের সঙ্গী এবং বন্ধু। সুকান্তকে নিয়ে আসার পরই যেন জমে উঠত আমাদের আনন্দ-মেলা।

নিজের বাড়ীর বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের তুলনায় সুকান্তর কাছে এ বাড়ীর আকর্ষণ তাই যেন দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে দেখা দিল। ক্রমশই সে যেন এ বাড়ীর একজন হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনও সে শ্যামবাজারে নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু করে নি। মাঝে মাঝে তখন সে আসত এবং অল্প কয়েক ঘণ্টা থেকে চলে যেত। এর আরও কিছুদিন পরে সে শ্যামবাজারে এলে আমাদের অনুরোধে মাঝে মাঝে দু'একদিন কাটিয়ে যেত।

একদিন এমনি সাইকেল চালিয়ে গেছি বেলেঘাটায়—তখন ও খুব ব্যস্ত—'সপ্তমিকা' নামে হাতে-লেখা পত্রিকা, যার সম্পাদক ও নিজে, তার শেষ পর্যায় নিয়ে। পত্রিকাখানা হাতে নিলাম। "কালার কীর্তি" নামে একটা সুন্দর হাসির গল্প লিখেছে, দেখলাম। আর একজনের একটি রচনা "কবি, কফি ও কপি" নিয়ে। শুনলাম মূল রচনাকারীর বিশেষ কিছু আর রচনায় নেই, কারণ সুকান্তর হাতে সংশোধিত হয়ে ওটা তারই কবিতা হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে সে বরাবরই উদার ছিল। বহু লোকের লেখা সে শুদ্ধ করেছে, বা সম্পূর্ণ নতুন লেখায় রূপান্তরিত করেছে, কিন্তু সে-সব লেখায় কোনদিনই ওর ছিল না অনুমাত্র লোভ, আত্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা। বরং অপরকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়াই ছিল তার স্বভাব-ধর্ম।

একবার ওর উৎসাহে একটা গল্প লিখে ফেললাম। গল্পটাকে ও সংশোধন করে দিল। ওর কাছেই শিখলাম গল্পের মূল বিষয়বস্তুকে, সরস অংশটাকে বা

গল্পের মূল রহস্যকে আড়াল রাখতে হয়। যতদূর সম্ভব এ রহস্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে গল্পের শেষে গিয়ে মূল রহস্যকে প্রকাশ করাই উচিত। এতে নাকি গল্প জমে ওঠে তাড়াতাড়ি, পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকায় তা হয়ে ওঠে সার্থক রচনা। এ-সব তখন আমি কিছুই বুঝতাম না, তাই আমার গল্পের মূল রহস্যটিকে আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। গল্পটা সংশোধন করে সে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল লেখকের কর্তব্য কী। আজ ভাবলে অবাক হতে হয়; সে তখন বালক মাত্র অথচ সার্থক সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে কি পরিষ্কার জ্ঞান।

যাই হোক, 'সপ্তমিকা' পত্রিকায় সুকান্ত যে কবিতাটি লিখেছিল তার নাম 'সুচিকিৎসা'। কবিতাটি এই রকম :

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা ক'রে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, "বড়ই কঠিন ব্যামো,
এ সব কি সুচিকিৎসা ?—আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে 'এক্সরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানাতে থাকুন,
আইস-ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।
'ইনজেক্শান' নিতে হবে 'অক্সিজেন'টা পরে,
তার পরেতে দেখব এ রোগ থাকে কেমন ক'রে।"
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর ? ধন্য ডাক্তারী !!

এ ঘটনার কিছুদিন পর সম্ভবত ১৯৪১ সালে আমিও একটি হাতে লেখা পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলাম—নাম ছিল 'নাগরিক'। এখানে 'আজিকার দিন কেটে যায়' কবিতাটি প্রকাশ করেছিলাম সে কথা আগেই বলেছি। এই পত্রিকাতে নিচের কবিতাটি সুকান্তর স্বনামেই প্রকাশিত হয়েছিল। এটার রচনাকাল সম্ভবত ১৯৪০ সাল।

ভবিষ্যতে

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ-যজ্ঞে হবরে ইন্ধন।
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে
রক্ত পণে দিব ডালি ভারত মাতারে
মূর্খ যারা অজ্ঞ যারা যে জন বঞ্চিত
তাদের তরে মুক্তি সুধা করব সঞ্চিত।
চাষা মজুর দিন দরিদ্র সবাই মোদের ভাই
এক স্বরে বলবো মোরা স্বাধীনতা চাই।
থাকবে নাকো মতভেদ আর মিথ্যা সম্প্রদায়
ছিন্ন হবে ভেদের গ্রন্থি কঠিন প্রতিজ্ঞায়।
আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।

এ সময় সুকান্তর বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। দেশ তখন পরাধীন। এই বালক কবির মনেও স্বাধীনতার স্পৃহা কতখানি গভীর ছিল তার প্রকাশ এই কবিতায় পাওয়া যায়।

স্বদেশ এবং স্বজাতি সম্পর্কে সুকান্তর মনে গভীর প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। এ সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা ছিল তার। কোন একটা অনুষ্ঠানের শুরু হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ায় আমি বাঙালীর সময়জ্ঞান সম্বন্ধে সমালোচনা করে বিরূপ মন্তব্য করেছিলাম। সুকান্ত সঙ্গে সঙ্গে কঠিন স্বরে বলল "দেখ, পৃথিবীর কোনো স্বাধীন জাতি নিজেদের গাল দেয় না, কিন্তু একমাত্র আমরাই সমস্ত ব্যাপারেই নিজেদের গাল দিই। এতে কোন লাভ হয় না, কিন্তু হতাশার সৃষ্টি হয় মানুষের মনে।" যেহেতু আমিও বাঙালী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিলাম তাই এই কথায় এতটা অপ্রস্তুত হয়েছিলাম আর লজ্জা পেয়েছিলাম যে সেকথা আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে।

প্রথম জীবনে সুকান্ত হাতে লেখা পত্রিকার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিল। নিজে প্রকাশ করেছে কয়েকটি, অপরকে উৎসাহ দিয়েছে এই ধরনের পত্রিকা

প্রকাশে। নিজে লেখা দিয়েছে, অপরের লেখা সংশোধনও করে দিয়েছে। এই পত্রিকাগুলোকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্যে সে তার শিল্পী বন্ধু অরুণাচল বসুর সাহায্য নিয়েছে প্রায়ই। এ ছাড়া প্রয়োজমত কোন লেখার শেষে বাড়তি স্থানটুকু নিজের আঁকা ছবিতে ভরে দিত। মাত্র দু-তিন বছর তার এই উৎসাহ বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এগুলোকে নেহাতই সময়ের অপব্যয় এবং ছেলে মানুষী বলে মনে করত। সে বন্ধু অরুণাচলকে লিখেছিল "... .... তোরা একটা 'পত্রিকা' বার করছিস। ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন এই, হাতের লেখা পত্রিকা বার করবার মতো মনের অপরিপক্কতা তোর আজো আছে? কথাটা নীরস হলেও একথা বলবই যে, এই ধরনের 'খই ভাজায়' এই দুর্দিনে কাগজ ও সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না! .. .." (পত্রগুচ্ছ : সুকান্ত সমগ্র)

বিপিন মিত্র লেনের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আমরা সমস্ত বাড়ীর আলো নিভিয়ে লুকোচুরি খেলতাম। সমগ্র পরিকল্পনাটা নতেদার এবং তারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী ছিল। ছোটদের মধ্যে আমি, ঘেলু, রমা ও সুকান্ত। আমাদের খুব উৎসাহ ছিল এই খেলায়। বিশেষ করে বৌদিরাও এ খেলায় যোগ দেওয়ায় খেলা বেশ জমে উঠতো। আলো জ্বালানো ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং আমাদেব লুকোবার জায়গাগুলো ছিল অভিনব আর খুশিমত। কারণ এই তেতলা বাড়ীর সবটাই ছিল আমাদের খেলবার এলাকা। একদিন এই রকম খেলা বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু অল্প পরেই এক সমস্যা দেখা দিল। সুকান্ত এমন জায়গায় লুকিয়েছে যে তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত আলো জ্বেলেও ওকে পাওয়া গেল না। সবাই বিস্মিত আর কৌতূহলী। সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, সুতরাং ও যে বাইরে যায় নি তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল; অথচ গেল কোথায়! পিসিমা রাগারাগি শুরু করলেন এই বিচিত্র খেলার জন্য। সুকান্ত বাড়ীর মধ্যে থেকে কোথায় যেতে পারে, এ চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। তখন বাড়ীর লুকোবার মত সম্ভব অসম্ভব সমস্ত অঞ্চল তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করেছি, কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা, সুকান্ত উধাও। যখন এমনি খোঁজা-খুঁজির পালা চলছে তখন নতেদার মনে একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দেয়—পাশের বাড়ীর এক কঠিন কণ্ঠস্বরে। সে কণ্ঠস্বর

যথেষ্ট বিরক্ত, সন্দিগ্ধ এবং ক্রুদ্ধ। সেই কণ্ঠস্বর একটু উচ্চনাদে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলে চলেছে কোন এক অনিশ্চিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। এই কণ্ঠস্বর নতেদাকে আকৃষ্ট করে। তার শেষ দিকের বক্তব্য মোটামুটি এই রকম "……ছি ছি কি অন্যায়, এভাবে উঁকিঝুঁকি ………তাছাড়া বাড়ীতে বৌমা এসেছেন ………এ অসভ্যতা……… ইত্যাদি।" নতেদার অনুমান সত্য হয় এবং সুকান্তকে পাওয়া যায় তিনতলার ছাতের ছোট একটা ঘরের ঢালু টালির ছাতের ওপারে নিচু হয়ে বসে থাকা অবস্থায়। সেই কণ্ঠ সুকান্তর উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হচ্ছিল। কারণ কণ্ঠের মালিকের অনুমান কেউ পাশের বাড়ীর টালির ছাদ থেকে তার অন্তঃপুরে দৃষ্টি দিচ্ছে লুকিয়ে। তার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে গেছে। সুকান্ত কানে কম শোনে, তাই এই একটানা বাক্যবাণ তার কানে পৌঁছয় নি।

সুকান্তকে নামানো হল উচ্চ আসন থেকে। প্রথমে একচোট হাসাহাসি। পরে নতেদার মুখে সব কথা শুনে সুকান্ত লজ্জায় জিভ কেটে দ্রুত নিচে নেবে গেল।

নতেদার আধুনিক কবিতা পড়ার এবং গদ্য কবিতা লেখার শখ ছিল। তার একটা কবিতার খাতাও ছিল। ১৯৪০ সালের গরমের ছুটিতে সুকান্ত বেশ কিছুদিন এই বাড়ীতে এবং আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে থেকে ছিল। এছাড়া মামাবাড়ীতেও কিছুদিন কাটিয়ে এসেছিল। তখন আমরাও মামা-বাড়ীতে রয়েছি। আমরা দলবেঁধে লেকে স্নান করতে যেতাম, মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য সাঁতার কাটা। এছাড়া খুব ভোরে উঠে খোকন, আমি আর সুকান্ত বহুদূর পর্যন্ত বেরিয়ে আসতাম। লেকের পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া আমাদের আকৃষ্ট করত। খোকনের গানের গলা খুব মিষ্ট ছিল এবং সুকান্ত তার গান খুব পছন্দ করত। আমাদের অনুরোধে সুকান্ত অনেকগুলো গান লিখেছিল এবং খোকনকে উপহার দিয়েছিল। এগুলোই গীতিগুচ্ছ নামে প্রকাশিত হয়েছে। এর কয়েকটি গানে খোকন সুর দিয়েছিল এবং এই গান যখন সে গাইত তখন সুকান্ত বেশ মন দিয়ে উপভোগ করত। এই সব দৃশ্য এখনও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। অবশ্য এসব ১৯৪৪-৪৫ সালের কথা।
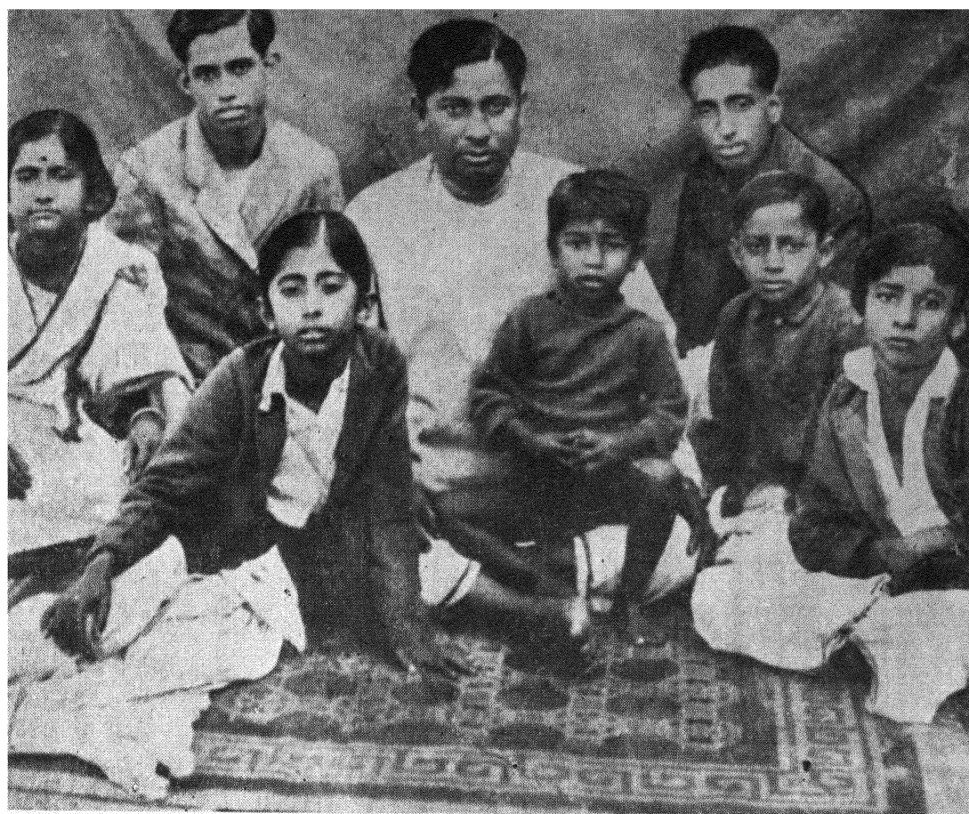
বাঁ দিক থেকে :—রাণীদি, রাখালচন্দ্র, মনোজ, সেজমেশোমশাই (সুকান্তর পিতা) নিবারণচন্দ্র ও তাঁর কোলে সুকান্ত, মনোমোহন, শচীন্দ্র ও সুশীল

বাঁ দিক থেকে প্রথম সারি (বসে) :—গুঁই মাসি, ছোটমাসিমা, খোকন মামা ও সুকান্ত

দ্বিতীয় সারি :—বড়মামা, ন-মাসিমা, দিদিমা (কোলে সুকান্তর অনুজ প্রশান্ত), সেজমাসিমা, ও সুশীল
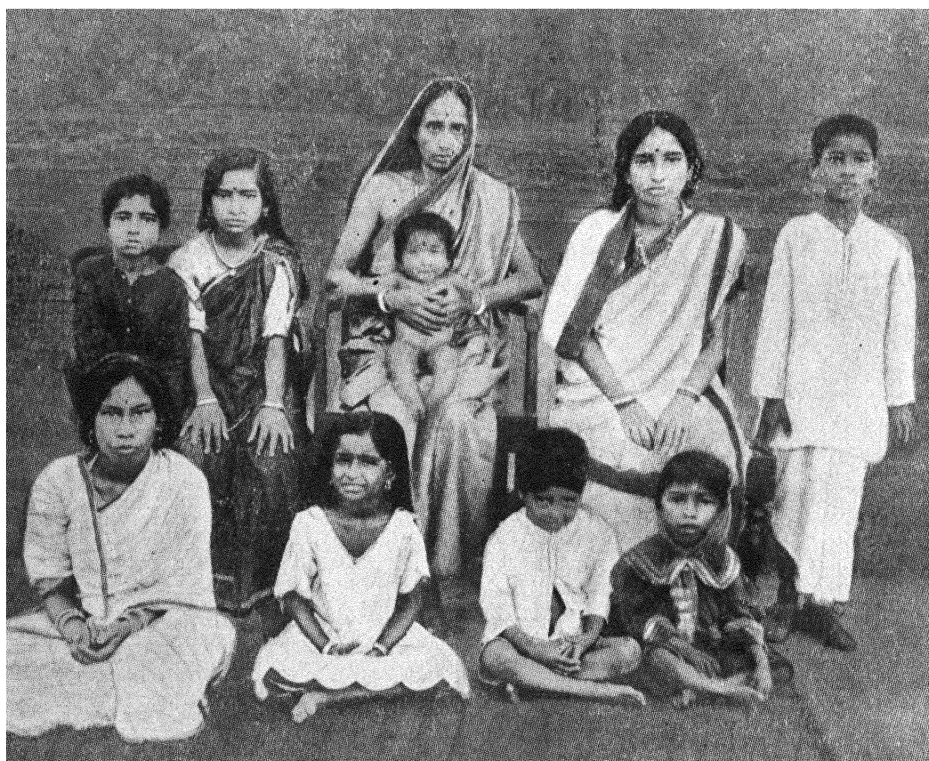
বাঁ দিক থেকে :—সুশীল, আমার মা, দাদামশাই সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, দিদিমা, গুঁই মাসি, মেজমাসিমা, সেজমাসিমা (সুকান্তর মা) ও ন-মাসী
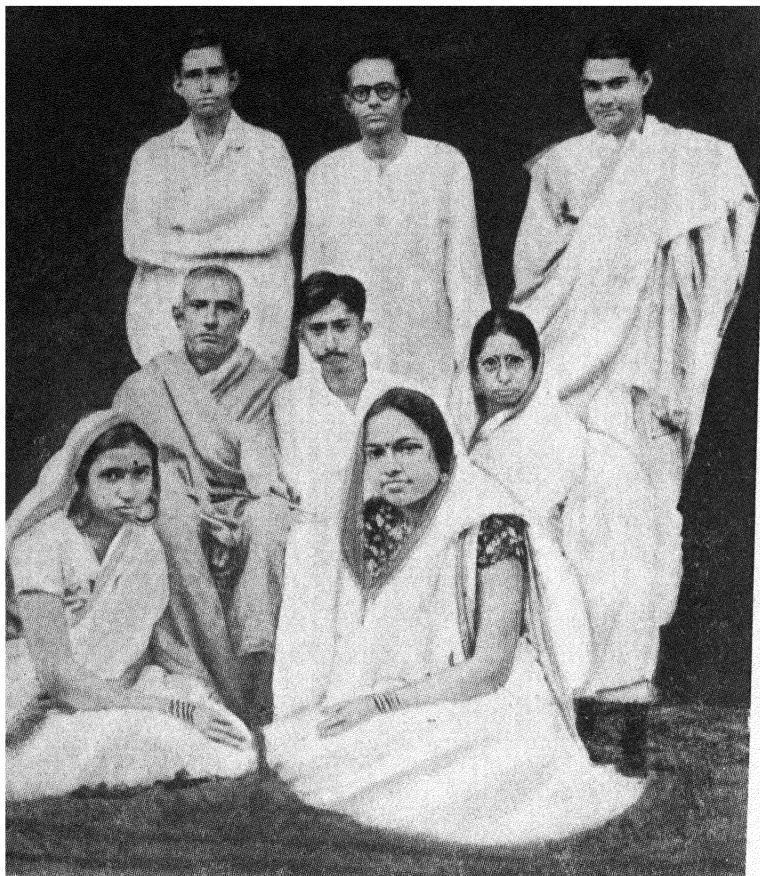
বাঁ দিক থেকে প্র
সারি :—(দাঁড়ি
রাখালচন্দ্র,
নেপালচন্দ্র ও
গোপালচন্দ্র
মধ্যম সারি :—
কৃষ্ণচন্দ্র
স্মৃতিতীর্থ,
মনোজ ও
পিসিমা
তৃতীয় সারি
(মেঝেতে বসে) :
মেজবৌদি রা
ও বড় বৌদি
জ্যোতির্ময়ী

রাণীদি ও আমার
জ্যাঠতুত দিদি বিমলা

যা বলছিলাম, নতেদার এই কবিতার খাতাটা এখনও আছে। সে বছরে সুকান্ত আর নতেদা নিয়মিত কবিতা লিখত, অনেকটা প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে। তাই দুজনেরই এই গরমের ছুটিতে অনেকগুলো কবিতা লেখা হয়ে গেল। প্রতিদিন একটা কবিতা লেখা ছিল ওদের লক্ষ্য। নতেদার উৎসাহ ছিল এ ব্যাপারে অসীম। তার একটা কবিতা "রিক্সাওয়ালা" সুকান্তর খুব ভাল লাগে। তাই সে নিজের হাতে এই কবিতাটির নিচে রিক্সাওয়ালার ছবি এঁকে দেয়। সে ছবিটি নতেদার একটি পরম সম্পদ হয়ে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

১২

এরপরে পিসিমারা বিপিন মিত্র লেনের বাড়ী ছেড়ে ২/এ বৃন্দাবন পাল লেনে বাস করতে আসেন। ৭/২ বৃন্দাবন পাল লেনে তখন আমাদের বসবাস। তাই দুটো বাড়ী কাছাকাছি হয়ে যাওয়ায় পিসিমার বাড়ী যাওয়া আমাদের বেড়ে গেল। তেমনি সুকান্তরও আসা যাওয়াও এই দু বাড়ীতে নিয়মিত চলতে লাগলো। আমাদের সেই সময়কার দিনগুলো ছিল আনন্দময় ব্যস্ততায় ভরা।

যতদূর মনে পড়ে এই সময়ে নতেদা কোন কোন বিখ্যাত ইংরাজ কবির কবিতা আমাদের বিশেষ করে সুকান্তকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাত এবং তার বাংলা মানে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিত। ভারী সুন্দর লাগত এই সময়গুলো, কারণ ভাষার ব্যবধানের জন্যে আমরা যে সব কবিতার রস গ্রহণে অপারগ ছিলাম তার রসাস্বাদন সম্ভব হচ্ছিল এই পন্থায়। নতেদা বরাবরই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছে এবং নানা অজানা বিষয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। তার এই গুণটির জন্য সে আমাদের ছোটদের মহলে বরাবরই খুব প্রিয়।

প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছায়াচিত্র তখন খুব নাম করেছে। নতেদার শখ হল এই চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য বাড়ীতে অভিনয় করবার। ছবিটি নতেদা এতবার দেখেছে যে তার সমস্ত কথোপকথন তার মনে রয়েছে। এই নির্দিষ্ট

কয়েকটি দৃশ্যের লেখক যেমন সে নিজেই তেমনি পরিচালনা এবং প্রযোজনার পূর্ণ দায়িত্বও তার। মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য বাড়ীর কয়েকজনকে নিয়ে একটু আনন্দ করা। দর্শক দাদা বৌদিরা আর ছোটদের মধ্যে রমা এবং তার বন্ধুরা আর ঘেলু। অভিনয়ে আমি, সুকান্ত, নতেদা আর আমার জ্যেঠতুত দাদা শচীনদা। ভূমিকা লিপি এই রকম : প্রমথেশ বড়ুয়া নতেদা, পঙ্কজ মল্লিক শচীনদা, কানন দেবী আমি আর মেনকা দেবী সুকান্ত। এই অভিনয় খেলায় এইভাবেই আমরা খেলেছিলাম। সাজ পোষাকের ভার নিয়েছিল বৌদিরা, বিশেষ করে এই দুই মহিলা শিল্পীর শাড়ী গয়না ইত্যাদির যোগান দেওয়া এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমাদের মহিলায় রূপান্তরিত করার দায়িত্ব এদের ওপরে পড়েছিল। সুকান্ত আবার কানে কম শোনে। তাই সংলাপগুলো ঠিকমত তার কানে পোঁছে দিয়ে তার জবাব আদায় করার ব্যাপারে বেশ মজা হচ্ছিল। এই অদ্ভুত নাট্যের কথা নিয়ে পরবর্তী কালে বহুদিন আমি, রমা, সুকান্ত কত সরস আলোচনায় সময় কাটিয়েছি।

একবার শিবরাত্রির দিনে আমরা অর্থাৎ সুকান্ত, ঘেলু আর আমি স্থির করলাম সারারাত্রি জেগে কাটাব। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা একটি ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলাম। এই আসরে রমাও যোগ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিচে পিসিমা সারারাত জেগে পুজো করবেন তাই তাকে আমরা উপদেশ দিলাম, সারারাত জেগে পিসিমাকে পুজোয় সাহায্য করতে। সে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিল।

প্রথমেই সমস্যা দেখা দিল কি ভাবে রাতটা জাগা হবে। একটু আগেই ঘেলু আমাদের একটি গল্প বলেছিল ওর এক সহপাঠীর অপকীর্তির বিষয়ে। গান গাইলে কেমন হয় আমার এই প্রস্তাব সুকান্ত লুফে নিল এবং এই অপকীর্তি সম্বন্ধেই একটি দু লাইনের গান মুখে মুখে রচনা করে ফেলল। তারপরে আমরা তিনটি প্রাণী তারস্বরে সেই দুটি লাইন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগলাম। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব সুকান্তর, তা একান্তই বৈচিত্র্যময় এবং হাস্যোদ্দীপক। আমরা ঘন্টা দেড়েক এই গান গেয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, রমা তখনও জেগে। পর দিন ব্যাপারটা ওর কাছে আমাদের

লজ্জিত করে তুলল। গানের সুরের এবং রচনার অভিনবত্বে বড়রা চমৎকৃত আর পাড়ার লোক চিৎকারে বিরক্ত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই বাড়ীর ছাতে ব্যাডমিন্টন খেলা শুরু করেছিলাম আমরা ছোটরা—রমা, ঘেল্লু, সুকান্ত, আমি, আমার বন্ধু নীরদ। খোকনও মাঝে মাঝে এসে যোগ দিত। এ ব্যাপারেও বাড়ীর বড়দের বিশেষ করে নতেদার খুব উৎসাহ ছিল। সুকান্ত তখন রোজ আসত। আবার কখনও বা শ্যাম-বাজারে দু-এক দিন থেকে যেত। এই ক্লাবের নাম দিয়েছিলাম ভট্টাচার্য ফ্যামিলি ক্লাব। খেলা যখন নিয়মিত চলছে এবং প্রতিটি বিকেল আমাদের কাছে নিয়মিত আকর্ষণের ও প্রভূত আনন্দের কারণ হয়ে উঠেছে তখন মেজদা ঘোষণা করলেন যে, একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে এবং তিনি বিজয়ীকে একটি রৌপ্যপদক দেবেন। শুরু হল জোর প্রতিযোগিতা। রমা, সুকান্ত, আমি, ঘেল্লু, নীরদ ছাড়া বড়রাও এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। একে একে সবাইকে হারিয়ে একদিকে সুকান্ত আর একদিকে আমি ফাইনালে উঠলাম। যেদিন ফাইনাল খেলা সেদিন বাড়ীর সবাই হাজির, খেলাও বেশ জমে উঠলো। সুকান্ত অতি সহজেই আমাকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হল। এরপরে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে মেজদা একটি রৌপ্যপদক উপহার দিলেন সুকান্তকে। সে দিনের অনুষ্ঠান শেষে জলযোগের আয়োজন ছিল।

বড় বৌদি আমাদের বড় স্নেহ করতেন। তিনিও সুকান্তর একজন ভক্ত এবং উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এই খেলাধূলায়ও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে মাঝে পয়সা দিতেন 'কাঁচাগোল্লা' কিনে খাবার জন্যে। ঐ মিষ্টদ্রব্যটির প্রতি আমার আর সুকান্তর তখন বেশ লোভ ছিল। প্রায় প্রতিদিনই খেলাশেষে আমাদের এই কাঁচাগোল্লা জুটে যেত। এই খাওয়া দাওয়া অনুষ্ঠানের আমি একটা নাম দিয়েছিলাম 'কাঁচাগোল্লাৎসব'। সুকান্ত খেলার শেষে হেসে বলত, "ভূপেনের সেই গোল্লার উৎসব কখন হচ্ছে?"

আমার পিসিমা গিরিবালা দেবী সুকান্তকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বাস্তবিক, এমন ভালবাসা সচরাচর দেখা যায় না। মাতৃহীন সুকান্তর ওপরে তাঁর বড় মায়া ছিল। ঠিক সমভাবেই তিনি রমাকেও ভালবাসতেন

একই কারণে। সেও অকালে সুকান্তর মতই তার মাকে হারিয়েছিল। অবশ্য পিসিমার স্বভাবই ছিল মানুষকে ভালবাসা এবং তাদের মঙ্গল কামনা করা। এ মানুষটি জীবনভোর দুঃখ পেয়েছেন, শোক পেয়েছেন আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ব্যথায়। তিনি রমাকে তাঁর কাছে রেখেই মানুষ করেছেন আর যখনই পেরেছেন সুকান্তকে কাছে টেনে রেখেছেন। সুকান্তও তার জেঠিমাকে ভালবাসত এবং সময় সুযোগ পেলেই কাছে বসে গল্প করত। তিনি চাইতেন আমরা যেন নানা আনন্দে মেতে থাকি। তেমনি আবার আমরা যাতে পড়াশুনায়ও মনোযোগী হই সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

তিনি ছিলেন প্রাচীন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। কুসংস্কারের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনাগ্রহ কিন্তু পূজার্চনা এবং নিয়মিত গঙ্গাস্নান ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। তিনি ছিলেন একাহারী এবং তাঁর খাওয়া দাওয়ার সময় ছিল দিনশেষে বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময়। অতি সরল ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। আলো চালের ভাত সামান্য ব্যঞ্জন সহযোগে তিনি গ্রহণ করতেন। তাঁর খাবার সময়ে এক একদিন বিকেলে আমি, রমা আর সুকান্ত ছেলেবেলায় তাঁর পাশে গিয়ে বসতাম এবং তাঁর মাখা ভাতের দলা আমরা পরম তৃপ্তিতে খেতাম। ভাত মাখা হত সাধারণত তেঁতুল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি টকের ডাল দিয়ে।

বেশী বয়স পর্যন্ত কেউ বেঁচে-থেকে কষ্ট পেলে এবং অপরের ভোগান্তির কারণ হলে তিনি ভারী দুঃখিত হতেন। তিনি উৎকণ্ঠিত থাকতেন এই ভেবে যে তিনি নিজেও হয়ত দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে বিছানায় পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে বাড়ীর লোকদের না জানি কত কষ্ট দেবেন। তিনি ছিলেন আমার বাবা কাকা জেঠার সবার বড। তাই তাঁরা একে একে সবাই বিদায় নিলে তিনি আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৬৬ সালের শীতকালে একদিন তিনি কোন রকম রোগ ভোগ না করে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত হল।

সুকান্তর মৃত্যু পিসিমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সুকান্তর মা পরম ভাগ্যবতী তাই তাকে পুত্রশোক পেতে হয় নি। সে ব্যথাটা সে তারই জন্যে রেখে গেছে। সুকান্তর মৃত্যু সংবাদ

যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছল তখন তাঁর সমস্ত অন্তর হায় হায় করে উঠেছিল। তিনি চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করেন। যে মানুষ এতগুলো মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছেন, হারিয়েছেন নিজের প্রিয় পরিজন, তাঁর কাছেও এ মৃত্যু গভীর বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সুকান্তর কবিতার বইগুলি যখন একটির পর একটি প্রকাশিত হতে লাগল এবং যখন তিনি জানালেন যে "তাঁর" সুকান্ত সবাকার মন জয় করেছে তখন তাঁর আনন্দের আর সীমা ছিল না। এ ছাড়া সুকান্তর বিখ্যাত কবিতা "রানার" রেকর্ড হয়ে যখন প্রচারিত হল তখন পিসিমার চোখে দেখেছি আনন্দাশ্রু।

১৩

১৯৪০ সালে পিসিমারা বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ী ছেড়ে ১১/ডি, রামধন মিত্র লেনে উঠে আসেন এবং এখনও মেজদা, নতেদা আর তাদের ছেলে-মেয়েরা এখানেই রয়েছে।

পনেরই আগষ্ট ১৯৪০ সালে ছোড়দার (নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য) বিয়ে হয়। বড়দা ও মেজদার বিয়ের সময় আমরা নিতান্তই শিশু। তাই আস্তে আস্তে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড়বৌদি আর মেজবৌদিকে দেখেছি। সুতরাং তাদের এ বাড়ীতে আসার ঘটনা আমাদের মনে কোনও কৌতূহল বা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। অতি শিশুকাল থেকেই তাদের দেখছি। এ ব্যাপারে সুকান্তর অনুভূতি ছিল আমারই মত। ছোড়দার বিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে একটা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। বাড়ীতে বৌদি হয়ে নতুন যে আসবে সে কেমন হবে, আমাদের সঙ্গে মিশবে ত? কেমন ব্যবহার করবে আমাদের সঙ্গে? এই নিয়ে চলল আমার আর সুকান্তর গোপন আলোচনা আর অনেক গবেষণা। ঘেলু আর রমা অবশ্য এ ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। এ সম্বন্ধে তাদের কোন কৌতূহল আছে কিনা বোঝা গেল না। 'বৌদি' নামে যে মিষ্টি যাদু আছে তা যেন আমাদের সম্মোহিত করল, ভাবিয়ে তুলল।

আমরা স্থির করলাম নতুন বৌদির সঙ্গে বেশী কথা বলব না অযাচিত হয়ে। আমাদের গুরুত্ব তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের অবহেলা আমরা একেবারে সহ্য করব না। দরকার না হলে নববধূর সঙ্গে কথাই বলব না। অর্থাৎ এক কথায় আমরা খেলো হব না তার কাছে। কিন্তু তখন এই অনভিজ্ঞ কিশোর দুটি জানত না কল্পনায় আর বাস্তবে কত তফাৎ। যথা সময়ে ছোট বৌদি এল এবং অচিরেই ছোটদের আপনজন হয়ে গেল। আমরাও পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে কখন যে তার কাছে খেলো হয়ে গেছি, এবং কখনো চঞ্চল কখনো দুরন্ত আবার কখনো বা বাক্যপটু—এই সব বিশেষণে ভূষিত হচ্ছি তা আজ আর মনে পড়ে না। এ সবই হয়ত নিজেদের বেশী সপ্রতিভ ও চটপটে প্রমাণ করার ফল।

ছোট বৌদির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটিও বেশ সরস। নববধূ এসে দুধপাথরে দাঁড়িয়েছে, মেয়েরা করছে তাকে বরণ। ছোটরা তার কানে মধু আর মুখে মিষ্টি দিয়ে দিচ্ছে, যাতে তাদের কথা মিষ্টি করে কানে নেয় আর মুখে শুধু মিষ্টি কথাই বলে। চারপাশে ছেলেমেয়েদের আর বাড়ীর গুরুজনদের ভীড়। আমি বৌদির কানে ঢুকিয়ে দিলাম বেশ অনেকখানি মধু। কে যেন আমার চঞ্চল স্বভাবের পরিচয় দিয়ে দিল তখনই এবং নববধূর মুখেও একটু হাসি দেখলাম যেন। কানে হাঁতি দিয়ে কান পরিষ্কার করতে চেষ্টা করতেই মেজবৌদি হাসি মুখে বলে উঠলো, "কি দুষ্ট ছেলে দেখ, কানে একগাদা মধু দিয়েছে।" সুকান্ত এগিয়ে এসে কানে সামান্য মধু দিয়ে নববধূর মুখে একটু মিষ্টি ঠেকিয়ে ধরল। নববধূও খাবে না সেও ছাড়বে না। এই নিয়ে বেশ একটা সরস পরিবেশ সৃষ্টি হল। মেজবৌদি তখন সুকান্তর পরিচয় করিয়ে দিল কবি দেবর বলে। এমনি করে চলল পরিচয় আর অভ্যর্থনার পালা। রমা, ঘেলু এরাও এসে নিজ নিজ কাজ করে গেল। আমার আর সুকান্তর চেষ্টা চলছিল এই একপাল ছেলেমেয়েদের ছাপিয়ে নববধূর মনে যেন ছাপ রেখে যেতে পারি। তাই নানা রকম রঙ্গ রসিকতায় উপস্থিত সকলকে হাসাবার চেষ্টা করছিলাম এবং নববধূর মুখেও হাসির ঝিলিক ফুটে উঠছে কিনা দেখছিলাম।

বৌ ভাতের দিন সুকান্তকে বললাম, নতুন বৌদিকে ত কিছু উপহার

দেওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের পয়সা না থাকায় এ সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায়। ও আমাকে ভরসা দিল আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি, এ ব্যাপারে যা করবার সেই করবে। ভরসা যে খুব পেলাম, সে কথা বলা যায় না। যাই হোক, সারাদিন উৎসবের বাড়ীতে ব্যস্ত রইলাম নানা কাজে। সন্ধ্যেবেলা নিমন্ত্রিতরা আসতে লাগলেন দলে দলে। ক্রমে ক্রমে উৎসব বাড়ী জমজমাট। আমি তখন পরিবেশনে যোগ দিয়েছি। এর আগে এ কাজ কখনও করি নি, তাই নতুন অভিজ্ঞতা মন্দ লাগছে না। মাঝে একবার সুকান্তকে মনে করিয়ে দিলাম উপহার দেবার কথা। সেও আমাকে আশ্বাস দিল, যথা সময়ে ব্যবস্থা হবে।

তারপরে যখন নতুন বৌয়ের ঘর লোকজনে পূর্ণ হয়ে গেছে তখন সুকান্ত আমায় ডাকল এবং আমার হাতে সোনালী রাঙতায় মোড়া একটা মোড়ক দিল। ওর হাতে তখন দেখলাম ছোট একটা খেলাঘরের ফুল গাছের টব। তার মধ্যে কোন গাছের ফুল সমেত একটা ডাল মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে। দেখাচ্ছে সুন্দর যেন ছোটখাট একটা গাছ—ফুল পাতা সমেত বেড়ে উঠেছে। এই উপহার দুটো নিয়ে আমরা নতুন বৌদির কাছে গেলাম এবং একে একে তার হাতে তুলে দিলাম। সুকান্তর উপহারটা সকলে খুব তারিফ করল। কবি না হলে এমন উপহার আর কে দেবে। এটি একটি অভিনব উপহার সন্দেহ নেই। কবির বন্ধু কি দিয়েছে উপহার? পরম কৌতূহল ভরে কে যেন আমার দেওয়া মোড়কটি খুলে ধরল। এবং যেই ভেতরের বস্তুটি বেরিয়ে পড়ল অমনি হেসে উঠল ঘর ভর্তি লোক। হাসি দেখলাম নববধূরও মুখে। আমিও হাসলাম অপ্রস্তুতের হাসি। কে যেন মন্তব্য করল ভোজন বিলাসীর উপহারের সময়ও ভোজ্য বস্তুর কথাই মনে হয়েছে। আমার উপহারটি ছিল আমারও অজানা—সোনালী রাংতায় মোড়া বড়সড় একখানা ফিস ফ্রাই।

১৪

ছোড়দার বিয়ের পরে আমাদের পিসিমার বাড়ীতেও একটা রেডিও কেনা হল ১৯৪০ সালে। এই সূত্রে আমরা রেডিওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

পড়লাম। যাইহোক এখানে যা বিশেষ করে বলতে চাই তা হল রেডিওর একটা বিশেষ অনুষ্ঠান 'ছোটদের আসর' সম্বন্ধে। খোকন, আমি, ঘেলু, রমা ইত্যাদি আমরা সবাই ছোটদের আসরের শ্রোতা ছিলাম। ঘেলু আমাব জেঠতুত ভাই, আমাদের সমবয়সী আর রমা তার ছোট বোন। আমার জেঠিমার অকাল মৃত্যুর জন্যে রমা একেবারে শিশুকাল থেকে পিসিমার বাড়ী থাকত একথা আগেই বলেছি। রমাও ছিল আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং আমাদের সকলের পরম প্রিয়।

তখন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ছোটদের আসরের পরিচালক—আসরের দাদুমণি। ছোটদের আসরের প্রতিটি অনুষ্ঠান আমরা শুনতাম পরম তৃপ্তি ভরে এবং বর্তমানের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মত আমরাও চিঠির জবাব পাওয়ার আশায় ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। বেতাব জগতে ছোটদের আসর নামেও একটা বিভাগ ছিল এবং এখানে আমরা ছোট ছোট গল্প কবিতা ইত্যাদি পাঠাতাম। সুকান্ত অবশ্য এখানে কোন লেখা পাঠাতে চাইত না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি অতি সুন্দর ভাবে সুকান্ত আবৃত্তি করত। আমাদের অনেক অনুরোধে একদিন সে ছোটদের আসরে আবৃত্তি করবার আবেদন পত্র পাঠাল।

কণ্ঠস্বর পরীক্ষার পত্র এলে আমি একদিন ওকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে গেলাম। তখন বেতার কেন্দ্রের অফিস ছিল ১, গার্সটিন প্লেসে। জায়গাটা আমার চেনা ছিল কারণ আমার বাবার লেখা নাটক বা অন্যান্য রচনা যা রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে তার পারিশ্রমিক আনতে আমাকে ওখানে আরও কয়েকবার যেতে হয়েছে। ওর কণ্ঠ পরীক্ষা করে দাদুমণি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় খুশি হলেন।

এর পরে চিঠি এলো ওর, সাত মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে ছোটদের আসরে আবৃত্তি করবার জন্যে। তারিখ ছিল যতদূর মনে পড়ে ওর উপনয়নের ১৩/১৪ দিন পরে। মুণ্ডিত মস্তক নিয়ে সুকান্ত একলাই গেল আবৃত্তি করতে। আমরা বাড়ীতে বসে রইলাম রেডিওর কাছে ওর আবৃত্তি শোনবার জন্যে। আমি, রমা, ঘেলু এবং বাড়ীর বড়রাও জমা হল রেডিওর কাছে। সুকান্ত

আবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতাটি, আমরাও শুনলাম। খুবই ভাল লাগল। এরপরে অধীর আগ্রহে ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম আমরা ক'জনে। ও ফিরে এসে ওর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। ও নাকি প্রথমে একটু নিচু গলায় পড়ছিল, দাদুমণি ওকে ইশারায় গলা ছেড়ে পড়তে বলেছেন।

এখন ঘরে ঘরে রেডিও আছে এবং তা সমানে বেজে চলে বিশেষ কেউ মন দেয় না। আর তা ছাড়া এখনকার স্টুডিওর অনুষ্ঠানগুলো সবই প্রায় রেকর্ড দিয়ে সেরে দেয় তাই হয়ত অনুষ্ঠান সবাইকে আকর্ষণ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় বেতারের অনুষ্ঠানগুলো ছিল খুবই জনপ্রিয় আর বৈচিত্র্যময়। তখন আমরা এবং বড়রাও রেডিওর নানারকম অনুষ্ঠান মন দিয়ে শুনতাম। নাটক এবং কৌতুক নক্সাগুলো খুব আকর্ষণীয় ছিল। তখন শুক্রবারে পূর্ণাংগ নাটক হত প্রায় তিন ঘন্টা ধরে। সময় পেলেই সুকান্ত রেডিওয় কান দিয়ে পড়ে থাকত। রেডিওর সঙ্গে বেতার জগৎ পত্রিকা রাখারও ব্যবস্থা হল। বেতার জগৎ আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে যার পছন্দমত অনুষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করে রাখতাম। এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ এক পদ্ধতি ছিল। শোনার মত সাধারণ অনুষ্ঠানগুলোর তলায় দাগ টেনে দেওয়া হত। কিন্তু যখন মনোমত শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান থাকত আমরা তখন সেই শিল্পীর নামের পাশে তারকা চিহ্ন এঁকে দিতাম। এই তারকা চিহ্ন দেওয়া নিয়ে আমাদের মহলে অর্থাৎ রমা, ঘেলু, সুকান্ত আর আমার মধ্যে চলত রেষারেষি। এর কারণ হল বিভিন্ন শিল্পীর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত অনুরাগ। আমার প্রিয় শিল্পী শচীনদেব বর্মণ, রমার সুনীল রায়, ঘেলুর জগন্ময় মিত্র আর সুকান্তর সমরেশ চৌধুরী। আমাদের এই মনোমালিন্য আর রেষারেষির কারণ হল শিল্পীপ্রতি তারকা চিহ্নের সংখ্যা। আমি যখন মনে করতাম আমার প্রিয় শিল্পী তিনটি তারকা চিহ্ন পাওয়ার অধিকারী তখন অন্যান্যেরা দাবী করত ওদের প্রিয় শিল্পীরা আরও বেশী তারকা চিহ্ন পাওয়ার যোগ্য। সে ভারী সমস্যার কথা। কেউ মানতে রাজী নয় যে তার প্রিয় কণ্ঠশিল্পী কারও চেয়ে কোন অংশে কম। সুকান্ত অবশ্য এ সমস্যার সমাধান নিজেই করে নিয়েছিল। ওর প্রিয় শিল্পীর নামের পাশে একটি বড় তারকা চিহ্ন এঁকে দিতে শুরু

করল। সমরেশ চৌধুরীর গান ও খুব পছন্দ করত এবং তখন যেখানেই থাকুক না কেন তাঁর গান প্রচারিত হবার সময় ও ঠিক রেডিওর সামনে হাজির হত। এই শিল্পীর কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড যেমন : 'ফুল বলে ধন্য আমি', 'এল যে শীতের বেলা,' 'কিছু বলব বলে এসেছিলেম' ইত্যাদি গানগুলো সুকান্তর খুব ভাল লাগত। এই গানগুলো সে ঠিক সমরেশ চৌধুরীর গলার অনুকরণে গাইত। সুকান্তর অবশ্য সুরেলা কণ্ঠস্বর ছিল না তবু যখন তখন আপন মনে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানই সে গাইত। এই শিল্পীর গান অবশ্য আমারও ভাল লাগে। বিশেষ করে সুকান্ত চলে যাবার পরে যেন সুকান্তর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধায় এই রেকর্ডগুলো যখন বাজান হয় তখন আমি হারিয়ে যাই সেই দিনগুলোর মধ্যে। এছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানও সুকান্তর ভাল লাগত। তখন তিনি উদীয়মান শিল্পী।

যে রেডিওর প্রতি সুকান্তর এত আগ্রহ ছিল, আশ্চর্য, পরে তা আর ছিল না বললেই চলে। বাইরের কাজের আহ্বানে তাকে অনেক সময় দিতে হত, তাই হয়ত এই রেডিওর প্রতি তার আগ্রহ কমে গেছলো। পরবর্তী কালে সে বাড়ীর দেয়ালে লিখেছিল—

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই 'রেডি' ও॥

১৫

একদিন সন্ধ্যেবেলা ছোড়দা আর ছোট বৌদি যথানিয়মে বেড়াতে গেল, সাধারণত বিয়ের পর নব দম্পতি যেমন বেড়াতে যায়। ঘরের মধ্যে পড়ে রইল ছোটবৌদির ছাড়া একখানা শাড়ী। আমাদের মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি এলো। আমরা একটা পাশ বালিশকে ঐ শাড়ীখানা মহিলার মত পরিয়ে ঘরের মধ্যে রাখা একটা সোফায় বসিয়ে দিলাম। সুকান্ত কোথা থেকে একটা ছোট ঘটি নিয়ে এসে পাশ-বালিশটার মাথায় বসিয়ে দিয়ে শাড়ীটাকে টেনে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দিল। খুব একচোট হেসে নিয়ে আমি ও সুকান্ত নিচে এসে অন্যান্য বৌদিদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। আর

অপেক্ষা করতে লাগলাম ছোড়দা ও ছোটবৌদির ফিরে আসার পথ চেয়ে। শুনেছিলাম, এই ঘরে আমাদের পূর্ববর্তী কোন ভাড়াটের গৃহবধূ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। তাই ওরা ফিরলেই আমাদের মজাটা জমবে। কারণ আমরা আলো নিবিয়ে এসেছিলাম।

রাত প্রায় নটায় ওরা ফিরল। ছোড়দা নিচে যখন অন্যান্য বৌদিদের সঙ্গে কথা বলছে তখন ছোটবৌদি ওপরে উঠে গেল। আমরা তখনও নিচে। ছোটবৌদি পরমুহূর্তেই দ্রুত নেমে এলো চিৎকার করতে করতে। ঘরে অবশ্য আলো জ্বালে নি সে, কিন্তু আবছা অন্ধকারে কাকে যেন ঘোমটা মাথায় সোফার ওপর বসে থাকতে দেখেছে। কথাটা কেউ বিশ্বাস না করলেও তেতলায় গিয়ে দেখবার সাহস কারো হল না। ছোটবৌদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর শুরু হল গবেষণা। শাড়ী পরা যখন তখন আগন্তুক নিশ্চয়ই মহিলা। চোর নয়, কারণ চোর হলে ঘরে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না। যথা সময়ে অপকর্মটি করে সরে পড়াই চোরদের মধ্যে প্রচলিত রীতি। ভূত প্রেতের কথায় আমল দেওয়াও কারো মনঃপূত নয়। অথচ কেউই ওপরে যেতে রাজী নয়। এধারে ছোটবৌদির অবস্থাও কাহিল। যতই সেই দৃশ্যের কথা সে চিন্তা করছে ততই তার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে তার যখন প্রায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা তখন আমি সুকান্তকে চুপিচুপি বললুম যে এখন আসল কথা প্রকাশে বিলম্ব হলে আমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে। যদিও অবস্থাটা আমরা উপভোগ করছিলাম খুব আগ্রহে তবুও একটা বিপদের আশঙ্কায় সত্য প্রকাশে এগিয়ে গেলাম। আমি বলে দিলাম আগন্তুকের আসল পরিচয়। ছোড়দা তখন বীরদর্পে ওপরে গিয়ে সেই পাশবালিশ-রূপিনী আগন্তুককে প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে ধরাশায়ী করল। ঘটি মুণ্ড ছিটকে পড়ল কোন এক দিকে প্রবল আওয়াজে। পেছন পেছন উঠে এসেছে বাড়ীর প্রায় সবাই। তারাও ছোড়দার বীরত্বে অনাবিল কৌতুক অনুভব করেছে।

আমাদের দুষ্টুমির অভিনবত্বে তিরস্কার নয় পেলাম প্রশংসা। আর এই ঘটনা গল্পের আকারে ছড়িয়ে পড়ল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মহলে।

এ ধরনের মজাদার ঘটনা সৃষ্টিতে সুকান্ত ছিল সিদ্ধহস্ত। এ রকম দু

একটা কাহিনী এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে আমাদের বড়মামা নির্মল ভট্টাচার্যের বিবাহ হয়েছিল। তখনও আমাদের দাদামশায় ও দিদিমা বেঁচে। বিয়ে হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে। এখান থেকে দল বেঁধে আমরা ভাগনেরা ছোটমামা খোকনসহ গেলাম বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায়। মেজমেসোমশায়ের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। আমরা পৌঁছবার পরই একদল মেয়ে এসে হাজির বর দেখার স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে। আমরা তখন আঠার থেকে বাইশ তেইশ বছরের অনেকগুলি যুবক এক জায়গায় বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বড়মামাও সঙ্গে রয়েছে। ওরা আসতেই আমি বললাম, আমাদের মধ্যে কে বর সে কথা আমরা বলব না, আপনারাই খুঁজে নিন। ওদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে আমরা নানা রকম কথা বলতে শুরু করলাম। ওরা যখন এই সকলের মাঝখানে সন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে যাচ্ছে বর খোঁজার প্রয়াসে আমি তখন বললাম, আমি বর হলে চলতে পারে কি না। ওরা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করল। সোজাসুজি বলল, "আপনি বড্ড বেশী কথা বলছেন, আপনি কিছুতেই বর নন।" এই বলে আবার ওরা উপস্থিত যুবকদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সম্ভাব্য পাত্রকে খুঁজতে লাগলো। রহস্যটা বেশ জমে উঠেছে। সুকান্ত তখন এর মধ্যে মাঝে মাঝে বোকা বোকা মুখ করে গালে হাত দিয়ে ওদের দিকে সলজ্জভাবে তাকাচ্ছে আবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অতি সন্তর্পণে, তা আমাদের নজর এড়িয়ে গেলেও ওদের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুকান্তকে দেখিয়ে বলে উঠল, "ঐ ত বর।" সুকান্তও তখন তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, "হল না হল না।" আমরাও তখন হো হো করে হেসে উঠলাম। ওরা তখন অপ্রস্তুত। তারপর পাত্র খোঁজা ছেড়ে দিয়ে মিনতি শুরু করেছে, "বলুন না কে বর?" আমাদেরও এক কথা, খুঁজে নিতে হবে, কে বর বলা হবে না। শেষে সুকান্ত সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আর কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করলেই কাল সন্ধ্যে বেলা জানা যাবে কে পাত্র। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে বর এরই মধ্যে আছে এবং আসল বর কাল বিয়ের আসরে নিশ্চিত হাজির হবে।" মেয়েরা তখন তাদের চিরকালের সার কথা

বলে উঠলো, "চল, এরা ভারী অসভ্য, এরা বলবে না।" এর পরে যাঁর কাছে আমরা উঠেছিলাম তিনি বর চিনিয়ে দিলেন গোপনে। মেয়েরা তখন চলে গেল হৈ চৈ করতে করতে। যাবার সময় সুকান্তকে দেখিয়ে দিয়ে বলে গেল, "ও ভারী অসভ্য।" মনে আছে পরদিন বিয়ের আসরও সুকান্তই জমিয়ে রাখল নানা মজাদার রসিকতায়।

এই বিয়েতে আমরা খুব আনন্দ করেছিলাম। বিয়ের আসরে এবং পরদিন বাসি বিয়ের ক্লান্তিময় পরিবেশেও সুকান্ত সরস রসিকতায় সকলকে মাতিয়ে তুলেছিল। ওর প্রাণপ্রাচুর্যের স্পর্শে আমরা যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম, আনন্দস্রোতে দিয়েছিলাম গা ভাসিয়ে। আমরা যখন বিয়ে বাড়ীর ভোজে যোগ দিয়েছি এবং নানা রকম মজাদার কথাবার্তায় নিজেরা হেসে উঠছি ক্ষণে ক্ষণে এমনি সময় একজন চালাকচতুর যুবক এসে আমাদের খাওয়াদাওয়ার তদারকি শুরু করে দিল। সুকান্তকে বললো, "নিজের বাড়ী বলে এটাকে মনে করবেন। তাই খাওয়াদাওয়ার কোন লজ্জা করবেন না।" আমাদের অপর সকলকেই ঐ একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হল সপ্রতিভভাবে। সুকান্ত একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে তার কথা সে হৃদয়ঙ্গম করেছে। বাসি বিয়ের দিন যখন আমরা একজায়গায় বসে হৈ-হুল্লোড় করছি এমন সময় সেই যুবকটিকে কাছাকাছি আবার দেখা গেল। সুকান্ত তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলো, আমাদের উদ্দেশ্য করে—"এটা আমাদের বাড়ী তাই এখানে কোন সংকোচের দরকার নেই। ভূপেন নেবে ঐ তবলা-জোড়া, খোকন নেবে হারমনিয়ামটা আর আমি আর একটা কিছু নিয়ে যাব যাবার সময়।" সুকান্ত বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে সপ্রতিভভাব ফুটিয়ে তুলে হাতদুটো নেড়ে নেড়ে আমাদের বলতে লাগলো আমরা যেন লজ্জা-সঙ্কোচ না করি বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনে স্থান না দিই। এটা আমাদের নিজেদের বাড়ী—আমরা খুশিমত জিনিস স্থানান্তর করতে পারি। এই কথাগুলি যুবকটির কানে যাওয়ায় সে কেমন যেন মিইয়ে গেল। তার সেই সপ্রতিভ অতিচালাক ভাবও যেন বিদায় নিল, এক সময় সে যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

এই বিয়েতে আমাদের অনুরোধে সুকান্ত নীচের গানটি লিখেছিল, এবং খোকন তাতে সুর দিয়েছিল।

যেমন করে তপন টানে জল
তেমনি করে তোমায় অবিরল
টানছি দিনে দিনে
তুমি লও গো আমায় চিনে
শুধু ঘোচাও তোমার ছল ॥

জানি আমি তোমায় বলা বৃথা
তুমি আমার আমি তোমার মিতা
রুদ্ধ দুয়ার খুলে
তুমি আসবে নাকো ভুলে
থামবে নাকো আমার চলাচল ॥

বিয়ের পরে নতুন মামীসহ আমরা কলকাতা ফেরবার জন্য তৈরী হলাম। যথারীতি গাড়ীতে অর্থাৎ কলকাতাগামী ট্রেনে বেশ ভীড়। যে কোন উপায়েই হোক এই ভীড়কে হালকা করতে হবে। আমরা তাড়াতাড়ি নিজেরা পরামর্শ করে নিলাম। প্রথমে আমি, মামা এবং নতুন মামীসহ ট্রেনে উঠলাম এবং বড়মামাকে বললাম, "এত্গুলি কলেরা রোগী নিয়ে ফেরা, কিন্তু ট্রেনে ত' বড় ভীড়। ওদের একটু শোয়াতে পারলে ভাল হত।" মামা জবাব দেবাব আগেই সুকান্ত, খোকন ইত্যাদি কয়েকজনকে নিয়ে বিশ্বনাথদা নামে আমাদের এক আত্মীয় ট্রেনের কামবায় ঢুকল। ওরা তখন কলেরা রুগীর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করল। ওদেব ধরাধরি ক'বে আমরা শুইয়ে দিলাম এবং লোকেরা ত্রস্ত হয়ে উঠে জায়গা ক'রে দিতে লাগলো। দু'একজন যাত্রী জানতে চাইল যে কী করে এতগুলো লোক এক সঙ্গে অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। মুখে আশঙ্কার ভাব ফুটিয়ে তুলে আমি জানালাম যে আমরা বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরছি এবং সেখানেই এই বিপর্যয় হয়েছে। সুকান্ত ও খোকন তখন রোগীর ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। পেটব্যথার গোঙানিতে আর বমির ধমকে তখন কামরার আবহাওয়াটা বেশ ভারি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কামরা প্রায় খালি। বলা বাহুল্য, এর পরে আমরা দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড করতে করতে কোলকাতায়

ফিরলাম। আমাদের নতুন মামী সমস্ত জিনিসটা উপভোগ করল খুব কৌতূহল ভরে।

আমাদের বন্ধু অরুণাচল বসুরও দু'একটা মজাদার অভিজ্ঞতা ঘটেছে। একবার তার জন্মদিনে সুকান্ত নিমন্ত্রিত হয়েছে। সারাদিন চলে গেল, কিন্তু সুকান্ত এল না; অথচ দুপুরে তার এসে খাওয়ার কথা অরুণের বাড়ী। সন্ধ্যেবেলা সুকান্তর ছোটভাই মুকুল এসে তাঁকে একটা মোড়ক আর একটা চিরকুট দিয়ে গেল। এগুলো সুকান্ত পাঠিয়েছে। চিরকুটে লেখা, "আমার শরীর বেজায় খারাপ। তাই কিছু মনে করিস না। এ যাত্রা আমার উপহারটুকু নিয়ে আমায় মাপ করিস।" কাগজের মোড়কটা খুলতেই তার থেকে বেরিয়ে এল একটা রবারের বাঁদর-বাচ্চা। তাকে ধরতেই সেটা ক্যাঁচ করে ডেকে তিড়িং ক'রে লাফ দিয়ে উঠলো। তার ল্যাজে বাঁধা এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—"দেব আমি পাখিরও কূজন।"

আর একবার সুকান্তকে জোর ক'রে অরুণ পুকুরে টেনে নামিয়েছে ভাল ভাল সাহস দেওয়া কথা বলে। অরুণ তাকে সাঁতার শেখাবেই আর সুকান্ত এদিকে প্রাণ ভয়ে ডুবে মরার আশঙ্কায় আতঙ্কিত। বহু চেষ্টার পর সুকান্ত একটু একটু করে জলে নেমেছে ভয়ে ভয়ে; অরুণ তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে সাঁতার শেখাচ্ছে। কিন্তু মুহূর্তেই সুকান্ত তলিয়ে গেল গভীর জলে, ডুবে গেল জলের তলায়—কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই! অরুণের অবস্থা তখন খুবই করুণ, বিপদ আশঙ্কায় সে উৎকণ্ঠিত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ব্যস্ত হয়ে সে যখন জলের মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে তখন সুকান্ত 'ভুস্' করে ভেসে উঠল পুকুরের ওপারে। তারপরে ধীরে সুস্থে সাঁতার কেটে এপারে এসে বললো, "শিখে গেছিরে, একদিনেই শিখে গেছি; তুই খুব ভাল সাঁতার শেখাস।"

এই সব ঘটনার আরও আগে আমাদের কালীঘাটের মামাবাড়ীতে সুকান্ত সৃষ্টি করেছিল এক সুন্দর কৌতুককর পরিবেশ। আমার আর খোকনের ঘুড়ির প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। সুকান্ত নিজে অবশ্য ঘুড়ি ওড়াত না, তবে ও আমাদের সঙ্গী হত এই ব্যাপারে অনেক সময়। আমার অন্যান্য ভায়েরাও ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে বরাবরই

আমাদের বাড়ীতে ঘুড়ি ওড়ানোর বিরাট আয়োজন হয়ে থাকে। ঘুড়ি ওড়াবার সময়ে সুকান্ত অনেক সময় এসে যোগ দিত আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের ঘুড়ি কেটে যাওয়া নিয়ে খুব হাসি তামাসা করতে ভালবাসত। অবশ্য আমরা অপরের ঘুড়ি কেটে দিলে সে তা উপভোগ করত পরম কৌতুকভরে।

খোকন তখন বেশ ছোট। খোকন ও সুকান্তর বয়স বার তের বছর হবে। একদিন খোকনের একটা ঘুড়ি সামনের বাড়ীর ছাদে পড়ে যেতেই একটি শাড়ী পরা মেয়ে সেখানা নিয়ে নেয়। খোকনের মনে হয় যেন তার বুকের একখানা পাঁজর কে টেনে ছিঁড়ে নিল। বাস্তবিক, সেই অল্প বয়সে ঘুড়িগুলো ছিল আমাদের বড়ই প্রিয়। তাই এক এক-খানা ঘুড়ি হাতছাড়া হলে আমাদের যেমন কষ্ট হত, তেমনই আবার হঠাৎ একখানা উড়ে আসা ঘুড়ি ধরতে পারলে ভারি ভাল লাগত। যাইহোক, এই ঘুড়িখানা হারিয়ে খোকন খুব মনমরা হয়ে সেদিন কাটাল। পরদিন বিকেলবেলায় সুকান্ত কালীঘাটে গিয়ে হাজির। খোকনের কাছে সবকথা শুনে সুকান্ত ভরসা দিল যে ঘুড়ি তার উদ্ধার হবেই। খোকন অবশ্য ভেবে পায় না কেমন করে তা সম্ভব।

যে মেয়েটি খোকনের ঘুড়ি ছিঁড়ে নিয়েছিল সে রাস্তার অপর পারে তার মায়ের সঙ্গে থাকত। ও বাড়ীতে এছাড়া আর কেউ ছিল না। সুকান্ত একটা টেবিলের মাথায় খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লিখল—"সাবধান! সাবধান! —এপাড়ায় মহিলা ঘুড়ি-চোর আছে, সাবধান!" টেবিলটাকে ঘুরিয়ে এমনভাবে রেখে দিল যাতে লেখাটি সহজেই ওদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিছুক্ষণ বাদেই বাঞ্ছিত ফললাভ হল —দেখা গেল মেয়েটি তার মাকে আঙ্গুল দিয়ে ঐ লেখাটি দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলছে। তার মায়ের চোখে-মুখেও যেন বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল বলে মনে হচ্ছিল। এর কিছুক্ষণ পরে সুকান্ত পূর্বের লেখাটি মুছে ফেলে আবার লিখল—"২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। আমাদের ঘুড়ি ফেরৎ চাই।" এমনি করে সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। মা আর মেয়ের চঞ্চলতা বাড়ল মাত্র, কিন্তু লাভ কিছু হল না। খোকন নিরাশ হয়ে নীচে নামল, সুকান্ত নিশ্চিন্ত, ঘুড়ি ফেরৎ আসবেই। পরদিন সকালবেলায়

মেয়েটির মা হাতছানি দিয়ে খোকনকে ওদের বাড়ী ডাকলে ও গিয়ে হাজির হল এবং ঘুড়িখানা ফেরৎ পেল; আরও পাঁচ কথার সঙ্গে পেল মন্তব্য—"ছি! এক পাড়ায় থেকে কি ঝগড়া করতে আছে? সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়" ইত্যাদি। খোকন এসে সবিস্তারে বর্ণনা করল এই ঘটনা। সুকান্ত সব শুনে আবার ছাদে উঠে গেল। চোখেমুখে তখন কৌতুকের ছাপ। আগের লেখাটা মুছে ও আবার লিখল—"ঝগড়া ত করি নাই, ঘুড়ি ফেরৎ চাহিয়াছিলাম মাত্র!"

১৬

অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই সুকান্তর অন্তরে প্রবাহিত ছিল কৌতুক-রসধারা। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা কথাটি, অর্থাৎ এই উপমাটি, সুকান্তর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম এবং সে-ই এর মানেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। যা বলছিলাম, নানা রকম ব্যাপার নিয়ে সে যেমন সুন্দর কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত—তেমনই পারত কথার পিঠে কথা দিয়ে রস সৃষ্টি করতে।

এর আগে আমি এরকম সুকান্তর রসসৃষ্টির ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি। যেমন, সুকান্তকে বলা হল, "মার খাবি!" —তার জবাবে ও হয়ত বলল, "ভালই ত হল, এতকাল বাবার খেয়েছি, এখন না হয় মারই খাব।" কিংবা ওকে যখন থালায় ভাত বেড়ে দিয়ে বলা হল 'ভাত ভাঙ' ও তখন একটি ভাত ভেঙে ফেলল ইত্যাদি। এখানে সেরকম দু-একটি মজার কথা বলছি।

কয়েক বৎসর আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়েছিল। সুকান্ত সে-সময়ে আমাদের বাড়ী পুজোর ক'দিন কাটিয়ে যেত। এমনই একদিন দ্বিপ্রহরে ও যেন কোথা থেকে ঘুরেফিরে এসে খেতে চাইল। বৌদিদের মধ্য কে যেন ওকে বলল, "ভোগ হলেই খাওয়া হবে।" ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "ভোগ মানেই ত দুর্ভোগ।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা সুকান্ত আমার পিসীমার বাড়ী রামধন মিত্র লেনে

গেছে, ওখানেই রাত্তিরে থাকবে ঠিক হয়েছে। সবার খাবার বেড়ে দিয়ে মেজবৌদি হাঁক পাড়ল, "সুকান্ত, খেতে এস।" সুকান্ত খাবার থালার চারপাশে ঘুরে বলল, "কই! ক্ষেত ত এখানে দেখছি না!"

একদিন আমাদের বাড়ীতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গল্প করায় ওর মাথায় সামান্য চূন বালির ধুলো পড়েছিল। আমি ধীরে ধীরে ওর মাথা থেকে ময়লাগুলো ফেলে দিচ্ছিলাম। ও ব্যস্ত হয়ে মন্তব্য করল, "আরে, আরে! মাথায় হাত বুলোচ্ছিস বলে মনে হচ্ছে! মতলবখানা কী খুলে বল দেখি।"

আমি এই সময় সেতার সাধনা করতাম। সেতার নিয়ে বসে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা। আস্তে আস্তে সুরলোকের সাধনায় অগ্রসর হচ্ছিলাম। সুকান্ত মাঝে মাঝে আসত এবং আমাকে সেতার বাজিয়ে শোনাবার জন্য অনুরোধ করত এবং যথেষ্ট উৎসাহ দিত আমাকে এই ব্যাপারে। একদিন হঠাৎ বললো, "তোকে একটা উপাধি দিতে হবে। সুরসাগর, সুরসমুদ্র বা সুরমহাসাগর এ-সব উপাধিগুলো তোর পক্ষে বেশী গুরুতর হয়ে যাবে। তেমনই সুর-পুকুর বা সুরদীঘি এই উপাধিগুলো তোকে দেওয়া যাবে না, এখনও অতখানি সুর আয়ত্ব করতে পারিস নি। তাই তোকে উপাধি দিলাম 'সুরচৌবাচ্চা'।" আমি জবাব দিলাম যে, তার এই উপাধিদানে আমি পরম প্রীত হয়েছি। আমিও তাকে একটি উপাধি দিতে চাই, যেহেতু সে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে খানিকটা ক'রে বাজনা শুনে যায়, গ্রহণ ক'রে আমার কাছে থেকে সুররস, তাই আমি তাকে উপাধি দিলাম 'সুরমগ'। খুব একচোট হাসাহাসিতে শেষ হল আমাদের এই উপাধি দেওয়া-নেওয়ার পালা।

ঘেলুর মামাবাড়ী ছিল কাশীতে, তাই সে বহুবার কাশীতে গেছে এবং হিন্দী আমাদের থেকে ভাল জানে এ দাবী সে বারবারই করেছে। একদিন পিসীমার বাড়ীতে মেজবৌদি যখন একজন কয়লাওয়ালার সঙ্গে হিন্দী ভাষায় কথা বলতে গলদঘর্ম হচ্ছে, তখন ঘেলু এসে হিন্দী কথা বলতে শুরু করে দেয়। সুকান্ত আর আমি ঘরের মধ্যে ছিলাম। সুকান্ত ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে কয়লাওয়ালার সামনে হাত নেড়ে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে শুরু

করল, শুধু কথার শেষে একটা ক'রে 'হায়' জুড়ে দিতে লাগলো। আবহাওয়াটা কল্পনা করা যেতে পারে—কয়লাওয়ালা হতভম্ব, ঘেলু ক্ষুব্ধ, মেজবৌদি হতবাক্। রমা, আমি, ছোটবৌদি ইত্যাদির হাসাহাসি।

রমার বন্ধু বেলু কিছুকাল পিসীমার বাড়ীতে ছিল পড়াশুনো করবার জন্য, তার দাদা, মেজদার বন্ধু সেই সুবাদে। তখনকার দু'একজন সঙ্গীতশিল্পী যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, বিমলভূষণ এদের সঙ্গে বেলুর পরিচয় ছিল। সে নিজে খুব ভাল নাচতে পারত, সেই সুবাদে হয়ত পরিচয় হয়ে থাকবে। কিন্তু সে কথায় কথায় তার হেমন্তদা, জগন্ময়দা, বিমলদা উল্লেখ করত—যেটা আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত বিরক্তির কারণ, যদিও ওর কাছে এটা ছিল পরম গর্বের। এরপরে শুরু হল আমাদের কথায় কথায় তাকে বিদ্রূপ করা, যেমন "বেলু, তোমার অহীনদা, প্রমথেশদা, শিশিরদা এবং কাননদির খবর কি?" বলা বাহুল্য এঁরা হচ্ছেন তখনকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী, যথা অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রমথেশ বড়ুয়া, শিশির ভাদুড়ী ও কানন দেবী। সুকান্ত আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে শুরু করল, "বেলু, তোমার সঙ্গে তোমার স্ট্যালিনদা, হিটলারদা, চার্চিলদা আর রুজভেল্টদার নিয়মিত দেখা সাক্ষাত হয় ত?"

আমি তখন আমার স্কুলের অর্থাৎ আমার ক্লাসের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন। সেই জন্য ফুটবলটা আমার কাছেই থাকত। সুকান্ত একদিন ফুটবলটা নাড়াচাড়া করছে আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীর দোতলার ছাদে। ফুটবল খেলায় ওর কোন আগ্রহ ছিল না তাই সে সুযোগ নিয়ে ফুটবল খেলা যে কত দুরূহ সেই সব কথা বোঝাচ্ছিলাম ওকে। ও বললো, "দেখি তোর বলটা।" দিলাম ওকে। ও বলটাকে প্রচণ্ড জোরে পা দিয়ে আঘাত করল এবং সে পদাঘাতটি এমনই তীব্র যে বলটা কামানের গোলার মত ছুটে গিয়ে জানলায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠের গরাদ দু-টুকরো হয়ে ভেঙে ছিটকে গেল দু'দিকে। ও বললো, "বল খেলি না, তাতেই এই! খেললে কী হত বুঝতে পারিস?" জবাব দিল ঘেলু, "পারি, তোর আঘাত করা বল ধরলে গোলকীপার সুদ্ধু গোলের ভিতরে ঢুকে যাবে।" তারপর সুকান্তর এই অভূতপূর্ব বলখেলা নিয়ে শুরু হল হাসাহাসি।

একবার দুর্গাপুজোর সময় আমি, রমা আর সুকান্ত বেরিয়েছিলাম প্রতিমা-দর্শনে। 'হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসবে'র পূজামণ্ডপে যখন সুকান্ত আর রমা প্রতিমাদর্শনে মনোনিবেশ করেছে তখন আমি অনুসন্ধান কার্যালয়ে সুকান্তর বর্ণনা দিয়ে জানালাম যে এরকম একটি বালক হারিয়ে গেছে। তারাও মাইকযোগে সুকান্তর বর্ণনা দিয়ে তার হারিয়ে যাওয়ার কথাটা তারস্বরে ঘোষণা করতে শুরু করল। সুকান্ত লম্বালম্বা পা ফেলে আমার কাছে চলে এল এবং যেন কিছুই জানে না, এইভাবে আবার পথ চলতে আরম্ভ করল। মনে মনে খুব হাসছি, সুকান্তর এই কিছু না শোনার ভান দেখে। 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র প্রতিমা বরাবরই খুব সুন্দর হয়। তাই মন দিয়ে যখন প্রতিমা দর্শন করছি, তখন মাইকযোগে ঘোষণা হল আমি নাকি হারিয়ে গেছি। নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা আমারই বটে। সঙ্গে রমা আছে ঘোষক একথাও ঘোষণা করছে। কিন্তু ঘোষক আমার চেহারার যে বর্ণনা দিচ্ছে তা আমার পছন্দসই নয়। আমি কি এতই কুৎসিৎ! দেখলাম পাশে সুকান্ত নেই, বুঝলাম সবই।

দু'জনে 'নিকাশীপাড়া সর্বজনীন' পূজামণ্ডপে গিয়ে স্থির করলাম যে, রমার নামটা মাইকে ঘোষণা করা হোক আর দেখা হোক, ওরা হারিয়ে গেলে সত্যিই কোন সাহায্য করতে পারে কিনা। অবশ্য এ সবই রমার সম্মতিক্রমে। যাই হোক, রমা আর সুকান্ত পূজামণ্ডপের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি গেলাম অনুসন্ধান কার্যালয়ে। চোখে-মুখে অসহায় ভাব ফুটিয়ে নিয়ে জানালাম যে আমার ভগ্নী হারিয়ে গেছে। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা শুরু করে দিল। কিন্তু আমায় ছাড়ল না। আমাকে বসিয়ে রাখা হল এই ভরসা দিয়ে যে সেচ্ছাসেবকরা এখুনি আমার ভগ্নীকে খুঁজে এখানে নিয়ে আসবে। ভারী মুস্কিলে পড়ে গেলাম। মিনিট পনের কুড়ি ওখানে আটক থাকার পরে ওদের বোঝালাম যে স্বেচ্ছাসেবকরা হয়ত আমার বোনকে খুঁজে পাচ্ছে না, এই অবস্থায় আমরাই তাকে খুঁজে দেখা উচিত। এই বলে বেরিয়ে পড়লাম এবং রমা ও সুকান্তর কাছে গিয়ে সবকথা বললাম। সুকান্ত বলল, আর বিলম্ব না ক'রে এখান থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা অর্থাৎ আমি সুকান্ত আর খোকন স্থির করলাম একটা কিছু মজা করতে হবে। আমি মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতেই বাড়ী ঢুকলাম। সুকান্ত আর খোকন আমাকে ধরে ধরে বাড়ী নিয়ে এসে শুইয়ে দিল এবং নানা রকম আজগুবি গল্প বলে আমার মাতাল হওয়ার কাহিনী সকলকে শোনাতে লাগল। আমাদের তিনজনের অভিনয় এতই নিখুঁত হচ্ছিল যে বাড়ীর বৌদিদের মুখেচোখে আশঙ্কার ভাব ফুটে উঠলো। নীচ থেকে মা ছুটে এলেন একথা বলতে বলতে যে, যদি সত্যিই এই ছাইপাশ আমি গিলে থাকি তবে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগে বাড়ী থেকে সেই মুহূর্তেই বিদায় করে দেওয়া হবে আমাকে। মা ঘরে ঢুকতেই আমরা তিনজন ছুটলাম তিনদিকে। সুকান্ত বলল, "দেখলে মাসীমা, আমরা কিরকম অভিনয় করতে পারি। তোমাকেও বিভ্রান্ত হতে হল।" মা জবাব দিলেন, "সত্যি সত্যিই খেলে আমি কি আস্ত রাখতাম তোদের।"

একবার বেতার-জগৎ পত্রিকার সমগ্র 'কভার পৃষ্ঠা' জুড়ে তৎকালীন এক কৌতুক গীতিশিল্পীর শুধু মুখাবয়ব ছাপান হয়েছিল। সমগ্র পৃষ্ঠা জুড়ে একটি মুখের চিত্র ভারি কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। চোখ, কান, নাক সব মিলে গিয়ে একটি গোলাকৃতি রূপ নিয়েছিল। সুকান্ত এই চিত্রটির বিভিন্ন অংশের যেমন চোখ, কান, নাক, ঠোঁট, মাথা, চুল, ভ্রূ ইত্যাদির ধারে ধারে লিখে তীরচিহ্ন দিয়ে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছিল। বেতার জগৎটা যারই হাতে পড়ছিল সেই একবার করে হেসে উঠছিল। এই কৌতুকসৃষ্টির মুখ্য ভূমিকা বেতারজগৎ কর্তৃপক্ষের না সুকান্তর তা বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

সুকান্তর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সে কথার মারপ্যাঁচে হেয়ালীর সৃষ্টি করতে পারত। ৺শরৎচন্দ্র পণ্ডিত অর্থাৎ একদা রেডিওর বিখ্যাত 'দাদাঠাকুরের' যেমন মজার মজার হেঁয়ালী এবং কৌতুকময় কথা বলার ক্ষমতা ছিল, বা তাঁর যেমন একই কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু-রকম অর্থের শব্দ বিন্যাসের ছিল দক্ষতা, তেমনই সুকান্তর মধ্যেও এই ক্ষমতার প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এতদিনের ব্যবধানে তার সেই কথার চকিত-চমক সৃষ্টির বিশেষ কিছুই আর মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে তার এই বিশেষ ক্ষমতাটির কথা।

একবার সুকান্তর চিঠি পেলাম যাতে সে জানিয়েছে যে খোকনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে আগামী দু-একদিনের মধ্যেই। একটু বিস্মিত হলাম, কারণ খোকন এ সম্বন্ধে আমায় কিছু জানায় নি এবং সমস্যায় পড়ে গেলাম, সে বাঙলার না ভারতের কোথাকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করবে। সুকান্ত আসতে যখন এ'কথা তুললাম তখন ও একটু হাসল মাত্র। পরে খোকনের কাছে জানলাম যে সে বেলেঘাটা এবং শ্যামবাজারে আসবে বলে সুকান্তকে চিঠিতে জানিয়েছিল।

খুব অল্প বয়স থেকেই সুকান্তর আর একটি অভ্যাস ছিল ধারাবাহিক গল্প বলার। এই ব্যাপারে খোকন আর সুকান্তর স্বভাবের বেশ মিল ছিল। ওরা এইভাবে মুখে মুখে ধারাবাহিক গল্প রচনা করত। হয়ত প্রথম একঘণ্টা সুকান্ত একটা গল্প শুরু করে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল, খোকন আবার সেই গল্পের ধারা টেনে নিয়ে বলল পরবর্তী এক ঘণ্টা। সমস্ত গল্পটাই দু'জনে রচনা করে চলত আপনাদের কল্পনার মাধ্যমে। এভাবে ওদের গল্প তৈরী করার খেলা চলত মাসের পর মাস এবং তা লিখে রাখলে এক একটি মহাভারত সৃষ্টি হতে পারত।

একদিন যেমন হাতে লেখা পত্রিকার প্রতি সুকান্তর আগ্রহ চলে গিয়েছিল, তেমনই এই ধারাবাহিক গল্প রচনার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে একদা বন্ধ হয়ে গেল। এর কারণ অবশ্য তার নানা কাজের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে নেওয়া—যার ফলে হয়েছিল সময়াভাব। পরে অবশ্য একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লেখায় সুকান্তর নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব।

১৯৪১/১৯৪২ সালে কলকাতায় 'প্ল্যাঞ্চেটে'র বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অনেকেই এই 'প্ল্যাঞ্চেট' যন্ত্র বাড়ীতে কিনে নিয়ে যেত। নতেদা একদিন একটা প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে এল। আমরা ক'দিন প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে খুব মেতে রইলাম। এ ব্যাপারে নতেদাই প্রধান উদ্যোক্তা, বৌদিদের উৎসাহও কম নয়, কিন্তু সব চেয়ে বেশী উৎসাহ আর উত্তেজনা ছিল আমাদের অর্থাৎ রমা, ঘেলু, আমি আর সুকান্তর। একদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। আমরা গোল হ'য়ে বসে 'প্ল্যাঞ্চেটে'

বিভিন্ন পরলোকগত ব্যক্তিকে আহ্বান করছি আর তার কাছে জানতে চাইছি নানা রকম প্রশ্নের উত্তর। একটি প্রশ্ন যা তখনকার মানুষের মনে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছিল, অর্থাৎ সেই সময়কার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ অথবা জার্মান জাতি, কে পরাজিত হবে! প্ল্যাঞ্চেটে কোন আত্মাকে আহ্বান করেছিলাম তা অবশ্য মনে নেই। আমরা স্থির করেছিলাম যে, যুদ্ধে যদি জার্মান জাতি জয়লাভ করে তবে প্ল্যাঞ্চেট সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আর তাদের পরাজিত হবার সম্ভাবনা থাকলে প্ল্যাঞ্চেট যাবে পিছিয়ে। তখন আমরা সবাই যুদ্ধে ব্রিটিশ জাতির পরাজয় চাইছিলাম তাই সম্ভবতঃ উত্তেজনার আতিশয্যে আমিই আঙুল দিয়ে প্ল্যাঞ্চেটকে একটু ঠেলে এগিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের মনোমত জবাব প্ল্যাঞ্চেটের কাছ থেকে পেয়ে আমরা সবাই খুশি কিন্তু সুকান্ত একবাক্যে রায় দিল, "জার্মান জাতির এই যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনায় ভূপেনের হাত আছে।"

১৭

এমনি করে গল্প-গুজব হৈ-হুল্লোড়ে সুকান্ত দিন কাটাতে পছন্দ করত। তাই তার গৃহের আকর্ষণ ক্রমেই যেন কমে গিয়ে বাইরের আকর্ষণ প্রবল হয়ে দেখা দিল। বাইরের জগতের হাতছানি তাকে পথমুখো ক'রে তুললো। গৃহ-বন্ধন যেন তার কাছে অর্থহীন এবং যত অনিয়ম যেন তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল; তাই বলে বাড়ীর বড়রা সুকান্তের এই অনিয়ম, পড়াশুনোর প্রতি অবহেলা আর শৃঙ্খলাহীনতা মোটেই পছন্দ করতেন না, ফলে সুকান্ত তাঁদের এড়িয়ে চলত। সুকান্তর অগ্রজ সুশীলদা একদিন দুঃখ করে সুকান্তকে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ জমিদার। তাই তাঁর জীবনে কাব্যচর্চা শখ করে করা সম্ভব; কিন্তু সুকান্ত হল সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সুতরাং তার কাব্যচর্চার সঙ্গে লেখাপড়ার প্রতি এবং নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। সুকান্ত স্বভাবতই এ মন্তব্য পছন্দ করে নি। আড়ালে তার নাম দিয়েছে 'বাড়ীর মালিক'। 'অতি কিশোরের ছড়া'য় সুকান্ত যেন তার এই সময়কার কথাই বলেছে। যদিও সে আমাদের সঙ্গে হাসি-তামাসায়

সময় কাটাত তবুও তার কবিতা লেখায় কোন ছেদ পড়ে নি। তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অবশ্য কবিতা লেখার বা তার কবিত্বশক্তি স্ফুরণের অনুকূল ছিল না। কিন্তু তার ছিল স্বাভাবিক প্রতিভা। সেই প্রতিভাই তাকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সেও যখন যেখানে থেকেছে লিখে চলেছে সুন্দর সুন্দর কবিতা। শিশুকাল থেকে শুরু ক'রে ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে তার কবিতা রচনাও চলেছে নিয়মিত। শিশু থেকে বালক এবং বালক থেকে কিশোর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রচনার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনও হয়েছে।

দুষ্টামি করে ছোটভাই প্রশান্তর নামে একদিন একটা ছড়া লিখেছিলো সে। তখন সে নিতান্তই বালক। শুনেছি বড়রা সুকান্তর এই দুষ্টামিতে হেসেছিলেন আড়ালে, যদিও সামনে তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল।

একদিন কথামালার 'বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' নামক বিখ্যাত গল্পটিকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছিল সুকান্ত। এজন্য বাড়ীর লোকের কাছে তার খ্যাতিও হয়েছিল যথেষ্ট।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিষাদভরা দুঃখ ও বেদনাময় অনুভূতিই ছিল তার প্রথম কৈশোরের কবিতার বিষয়বস্তু। মনে হয়, তার শৈশব এবং অতি কৈশোরে অনেকগুলি মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাকে বা তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাই এই সময়ের কবিতাগুলির মাঝে বিষাদকরুণভাব এবং হতাশার অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। তার এই সময়ের লেখা 'রাখাল ছেলে' নামক রূপক গীতিচিত্রে যেন তার ব্যক্তিগত দুঃখ, ব্যথা, বেদনাবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

আমার মনে হয়, বাইরের আকর্ষণ সুকান্তকে করেছিল গৃহছাড়া আর তার নিয়মশৃঙ্খলাহীন জীবন তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল রাজনীতির মধ্যে। তাই বাইরের জগতের বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বিশেষ ক'রে সারা পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে তার এই স্বভাবসুলভ বিষণ্ণতার সুর যেন অচিরেই মিশিয়ে গেল এবং তার কোমল কবিসত্ত্বাকে করল আঘাত। ধীরে ধীরে তার মনের অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে লাগল রচনায়। অতি দ্রুত তার রচনা এক নতুন মোড় নিল, এক নতুন পথে চলা শুরু করল।

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কবির প্রথম প্রকাশিত রচনা কিন্তু কবিতা নয়, তা হচ্ছে একটি ছোট প্রবন্ধ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ছোট ঘটনার উপর লেখা এই প্রবন্ধটি 'শিখা' নামক ছোটদের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নতেদা ছিল তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার নিয়মিত পাঠক। তার কাছে সুকান্ত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেত। তাছাড়া আরও নানারকম কবিতার বই ও পত্র-পত্রিকা সুকান্ত নতেদার কাছে নিয়মিত দেখবার সুযোগ পেয়েছে ও পড়েছে। ছোড়দার বিয়েতে পাওয়া একটি উপহারের বই নতেদার নজরে আসে। এটি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্কলন। নতেদা এই সঙ্কলনটি পড়ে মুগ্ধ হয় এবং সুকান্তকে এটি পড়তে বলে। সুকান্ত এ বইটি অতি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়; এই পুস্তকে প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পদাতিক' 'মে দিবসের কবিতা' 'আবিষ্কার' ইত্যাদি কবিতাগুলি সুকান্তব খুব ভাল লাগে। এছাড়া অন্যান্য কবি যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাস প্রভৃতির লেখার ধরন এবং তাদের রচনার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে সুকান্ত মুগ্ধ হয, আকৃষ্ট হয় তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি। সে যেন নতুন পথের সন্ধান পায়। এই সঙ্কলনের মাধ্যমেই সে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার কবিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। যাই হোক, এই ঘটনা সুকান্তর কাব্যজীবনে আনল এক প্রচণ্ড আলোড়ন।

নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হল সুকান্ত। নতুন দিগন্ত খুলে গেল তার সামনে। আর দেরী করে না সুকান্ত; এখন তার রচনার গতি-প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দেখা যায়। এতদিনের পরিচিত পথ ছেড়ে নতুন ধরনেব রচনায় মনোনিবেশ করে সে। এই সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯৪১ সাল থেকেই শুরু হল সুকান্তর লেখা অনবদ্য কবিতাগুলি নতুন ভাবরসে সিঞ্চিত হ'য়ে বাস্তবতার কঠিন কঠোর দৃঢ়তা নিয়ে। এই সব কবিতাগুলি পরে 'পূর্বাভাস' এবং অন্যান্য পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময় স্কটিশ চার্চ কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আর নতেদা এই কলেজেই তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নতেদাই সুকান্তকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ পরিচয় সুকান্তর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ সুকান্ত তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। নতেদা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সুকান্তর লেখা একখানা কবিতার খাতা পড়বার জন্য দেয়। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই খাতাখানি পড়ে চমকিত হয়ে কবির প্রতিভা যে পরম বিস্ময়কর তা স্বীকার করলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই খাতাখানা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসুকে পডানোর ব্যবস্থা করলেন। বুদ্ধদেব বসু নাকি মন্তব্য করেন যে, এত সুন্দর কবিতা এবং ছন্দের উপর এমন দখল তিনি দেখেন নি। এ কবিতার রচয়িতাকে এ যুগের বিস্ময় বলে তিনি বর্ণনা করেন।

'সুকান্ত-সমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন এইভাবে—"আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছি। 'পদাতিক' বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রীটের চায়েব দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর ক'রে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। প'ড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি কবিতাগুলো সত্যিই তার চৌদ্দ বছরের খুড়তুত ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন আমার অন্যান্য বন্ধুরা এমনকি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা পড়ে অবাক না হ'য়ে পারেন নি।

আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যেই বোধহয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারব না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কী এমন ছিল যে প'ড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? আজকের

পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি ব'য়ে এসেছে। কোন কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত। হালে সে জিনিস প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎশক্তিকে কলকারখানায় খেতে খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।"

যাই হোক, এর পরেই সুকান্তর রচনাগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করেছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তার রচিত কবিতা যখনই যাঁর চোখে পড়েছে তখনই তিনি সুকান্তকে এ যুগের অন্যতম শক্তিশালী কবি বলে মেনে নিয়েছেন, অনুভব করেছেন যে সুকান্ত এক প্রতিভাবান কবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চলেছে বিপুলভাবে। হিটলার মুসোলিনীর ফ্যাসিস্টবাহিনী তখন সারা পৃথিবী তোলপাড় করে তুলেছে। সেই সময় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তরুণতম সদস্য ছিল সুকান্ত এবং সেই সূত্রে সে পরিচিত হয়েছিল তৎকালীন বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে। এঁদের সবার কাছেই সুকান্ত ছিল পরম বিস্ময় এবং এঁরা সকলেই সুকান্তকে অসাধারণ কবি বলে স্বীকার করতেন।

মহাযুদ্ধ ত চলছিলই তারপর একে একে দেখা দিল বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এইসব ঘটনা কবির জীবনে তার কোমল কবি সত্তার ওপর গভীর ছাপ ফেলে; তার মনে ওঠে প্রচণ্ড আলোড়ন আর অস্থিরতা। তারই প্রকাশ দেখা যায় তার পরবর্তী কবিতাগুলিতে।

১৮

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি সে আকৃষ্ট হয় এবং জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই

পরিচিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে। এমন অকৃত্রিম একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অনুরাগ বিরল।

সুকান্ত তখন নিতান্ত বালক, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। নতেদার সঙ্গে সুকান্ত গেল কবি দর্শনের প্রবল আগ্রহে। প্রচণ্ড ভিড় সত্ত্বেও নতেদার চেষ্টায় বালক সুকান্ত কবির পাশেই জায়গা পেয়ে গেছল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে সুকান্ত দর্শন করেছিল রবীন্দ্রনাথকে অসীম আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কথা, তাঁর সামান্যতম নড়াচড়া এসবই সুকান্ত নিরীক্ষণ করছিল আগ্রহের সঙ্গে। শুনেছি এই অনুষ্ঠানের চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল গেজেটে। আজও যদি পুরনো ছবি অনুসন্ধান করা যায়, আমার বিশ্বাস, মহাকবির পাশে পরবর্তীকালের কবির ছবি পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম সুকান্তর জন্যই। যতদূর মনে পড়ে তখন গীতবিতান বা স্বর-বিতান প্রকাশিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি তখন ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন পুস্তকে। তাই কোন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী যখন রেডিওতে গাইতেন আমরা তখন সেই গানগুলি লিখে নিতাম খাতায়। এমনি করে ভরে উঠেছিল একখানি গানের খাতা। সুকান্ত মাঝে মাঝেই এই খাতাখানা নাড়াচাড়া করত।

আমাদের ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের নিজ কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি মাঝে মাঝে প্রচারিত হত রেডিওয়। সুকান্ত এই অনুষ্ঠানগুলি খুব মন দিয়ে শুনত। একবার রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠসংগীতের রেকর্ড "তবু মনে রেখ........." রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছিল। গানটা শুনে বালকসুলভ চপলতায় আমি হেসেছিলাম এবং একটি সস্তা রসিকতা করেছিলাম। সুকান্ত এতে অসম্ভব রেগে গিয়েছিল। কিছুতেই সে আমার এই অশিষ্ট ব্যবহার সহ্য করতে পারে নি। দুএকটি কটু কথাও আমাকে শুনিয়েছিল। আমার অনুমান, এ সময় সুকান্ত মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে পরিচিত। যদিও কণ্ঠে সুকান্তর সুর ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের বহু গান তার কণ্ঠস্থ ছিল আর জানা ছিল তার সঠিক সুর।

মহাকবির মহাপ্রয়াণে সুকান্ত গভীর বেদনা পেয়েছিল। আমার মনে

আছে তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল অতি নিকট আত্মীয়-বিয়োগের শোকচিহ্ন। সুকান্তর আগ্রহে আমিও তার সঙ্গে শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণ করলাম। সুকান্ত আর আমি চলেছি নিমতলা শ্মশানের পথে, উদ্দেশ্য শেষবারের মত মহাকবির দর্শনলাভ। রাস্তায় অগণিত জনতার স্রোত। তাদের সবার মুখে শোকের কাতরতা। আমরা দুজন সেই বিশাল জনস্রোতে ভেসে চলেছি। বিশাল এ জনসমুদ্র, কোথায় এর শেষ, কোথায় শুরু জানবার উপায় নেই। সামনে আর পেছনে শুধু মানুষ আর মানুষ। নদী যেমন সাগরে মেশে তেমনি মূল রাস্তার আশপাশের অলিগলি থেকে জনতার স্রোত এসে এই বিশাল জনসমুদ্রে মিশে যাচ্ছিল। আর রয়েছে ফুল। কত লোক যে ফুল আর ফুলের মালা সঙ্গে করে এনেছে তার যেন শেষ নেই। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, আর আমাদের জীবনে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে জনতা নিমতলা স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেছে। পথের কেউ জানে না মহাকবির নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা। সবারই অন্তরের ইচ্ছে একবার শেষবারের মত মহাকবির দর্শন। বাস্তবিক, এক সঙ্গে এত লোকের সমাবেশ এর আগে আমরা কখনও দেখি নি। পথ চলতে অনেকের মুখেই আলোচনা শুনেছিলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে নাকি এমনি বিশাল জন সমাবেশ হয়েছিল সেই শোক যাত্রায়। পরবর্তীকালে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রুশ্চভ ও বুলগানিনের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে এমনি জনতার জোয়ার দেখেছিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা নিমতলার শ্মশান ঘাটে পৌঁছলাম, কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্যে আর এগোতে পারলাম না। সুকান্তর তখনও কোন রকমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার জন্যে কি ব্যাকুলতা! কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল; আমরা সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ী ফিরে এলাম। তখনও জনতার স্রোত চলেছে জনসমুদ্রে মেশবার আকুল আগ্রহে, মহাকবির শেষদর্শন কামনায়।

রেডিওতে সারাদিন ধরে ধারা বিবরণী প্রচারিত হয়েছিল আর সুকান্ত রেডিওয় কান দিয়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল শোকযাত্রায় যাবার আগে পর্যন্ত। বিকেলের দিকে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব

উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠ করেন। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি। জানি না এমন বিস্ময়কর ঘটনা এর আগে ঘটেছে কিনা! এক মহাকবি সারা জীবনের অজস্র সম্ভার দেশবাসীকে উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন আর এই বিদায়ের করুণ বীণা বাজালেন আর এক কবি যাঁর বীণায় এর আগে শুধু আগুনের সুর বেজেছে। এই করুণ সুর সেইক্ষণে অভিভূত করেছিল আর একটি আশ্চর্য প্রতিভাবান তরুণ কবিকে। একসূত্রে গাঁথা এ এক বিচিত্র মালা।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের শোকযাত্রা এবং তাঁর শেষকৃত্যের পূর্ণ বিবরণ দিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেই করুণ বিবরণ প্রচার করা হল আকাশ-বাণীর (তখন নাম ছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও) কলকাতা কেন্দ্র থেকে। সে বিবরণ এমনই করুণ রস সিঞ্চিত যে রেডিওর সামনে উপস্থিত সবার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল। আজও মনে পড়ে এ সময় আমি বারবার সুকান্তর দিকে চাইছিলাম, বুঝতে চাইছিলাম তার মনের অস্থিরতা।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের কয়েকদিন পরে আমাদের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ীতে রবীন্দ্র-স্মৃতি তর্পণ উদ্দেশ্যে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল রমা। এটা শুধু ছোটদের অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু আমরা খুশী হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমি রমা সুকান্ত ঘেলু এবং বাড়ীর অন্যান্য ছোটরা ছাড়াও বৌদি এবং জেঠামশাই যোগ দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ঘেলু আর আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেছিলাম আর রমা একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছিল। রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে সুকান্ত অল্প কথায় কিছু বলেছিল আর পাঠ করেছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কোন কবিতা অবশ্য সে রচনা করে নি এই উপলক্ষে। অনুমান করি শোকের বিহ্বলতায় সে বোধ হয় কোন কবিতা লিখতে চায় নি। নিজের দুঃখে চিৎকার করে কাঁদার সে ছিল বরাবরই বিরোধী।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ল। এই অনুষ্ঠানের পরে আমাদের পিসতুত বৌদি সুকান্তর কাছে এই অনুষ্ঠান কেমন হল জানতে চাইল এবং রমার পরিবেশিত সংগীত তার কেমন লাগল সে কথাও জিজ্ঞাসা

করল। সুকান্ত জবাব দিল, "একটা পিঁ পিঁ করে আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল বটে তবে কি গান গাওয়া হল তা বুঝতে পারি নি।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রেডিও-র ছোটদের আসর থেকে দাদুমণি স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আহ্বান জানালেন ছোটদের সকলকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখতে। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতর্পণ। এই লেখাগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ বেতার জগতে ছোটদের আসর বিভাগে রবীন্দ্রস্মৃতি তর্পন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। সুকান্ত ও আমার লেখার অংশ বিশেষ এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। সুকান্তর লেখার প্রকাশিত অংশটুকুর মূল বক্তব্য ছিল এই যে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করবার জন্যে বাংলা ভাষার হরফগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার অক্ষরের মত করে দেওয়া উচিত। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের সঙ্গে সুকান্তর হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য ছিল। শুনেছি একজন সাহিত্যিক নাকি এই সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তা সুকান্তর কাছে উল্লেখ করেছিলেন। সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের ঢঙে কবিতা আবৃত্তি করত। আমরা ওর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে চাইতাম কারণ এই সাদৃশ্য আমাদের ভালো লাগত।

গদ্য কবিতা আমি নিজে খুব পছন্দ করতাম না, তাই সুকান্ত যখন গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করল তখন আমি আমার অপছন্দের কথা উল্লেখ করতাম। ওকে বলতাম, যারা কবিতায় মিল খুঁজে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা গদ্য কবিতা লিখবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ছন্দ আর মিল যখন তার একান্ত অনুগত তখন সে কেন অকারণে গদ্য কবিতা লিখবে। সুকান্ত হাসত আর বলত, "গদ্য কবিতারও একটা প্রয়োজন আছে।" এ প্রয়োজনটা অবশ্য পরবর্তীকালে আমার কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে তার লেখা 'কাশ্মীর' কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কবিতাটি একবার গদ্যে এবং একবার পদ্যে লেখা হয়েছিল। বক্তব্য বিষয়টি যেন বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা হয়েছে গদ্য কবিতার মাধ্যমেই। 'ছাড়পত্রে' সঙ্কলিত কবিতা দুটি তুলনা করে পড়লেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। অবশ্য সুকান্তর হাতে ছন্দ-মিল নিয়েই হোক বা কঠিন গদ্যেই হোক কবিতা সব সময়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে সমস্ত

রকম বিষয়বস্তুকেই নিজস্ব একটা রূপে এমন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় উপস্থিত করত যা অতি সহজেই পাঠকের অন্তর স্পর্শ করত। ছন্দ আর মিল নিয়েও সে অজস্র সুন্দর কবিতা লিখেছে। যেমন 'হে মহাজীবন' :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥

আমি গদ্য কবিতা পছন্দ না করলেও অবশ্য সুকান্তর লেখাগুলো পড়তাম। আমাদের বিশেষ করে ছোটমামার অনুরোধে সে কয়েকটি গান রচনা করেছিল। সেগুলো 'গীতিগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলোতে রবীন্দ্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তর ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক বড় অবলম্বন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে রচনায় নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা একমাত্র প্রতিভাবান কবির পক্ষেই সম্ভবপর। এই তরুণ কবি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার না করে তাঁর প্রভাব সত্ত্বেও নিজস্ব একটা ধারার প্রবর্তন করেছিল। তার প্রথম দিকের রচনায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়া লক্ষ্য করা যায়, যা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় সুকান্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা লিখেছিল ; যেমন 'প্রথম বার্ষিকী', 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' আর ছোটদের জন্যে 'এক যে ছিল' এবং একটি গীতিনাট্য 'সূর্য-প্রণাম'। 'পঁচিশে বৈশাখ' নামে একটি কবিতা সে আমাকে উপহার দিয়েছিল। এই কবিতাটি পরে 'সূর্য-প্রণাম' গীতিনাট্যে ব্যবহার করেছিল। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্র প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

বেলাশেষে শান্তছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে,
তারি মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক ॥
পথপ্রান্তে
প্রাচীন কদম্বতরুমূলে,
ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যাত্রা যায় ভুলে।
আবার মলিন হাসি হেসে,
চলে নিরুদ্দেশে।
রজনীর অন্ধকারে একটি মলিন দীপ হাতে
কাদের সন্ধান করে উষ্ণ অশ্রুপাতে
কালের সমাধিতলে।
স্মৃতিরে সঞ্চয় করে জীবন-অঞ্চলে ;
মাঝে মাঝে চেয়ে রয় ব্যথা ভরা পশ্চিমের দিকে,
নির্নিমিখে।
যেথায় পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে অমর অক্ষরে
সেথায় কাদের আর্তনাদ বারংবার বৈশাখীর ঝড়ে।
আবার সম্মুখপানে
যাত্রা করে রাত্রির আহ্বানে।
ক্ষণদীপ উর্বর আলোতে
চিরন্তন পথের সংকেত
রেখে যায় প্রভাতের কানে।
অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃতির অন্তঃপুরে,
ভেসে ওঠে মানসমুকুরে
উত্তরকালের আর্তনাদ,—
"কবিগুরু
আমাদের যাত্রা শুরু
কালের অরণ্য পথে পথে

পরিত্যক্ত তব রাজ-রথে
আজি হতে শতবর্ষ আগে ·
অস্ত গোধূলির সন্ধ্যারাগে
যে দিগন্ত হয়েছে রক্তিম,
সেথা আজ কারো চিত্তবীণা
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজে কিনা
সে কথা শুধাও ?
শুধু দিয়ে যাও
ক্ষণিকের দক্ষিণ বাতাসে তোমার সুবাস
বাণীহীন অন্তরের অন্তিম আভাস ।
তাই আজ বাধামুক্ত হিয়া
অজস্র উপেক্ষাভরে বিস্মৃতিরে পশ্চাতে ফেলিয়া
ছিন্নবাধা বলাকার মতো
মত্ত অবিরত,
পশ্চাতের প্রভাতের পুষ্প-কুঞ্জবনে
আজ শূন্য মনে ।”
তাই উচ্চকিত পথিকের মন
অকারণ
উচ্ছলিত চঞ্চল পবনে
অনাগত গগনে গগনে ।
ক্লান্ত আজ প্রভাতের উৎসবের বাঁশি ;
পুরবাসী নবীন প্রভাতে
পুরাতন জয়মাল্য হাতে !
অস্তাচলে পথিকের মুখে মূর্ত হাসি ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা এত আন্তরিক এবং গভীর ছিল যে তাঁর বিন্দুমাত্র সমালোচনাও সুকান্তর কাছে অসহ্য ছিল। খোকন একবার তার চিঠিতে স্থানের নাম কালীঘাট না লিখে দক্ষিণায়ন লিখেছিল। সূর্যের অবস্থান তখন দক্ষিণদিকে ছিল বলে সে এই শব্দ

ব্যবহার করেছিল। এটা সুকান্তর মনঃপূত হয় নি। সে পরে খোকনকে বলেছিল যে উত্তরায়ণ নামে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রবাসগৃহ আছে। তাই এ ব্যাপারে তার আপত্তি এই কারণে যে, সে মনে করেছিল খোকন হাল্কাভাবে উত্তরায়ণের বিপরীত হিসেবে দক্ষিণায়ন ব্যবহার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা, জাপানী কবি নোগুচির প্রতি আবেদন এবং সর্বোপরি র‍্যাথবোনকে লেখা তাঁর খোলাচিঠি সুকান্তর মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর "শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস" এই উপলব্ধি সুকান্তর অন্তরেও সাড়া জাগিয়েছিল। তার "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১৯

কবিগুরুর উদ্দেশে লিখিত রচনাগুলির মধ্যে "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। এই কবিতাটির একটি ইতিহাস আছে। সে কথাই এখন বলব।

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি নামে ঢাকুরিয়া লেকে একটি সংগঠন আছে। ১৯৪১ সাল থেকে '৪৩ সালের শেষ পর্যন্ত এখানে আমাদের যাতায়াত ছিল। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়ক এবং পরিচালক শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত মেজদার সহপাঠী এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই সূত্রে তিনি এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সন্তোষদা ও মেজদা এই সংগঠনের সভ্য ছিলেন। এ ছাড়া আমাদের অন্যান্য দাদারা, যেমন নতেদা এবং আমার জেঠতুত দাদা শচীন ভট্টাচার্য এখানে সভ্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল।

এ সমিতির নানা অনুষ্ঠানে ওঁরা তো আসতেনই এ ছাড়া আমাদের বৌদিরা এবং ছোটদের মধ্যে রমা তার বন্ধু বেলু, সুকান্ত, আমি, ঘেলু এবং খোকন ইত্যাদি আমরাও যোগ দিতাম বিপুল উৎসাহে। এখানকার অনুষ্ঠানগুলো হত অতি রমণীয়। সন্তোষদার সঙ্গে তৎকালীন সংগীত-শিল্পীদের যোগাযোগ থাকায় তাঁরা আসতেন দলে দলে অনুষ্ঠানগুলিকে সার্থকতায় ভরিয়ে দিতে। বর্তমানের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তখন উদীয়মান শিল্পী। তাঁকে পাওয়া যেত প্রায় সব অনুষ্ঠানে। এই সমিতির সভ্যদের এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও পরিবাবর্গ নিয়ে ছোটখাট ঘরোয়া অনুষ্ঠান হত। হাস্যরসিক অজিত চট্টোপাধ্যায় নানারকম স্কেচ দেখিয়ে প্রচুর আনন্দ দিতেন আমাদের।

একবারের অনুষ্ঠানে খেল্লু, নতেদার বন্ধু প্রভাতদা, তার ভগ্নী পারুল আর রমা এই কজনে মিলে "আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে" এই গানখানি সমবেত কণ্ঠে গেয়ে প্রশংসা পেয়েছিল। এখানে কলকাতার বহু গুণীজনেরা উপস্থিত থাকতেন যেমন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, সুবিনয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু ইত্যাদি। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য সাধারণত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

১৯৪৩ সালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এই আসরে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এইখানেই সুকান্ত তার স্বরচিত কবিতা "রবীন্দ্র-নাথের প্রতি" পাঠ করেছিল। তার এই কবিতা সচকিত করেছিল শ্রোতাদের এবং সে পেয়েছিল প্রচুর প্রশংসা। একটি অল্পবয়সী কিশোরের পক্ষে ছন্দে এরকম আশ্চর্য দখল, শব্দের যথাযথ ব্যবহার আর বক্তব্যের বিশেষ অভি-নবত্বে সবাই চমকিত ও বিস্মিত হল। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির অনেক প্রশংসা করলেন এবং চেয়ে নিয়ে আর একবার পড়লেন। কবিতাটিতে একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার হয়েছিল তিনি সেটার পরিবর্তে একটি বাংলা শব্দ দেবার জন্য তাকে পরামর্শ দিলেন। তাই যেখানে ছিল "আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের লাইনে প্রতীক্ষায়" সেটির পরিবর্তে কবি লিখল "আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়" এবং এই ভাবেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও সুকান্ত বাংলার শিক্ষিত সমাজে এবং পাঠক মহলে প্রায় অপরিচিত। যদিও তার কিছু লেখা এর মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

বাস্তবিক এই সংগঠনটি ছিল আমাদের কাছে এক আকর্ষণীয় আনন্দের কেন্দ্র, তাই পরম প্রিয়। এখানকার পরিবেশটিও সুন্দর। পশ্চিম দিকে সাঁতার কাটার এবং শেখার আয়োজন তারই লাগোয়া পুষ্করিণীটিতে। সমিতির ঘরটি একটি সুন্দর বাংলো বাড়ী। সামনে বারান্দা। পূর্বদিকে রাস্তা এবং পুষ্পলতা শোভিত প্রবেশপথ। দক্ষিণে সুন্দর ফুলের বাগান এবং

তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। বাগানে সযত্নলালিত বিচিত্র ফুলসম্ভার। পরম রমণীয় পরিবেশ। এ স্থানটি যে কবির ভাল লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তাই সুকান্ত মামাবাড়ী এলেই খোকনের সঙ্গে একবার সবার অগোচরে অসময়ে এসে এই সমিতির বাগানে একটু ঘুরে যেত।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের তাণ্ডব তখনও চলছে। ইংরেজ জাতির অবস্থা তখন শোচনীয়। জাপান যুদ্ধে প্রভূত সাফল্য অর্জন করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশাল সমর সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে, ভারতের নানাস্থানে ঘাঁটি গেড়েছে, বিশেষ করে কলকাতায়। তাই মিলিটারির প্রয়োজনে গ্রাস করা হল লেকের বিরাট একটা অংশ আর সেইসঙ্গে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির এই সুন্দব ক্লাব ঘরটি। বন্ধ হয়ে গেল ক্লাবের সমস্ত তৎপরতা আর আনন্দানুষ্ঠান। আমরা সবই এতে পেলাম গভীর দুঃখ। এই দুঃখ শুধু আমাদের নয় বড়দেরও মনে বেজেছিল।

এই সমিতি বন্ধ হয়ে যাওয়া উপলক্ষে ভারতীয় জীবন ত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণে কবিতাটি সুকান্ত লিখে দিয়েছিল শচীনদাকে। এই কবিতাটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বগত' কবিতাটির প্যারডি বিশেষ। এই স্বগত কবিতাটি ছিল সুকান্তর খুব প্রিয়। মনে আছে সে নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাড়ীতে বসে এই কবিতাটি আমায় পড়ে শুনিয়েছিল। কবিতাটি সত্যিই সুন্দর। তার ওপর ওর পড়বার বিশেষ ধরনে আমার মনে এক অপরূপ ভাবের সৃষ্টি করেছিল। স্বভাবতই এই ঘটনা আমাব মনে গভীর দাগ রেখে গেছে, এতদিনের ব্যবধানেও স্মৃতি ম্লান হয় নি এতটুকুও।

ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজের মহাপ্রয়াণে

অকস্মাৎ মধ্যদিনে গান বন্ধ ক'রে দিল পাখি,
ছিন্নভিন্ন সন্ধ্যাবেলা প্রাত্যহিক মিলনের রাখী;
ঘরে ঘরে অনেকেই নিঃসঙ্গ একাকী।

ক্লাব উঠে গিয়েছে সফরে,
শূন্য ঘর, শূন্য মাঠ,

ফুল ফোটা মালঞ্চ প'ড়ে
ত্যক্ত এ ক্লাবের কক্ষে নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে।

সূর্য অস্ত গিয়েছে কখন,
কারো আজ দেখা নেই—
কোথাও বন্ধুর দল ছড়ায় না হাসি,
নিষ্প্রভ ভোজের স্বপ্ন :
একটি কথাও শব্দ তোলে না বাতাসে—
ক্লাব-ঘরে ধুলো জমে,
বিনা গল্পে সন্ধ্যা হয়,
চাঁদ ওঠে উন্মুক্ত আকাশে।

খেলোয়াড় খেলে নাকো,
গায়কেরা গায় নাকো গান—
বক্তারা বলে না কথা,
সাঁতারুর বন্ধ আজ স্নান।
সর্বস্ব নিয়েছে গোরা তারা মারে উরুতে চাপড়,
যে পথে এ ক্লাব গেছে কে জানে সে পথের খবর ?

সন্ধ্যার আভাস আসে,
জ্বলে না আলোক ক্লাব কক্ষের কোলে,
হাতে হাতে নেই সিগারেট—
তর্কাতর্কি হয় নাকো বিভক্ত দু'দলে ;
অযথা সন্ধ্যায় কোনো অচেনার পদশব্দে
মালীটা হাঁকে না।

মনে পড়ে লেকের সে পথ ?
মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা হাওয়ার চাবুক ?

অনেক উজ্জ্বল দৃশ্য এই লেকে
করেছিল উৎসাসিত বুক।

কেরানী, বেকার, ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পী ও ডাক্তার
সকলের কাছে ছিল অবারিত দ্বার,
কাজের গহ্বর থেকে পাখিদের মতো এরা নীড়
সন্ধানে, সন্ধ্যায় ডেকে এনেছিল এইখানে ভিড়।
রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সিনেমার কথা,
এদের রসনা থেকে প্রত্যহ স্খলিত হত অলক্ষ্যে অযথা ;
মাঝে মাঝে অনর্থক উচ্ছ্বসিত হাসি,
বাতাসে ছড়াতো নিত্য শব্দ রাশি রাশি।

তারপর অকস্মাৎ ভেঙে গেল রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা,
সহসা চৈতন্যোদয় ; প্রত্যেকের বুকে ফোটে ক্ষুব্ধ রক্তজবা ;
সমস্ত গানের শেষে যেন ভেঙে গেল এক গানের আসর,
যেমন রাত্রির শেষে নিঃশেষে কাঙাল হয় বিবাহ-বাসর।

'জীবন-রক্ষক' এই সমাজের দারুণ অভাবে,
এদের 'জীবন-রক্ষা' হয়তো কঠিন হবে,
হয়তো অনেক প্রাণ যাবে॥

লক্ষ্য করা যেতে পারে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির একটা বাংলা ভাষান্তর সুকান্ত করেছিল "ভারতীয় জীবনত্রাণ-সমাজ"। শুনতে ভালই লাগছে। বাংলা ভাষার ব্যবহার আমরা বহু ক্ষেত্রেই করি না এবং বহু সময়ে দেখা যায় যে সুন্দর বাংলা শব্দ থাকা সত্ত্বেও আমরা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি। সুকান্তর কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাই দেখা যায় সে এই রকম সুন্দর সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ রচনায় প্রয়াসী হতো। আমি চাকরীর প্রয়োজনে একবার গৌহাটি গিয়েছিলাম ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের কর্মী হিসেবে। তখন সুকান্ত আমাকে যেসব চিঠি লিখত তার খামের ওপর যদিও ইংরেজীতে ঠিকানা লিখত, খামের ভেতরে কিন্তু লিখে দিত

প্রেরক—সুকান্ত ভট্টাচার্য। গ্রাহক—ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আর ঠিকানা দিত নিজের সৃষ্ট বাংলায়—যুক্ত বাণিজ্যিক সঞ্চয় সদন—গৌহাটি। ব্যাংকের প্রতিশব্দ সঞ্চয় সদন কিন্তু ভারী সুন্দর। এটাকে ব্যাংকের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়? সুকান্ত শব্দের ব্যবহারে সর্বদাই সচেতন ছিল যেন তার কথাবার্তায় ইংরেজী শব্দ এসে না পড়ে।

যুদ্ধের অবসানে লাইফ সেভিং সমিতির ভবনটি ফেরৎ পাওয়া গেল মিলিটারীর কাছে থেকে। সময়াভাবে মেজদা আর সন্তোষদা ওখানে আর বিশেষ যেতে পারেন নি, কিন্তু বেশ কয়েকদিন ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করেছিল নতেদা আর শচীনদা। নবাগতের জোয়ারে তারা অবশ্য ভেসে গেল বিস্মৃতির গর্ভে। নবাগতরা জানল না এ দুজনের পরিচয় এবং এই সংগঠনটির সঙ্গে তাদের অতীত দিনের সম্পর্ক, এদের কার্যকলাপ ও কর্মোদ্যমের ইতিহাস। এরাও যে এই সমিতির উৎসাহী সদস্য ছিল তাও বর্তমান সভ্যরা ভুলে গেলেন। তাই পরম অনাদর, অবহেলা আর অভিমানে এই দুই সভ্য বিদায় নিল ঝরাপাতার মত। এদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এই সুন্দর সংগঠনটির সঙ্গে পাকাপাকিভাবে। আমি জানি না বর্তমান সদস্যরা এই অতীত ইতিহাস জানেন কিনা। তাঁদের অনেকের কাছেই আজ হয়ত অজানা রয়ে গেছে যে কবি সুকান্তর এখানে আসা-যাওয়া ছিল।

২০

আগেই বলেছি বাড়ীতে থাকার চেয়ে বাইরে থাকাই ছিল সুকান্তর অধিকতর প্রিয়। মানুষটা লাজুক মুখচোরা হলেও বাইরের আহ্বান সে অবহেলা করতে পারে নি। কোন একসময় সে জড়িয়ে পড়েছে রাজনীতির সঙ্গে, ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কাজে।

১৯৪৪ সালের জুন মাসে বাড়ীর দমবন্ধ পরিবেশে এল বাইরের মুক্ত হাওয়া। বাড়ীর তথাকথিত দৈনন্দিন জীবনে এল বৈচিত্র্য। এ সময় তার অগ্রজ সুশীলদার বিয়ে হল। বাড়ীর পরিবেশ হল পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। নতুন হাতের ছোঁয়াচ পাওয়া যেতে লাগল, গুরুভার আবহাওয়া যেন একটু

হাল্কা হল। খাওয়া-দাওয়ায় আদর-আপ্যায়নে এল আন্তরিকতার স্পর্শ। যদিও নতুন গৃহিণীর বয়স ছিল অল্প আর ছিল অভিজ্ঞতার অভাব, তবুও আন্তরিকভাবে হাল ধরার প্রয়াস পেয়েছিল বেলা বৌদি। যেন একটা ভরসা পাওয়া গেল এবার সংসার তরণী এগিয়ে চলবে অনুকুল বাতাসে। সুকান্তব মনেও এসেছিল খুশীর ছোঁয়াচ।

এই বিয়ে উপলক্ষে আমি, রমা আর মেজবৌদি নারকেলডাঙ্গার বাড়ীতে কাটিয়ে এলাম কয়েকদিন। বৌভাতের দিন সকাল বেলায় আমরা নানা কাজে ব্যস্ত, সুকান্ত আর আমি গেলাম ডেকরেটারের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থায়। ওখানে একটা প্রকাণ্ড তালপাতার হাতপাখা দেখা গেল। এই পাখাটা অস্বাভাবিক বড়। সুকান্ত তখনই ওটা ভাড়া করে নিল। কারণ জানতে চাওয়ায় সে বলল, "দেখ না কি মজা হবে।" বাস্তবিক, সারাদিন ও সন্ধ্যায় ওই পাখা নিয়ে খুব মজাকরা গেল। অত বড় একটা হাত পাখা সবার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মেয়েদের বসার ঘরে এই পাখাখানা দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া দেওয়ায় হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়। তখনও মহাযুদ্ধ চলেছে তাই জাপানী বিমান আক্রমণের আশংকায় কলকাতায় সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ অবস্থা। বাড়ীর ভেতরে অবশ্য ব্যবস্থা হয়েছে প্রচুর আলোর। তাই আমাদের অনভ্যস্ত চোখে 'হঠাৎ আলোব ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' সুকান্ত যেন নব উদ্যমে এই উৎসবে মেতে উঠেছে। বাড়ীতে জড় হয়েছে অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব। বাড়ীর উৎসবে সুকান্ত খুব খুশী। সবার সঙ্গে গল্প-গুজবে হাসি-তামাশায় সময় কাটছে। ওর বাড়ীতেও যে উৎসব হতে পারে এটা যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। তাই মনের আনন্দে সকলের সঙ্গে কথা বলছে ঘুরে ঘুরে। কবি সুকান্ত তখন অনুপস্থিত, মানুষ সুকান্ত হাজির হয়েছে সেই সময়।

বাইরে কিন্তু তার পিছটান তাকে মাঝে মাঝে আনমনা করে দেয়। তার আশংকা এই বিয়ের কাজে তার রাজনৈতিক দলের কাজের ব্যাঘাত ঘটছে, কামাই হয়ে যাচ্ছে। উৎসবের শেষে অবশ্য তার ক্লান্তি এসেছিল। এক নাগাড়ে কদিন ধরে রসিকতা করায় বোধ হয় তার নিজের কাছে নিজেকে ভাঁড় বলে মনে হয়েছিল।

যাই হোক, আমার নিশ্চিত ধারণা সুকান্ত বাড়ীর আবহাওয়ার পরিবর্তনে বিশেষ খুশীই হয়েছিল। এই ছন্নছাড়া পরিবারটিতে যে নববধূর আগমন হয়েছে যাকে নিয়ে হয়েছে উৎসবের আয়োজন, তার কাছে সুকান্তর কিছু আবেদন ছিল। একটা কবিতায় সেইকথা সে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু নিজের লাজুক স্বভাবের জন্যে এই কবিতাটি তাকে নিজের হাতে দিতে পারে নি। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি এই রকম :

এ শহর নিষ্প্রদীপ নিষ্প্রদীপ আমাদের ঘর,
জমেছে উদাসধুলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
এখানে কখনো কেউ পায় নিকো বসন্তের হাওয়া
তাইত এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।
বাঁচার আতঙ্ক স্পষ্ট, দারিদ্র্য অনবগুণ্ঠিত
সন্ত্রস্ত ফুলের গন্ধ, এখানে চাঁদও কুণ্ঠিত।
বুভুক্ষায় পিষ্ট আশা, তিরোহিত নিষ্ফল নিঃশ্বাসও
একটি প্রদীপ এনো এখানে কখনো যদি আসো।
শুরু হবে অন্ধকারে সে আলোয় প্রাথমিক চেনা
রাত্রি শেষে সে প্রদীপ অবশেষে সূর্য কি হবে না ?

এই কটি কথায় সুকান্তর তৎকালীন বাড়ীর গুরুভার আবহাওয়া আর ওর মনের ভাব স্পষ্ট বোঝা যায়।

যদিও নববধূর আগমনে এবং তার কল্যাণস্পর্শে এই বাড়ীর ভেতরটার কিছু সংস্কার হয়েছিল, সাংসারিক জীবনে এসেছিল যতির আয়েস, আবহাওয়া কিছুটা লঘু, এসেছিল বসন্তের হাওয়া ; কিন্তু সুকান্ত তখন বাইরের জগতে এমন ভাবে মিশে গেছে যে বাড়ীতে তার মন আর বসল না। সে যে বিশ্বনাগরিকত্ব পেয়ে গিয়েছিল। গৃহবন্ধন ত তার জন্যে নয়। যে ভবঘুরে স্বভাবের সৃষ্টি হয়েছিল তার মাঝে তার থেকে মুক্তি পাবে সে কেমন করে। পথ তাকে ডেকেছে প্রতিনিয়ত, পথের নেশা তাকে আকুল করে আবার ঘরছাড়া করল। সে তার আগেকার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে গেল। জনতার কবি জনতার মাঝে মিশে গেল।

সুকান্ত তার পূর্ব অভ্যাস মত আবার যাওয়া-আসা শুরু করল তার পরিচিত জায়গায়। তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অরুণাচল বসুর বাড়ী তার নিয়মিত যাওয়া-আসা ছিল। অরুণাচলের মা সরলাদেবী তথা সমগ্র পরিবারের সঙ্গে কবির ছিল মধুর সম্পর্ক। সেখানে ছিল তার জন্য স্নেহের আসন পাতা। অরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বহু আগে, সম্ভবত ১৯৪০ সালে, যখন সে দেশবন্ধু হাই স্কুলে সুকান্তর সহপাঠী ছিল। এ ছাড়া সুকান্তর অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে রবিনের সঙ্গেও ছিল আমার প্রীতির সম্পর্ক।

আমাদের বাড়ীতে সুকান্ত ছিল সকলেরই বড় প্রিয়। তার স্বভাবগুণে সবার মনে সে স্থায়ী স্নেহের আসন করে নিয়েছিল। তার সাহচর্য ছিল ছোট-বড় সবার কাছেই বড মধুর ও আনন্দময়। আমার মা সুকান্তকে খুবই পছন্দ করতেন, ভালবাসতেন নিজের ছেলের মত। এই মাতৃহীন ছেলেটির, বিশেষ করে তার এই অনিয়ম আর শৃঙ্খলাহীন জীবনের জন্য আমার মায়ের মনে বড় দুঃখ ছিল। কবির এই ভবঘুরে স্বভাবের জন্যও আমার মায়ের মনে একটা চাপা বেদনা ছিল। মাঝে মাঝে মা বলতেন, "বুডি (সুকান্তর মা সুনীতি দেবী) বেঁচে থাকলে সুকান্ত কখনই এমন ছন্নছাডা বেহিসেবী হতে পারত না।" সেজন্য সম্ভবত সুকান্ত এ বাড়াতে এলে আম ব মাতাকে ছাড়তে চাইতেন না, .আটকে রাখতেন তাঁর নিজের স্নেহছায়ায। যত্ন করে নিজের হাতে রান্না ক'রে তাকে খাওয়াতেন, হয়ত ক্ষণকালেব জন্যও কবিকে ভুলিয়ে দিতে চাইতেন তার মায়ের অভাব। আমাদের বাড়ী দু'এক দিন থাকতে সুকান্ত পছন্দই করত।

আমার বড় বৌদি অমলা দেবীর সঙ্গে সুকান্তর খুব ভাব ছিল। বৌদিকে সে নানারকম গল্প শোনাত, কোন ভাল বই পড়লে নিজের অনুভূতির কথা, ভাল বা মন্দ লাগার বিষয়ে নিজের মতামত তার কাছে খুলে বলত। তার সঙ্গে সুকান্তর এবং আমাদের সকলের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। তাই

সুকান্ত এ বাড়ীতে এলে আমাদের সঙ্গে বৌদিও খুশী হত এবং হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যেত। বৌদির কাছে এ-সব স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল।

অরুণাচল বসু একবার সুকান্তকে কোন মহিলা লেখিকার কাছ থেকে কিছু রচনা সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানিয়েছিল তার পরিচালিত 'ত্রিদিব' পত্রিকার জন্য। সুকান্ত আর কোন মহিলা লেখিকা না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমার বৌদিকেই চেপে ধরল লেখার জন্য। সে এক মজার ব্যাপার। সুকান্তর কথাতেই বলি—"মহিলা লেখিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে এক মজার কাণ্ড করেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে, ভূপেনের এক বৌদি আছেন, অত্যন্ত ভালমানুষ। তাকে একদিন এমন চেপে ধরেছিলাম সাঁড়াশির মত লেখা আদায়ের জন্য, যে তিনি কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন। কারণ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নাছোড়বান্দার মত ব্যাকুল হয়ে লেখা চাইছিলাম, পরিশেষে পায়ে ধরার যখন আয়োজন করলাম তখন দেখি তার অবস্থা শোচনীয়, কাজেই আখমাড়াই কলের মত অলেখিকার কাছ থেকে লেখা আদায়ের দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।" (পত্রগুচ্ছ, সুকান্ত-সমগ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ৩৪৮)।

সুকান্ত যখন নিজের কাজে উদয়াস্ত সারা কলকাতা চরকি দিয়ে ফিরত তখন তার নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ থাকত না। এমন বহুদিন গেছে সে প্রখর গ্রীষ্মেই হোক কিংবা প্রবল শীতেই হোক, তার স্নান করারও সময় থাকত না। মাঝে মাঝে সে কাজের তাড়নায় খেতেও ভুলে যেত।

সুকান্ত দিনের যে কোন সময়ে হুট্ করে এসে হাজির হ'ত আমাদের শ্যামবাজারের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ীতে। একদিন বেলা প্রায় তিনটে। দিনটা অবশ্য রবিবার, সুকান্ত এসে হাজির। অপরিচ্ছন্ন পোশাক, ধূলিধূসরিত রুক্ষ চেহারা, দেখেই বোঝা যায় অন্তত দু'তিনদিন তার স্নান হয় নি। স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করার প্রস্তাবে সে যখন বারবার আপত্তি করছিল এবং দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বৌদির সঙ্গে সরস রসিকতায় যখন সে মেতে উঠেছে, তখন এক বালতি জল এনে ওর গায়ে ঢেলে দিলাম। এই আচমকা আক্রমণে প্রথমে সে হতবুদ্ধি, তারপর শুরু হল হাসাহাসি। জোর ক'রে ধরে ওকে স্নানে পাঠান হল। অবশ্য ওর পোশাক-পরিচ্ছদ

সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল, তাই ভিজে পোশাক না ছেড়ে এবং স্নান না ক'রে উপায় ছিল না। যাই হোক, স্নান সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হল এবং বাঁধা পড়ে গেল সে সেদিনকার মত। মা এবং বৌদি তাকে বোঝালেন যে, এভাবে শরীরের প্রতি অবহেলা করা অনুচিত, এতে যেমন তার নিজের প্রতি অত্যাচার করা হয়, তেমনই মনোকষ্ট দেওয়া হয় তার গুরুজনদের। তাকে আরও বলা হল যে তার বাবার মনের অবস্থাটা সুকান্তর চিন্তা করে দেখা উচিত। তার বোঝাও দরকার যে, সে নিজের পছন্দমত কাজকর্ম করুক, রাজনৈতিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুক এতে বড়দের বিশেষ আপত্তি নেই। তাঁরা শুধু চান যে সে যেন স্নানাহার সম্বন্ধে একটু নিয়মনিষ্ঠ হয় এবং মনোযোগী হয় পড়াশুনার ব্যাপারে। কিন্তু এসবই অরণ্যে রোদন! বাইরের কাজে সে নিজেকে এমন জড়িয়ে ফেলেছিল বিশেষ করে তার রাজনৈতিক দলের প্রতি এতই নিষ্ঠা ছিল যে এ সব বুঝেও সে যেন কিছুতেই পারছিল না আর পাঁচজনের মত আত্মস্বার্থ চিন্তা করতে।

২২

মেজদা আর মেজবৌদির সঙ্গে সুকান্তের খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। বাস্তবিক মেজদা, মেজবৌদি আর নতেদা এই তিনজনে সুকান্তকে বড়ই স্নেহ করতেন এবং উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা জোগাতেন কবির কাব্যসৃষ্টিতে। এদের তিনজনেরই গুণ হচ্ছে এই যে এরা ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশতে পারেন, তাই এঁরা সবারই বড় প্রিয় আপনজন। মেজদা আর মেজবৌদি যেন উৎসব বাড়ীর প্রাণ। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁরা না যাওয়া পর্যন্ত উৎসব বাড়ী নিষ্প্রভ। সবার সুখে-দুঃখে মেজদা-মেজবৌদির দেখা পাওয়া গেছে। সুকান্তর নিকটতম জনদের মধ্যে ছিলেন এঁরা তিনজন।

মেজদার বন্ধুবান্ধব অগণিত। তাঁরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পিসীমার বাড়ী গেলে দেখতে পাওয়া যাবে মেজদার ঘরে জমায়েৎ হয়েছেন অনেকে। তার মধ্যে

সাহিত্যিক আছেন, আছেন সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ্, শিল্পী এবং আরও অনেকে যাঁরা এসেছেন নিছক আড্ডা দেবার তাগিদে এবং মেজদার সান্নিধ্য পেতে। এই বিচিত্র মানুষের সমাবেশে বিভিন্ন বয়সের নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যায়।

মেজদার একটি বিশেষ গুণ হল সাহিত্যচর্চা। নানা বিষয়ে তাঁর বৈচিত্র্যময় রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিত। তাই সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক মহলে মেজদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য সুপরিচিত। বাস্তবিক, একই মানুষের মধ্যে এত অসংখ্য গুণের সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না।

তাঁর জীবনে বিভিন্ন রকম ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে, হয়েছে ভাগ্যের উত্থান-পতন, এসেছে দুঃখ-হতাশা এবং আত্মীয় বিয়োগ ; কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই মেজদা, হাসিমুখে সবই তিনি সহ্য করেছেন। অর্থানুকূল্য বা অর্থাভাব কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে নি। সুকান্তর কথায় বলি, "...এখানকার সবাই বিশেষ করে মেজদা ডবল মামলার মামলেট খাওয়া সত্ত্বেও শরীরে ও মেজাজে বেশ শরিফ। বিপক্ষের বেহুদার সুযোগ নিয়ে তাদের লবেজান করা হবে, একেবারে জেরবার না হওয়া পর্যন্ত সবাই নাছোড়বান্দা, সকলের কাছে তাদের খিল্লাৎ খুলে ভবিষ্যতের খিল বন্ধ করে দেওয়া হবেই......।" [পত্রগুচ্ছ, সুকান্ত-সমগ্র, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৫৯-৬০]

এসময়ে মেজদা দুটি বড় মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যখন মেজদার আত্মীয় স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীরা এই ব্যাপারে কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত তখন মেজদাকে দেখে মনেই হয় নি যে, এ ব্যাপারে অণুমাত্র চিন্তা করবার কিছু আছে। তিনি মনে মেজাজে 'বেশ শরিফ'।

এই মেজদাই ছিলেন সুকান্তর প্রিয় বন্ধু, মনের মানুষ আর তার কাব্যের অনুপ্রেরণা। মেজদা সাধারণত ছোটদের নিয়ে আসর বসাতেন বাড়ীতে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের। পাঠ করে শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইত্যাদি বাংলা কাব্যসাহিত্যের দিকপাল কবিদের লেখা কবিতা। মাঝে মাঝে ইংরেজ কবিদের কবিতা আবৃত্তি করাও ছিল তাঁর অভ্যাস। এ ছাড়া সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা আর খেলোয়াড়দের কথাও শোনাতেন ছোটদের।

তাই মেজদার সঙ্গে সময় কাটানো ছিল ছোটদের খুবই আনন্দের এবং জ্ঞানবুদ্ধির সহায়ক। একান্নবর্তী পরিবারে থাকবার সময় শিশুকালে সুকান্ত আর রমা এই মেজদার সাহচর্য পেয়েছে প্রতিনিয়ত। সুকান্তর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণে এই পরিবারের তার অগ্রজত্রয় বড়দা, মেজদা এবং নতেদার প্রভাব অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে নতেদাই সুকান্তের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মেজদার বন্ধু এবং অগ্রজতুল্য। শ্যামবাজারের রামধন মিত্র লেনের বাড়ীতে তাঁকে আমরা প্রায়ই আমাদের মাঝে পাই। মেজদার মাধ্যমেই সুকান্তর সঙ্গে এই অগ্রজতুল্য সাহিত্যিকের পরিচয় হয়েছিল। সুকান্ত তাঁর স্নেহধন্য ছিল। তিনিও সুকান্তকে অসাধারণ প্রতিভাবান কবি বলে স্বীকার করেন।

সুকান্ত যখন অসুস্থ হয়ে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তখন সেখানে মেজদা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তিনিই আমার মা আর পিসীমাকে সঙ্গে করে ওখানে নিয়ে গেছেন সুকান্তকে দেখাবার জন্য। সুকান্তের পত্রে একথার উল্লেখ আছে। এরও আগে সুকান্ত যখন 'রেড-এড কিওর হোম'-এ চিকিৎসাধীন ছিল, তখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত অশান্তি আর যানবাহনের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও মেজদা সেখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতেন। সুকান্তকে তার নিজের প্রাণপ্রাচুর্যময় সঙ্গ দিতেন আর তার সঙ্গে গল্প করতেন নানা বিষয়ে, দিতেন সব খবরাখবর। বিশেষ করে যেসব কথা শুনলে সুকান্ত খুশী হবে, সে-সব কথা বলতে মেজদার ভুল হ'ত না। আমাকে লেখা সুকান্তর একটা চিঠির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রেড-এড কিওর হোম থেকে সুকান্ত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সালে নানা কথার শেষে লিখেছে "......মেজদার মুখে শুনলাম—তুই নাকি প্রায়ই 'স্বাধীনতা' কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত 'স্বাধীনতা' রাখলে আরো খুশী হবো..... "।

'স্বাধীনতা' ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র। পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই এই দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে।

যা বলছিলাম, মেজদার সঙ্গে সুকান্তর সম্পর্ক ছিল ভারী মধুর, নিবিড়তর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত। যে মামলা দুটির কথা এর আগে উল্লেখ করেছি তার একটি থেকে মেজদা সসম্মানে মুক্তি পান। এই মামলাজনিত কারণে সুকান্ত যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, তেমনই মেজদার সসম্মান মুক্তিতে সে পেয়েছিল প্রচুর আনন্দ। সেই উপলক্ষে 'মেজদাকে : মুক্তির অভিনন্দন' নামে কবিতাটি লিখে সে উপহার দিয়েছিল মেজদাকে। বাস্তবিক এ কবিতা শুধু উচ্ছ্বাসমাত্রই নয়, মেজদার সম্বন্ধে অনেকগুলি সত্য কথাই এখানে বলা হয়েছে।

মেজদাকে : মুক্তির অভিনন্দন

তোমাকে দেখেছি আমি অবিচল, দৃপ্ত দুঃসময়ে
ললাটে পড়ে নি রেখা ক্রূরতম সংকটেরও ভয়ে ;
তোমাকে দেখেছি আমি বিপদেও পরিহাস রত
দেখেছি তোমার মধ্যে কোনো এক শক্তি সংহত।
দুঃখে শোকে, বারবার অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে
অনাহত, আত্মমগ্ন সমুদ্যত জয়ধ্বজা হাতে।
শিল্প ও সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট তোমার হৃদয়
জীবনকে জানো তাই মান নাকো কোনো পরাজয়,
দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ মন যেন ব্যস্ত ভাগীরথী জল
পথের দু'ধারে তার ছড়ায় যে দানের ফসল,
পরোয়া রাখে না প্রতিদানের তা এমনি উদার,
বহুবার মুখোমুখি হয়েছে সে বিশ্বাসহন্তার।
তবুও অক্ষুণ্ণ মন, যতো হোক নিন্দা ও অখ্যাতি
সহিষ্ণু হৃদয় জানে সর্বদা সে মানুষের জ্ঞাতি,
তাইতো তোমার মুখে শুনে বাণপ্রস্থের ইঙ্গিত
মনেতে বিস্ময় মানি, শেষে হবে বিরক্তির জিত ?
পৃথিবীকে চেয়ে দেখ, প্রশ্নে ও সংশয়ে থরো থরো,
তোমার মুক্তির সঙ্গে বিশ্বের মুক্তিকে যোগ করো॥

এরপরে সুকান্তের সঙ্গে দেখা হলে সে বললো, "তোর সচিত্র গৌহাটি ভ্রমণ পেলুম।" সচিত্র কথাটির উপর বেশ জোর দিয়ে বলল। একটু হেসে আবার বললো, "এবার এটাকে ছাপিয়ে নিয়ে জনে জনে বিলি করে দে।" আমি আর সে কথার কোন জবাব দিলাম না, কারণ আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম।

মেজবৌদিও কথাটা পরে জেনেছিলেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে বললেন, "তুমি বুঝি দুজনকে একই চিঠি লিখেছ? আমি ত' বুঝতে পারি নি।" আমি বললাম, "আপনি ত' আর সুকান্তকে লেখা চিঠিখানি পড়েন নি তাই বুঝতে পারেন নি।" তিনি খুব একচোট হাসলেন এবং বললেন, "কেমন মজা! বন্ধুর কাছে ফাঁকিবাজী ধরা পড়ল ত'?" আমিও হাসলাম —অপ্রস্তুতের হাসি।

মেজবৌদি একবার কাশী থেকে একটা চিঠিতে কোন শিশুর পেটের অসুখের কথায় লিখেছিলেন যে সে ঘন ঘন 'এ্যা' করে। এই চিঠিতে 'এ' এর মাথায় মাত্রা টেনে দিয়েছিলেন, এবং এই ভুলটুকু সুকান্তের চোখে পড়েছিল। সে মন্তব্য করেছিল এ ত' 'এ্যা' নয় 'ত্র্যা' হয়ে গেল। সেই থেকে আমাদের মহলে প্রাতকৃত্যের নাম হয়ে গেল 'ত্র্যা করা'।

মেজবৌদিকে সুকান্ত অনেক চিঠি লিখেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলো সবই প্রায় হারিয়ে গেছে। একখানি চিঠি পাওয়া গেছে এবং সেটি সুকান্ত-সমগ্র গ্রন্থের পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিখানা পড়লেই সুকান্তর সঙ্গে মেজবৌদির মিষ্টি সম্পর্কের কথা বুঝতে পারা যায়। মেজবৌদি তখন কাশীতে। চিঠির এক জায়গায় সুকান্ত লিখেছে,— "...আমার জন্যে কিছু নেবার আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি আমি একটি পোড়ামুখ বাঁদর চাই। কেননা ঐ জিনিসটার প্রাচুর্য কাশীতে এখনো যথেষ্ট। তাছাড়া, স্মৃতি হিসাবেও জীবন্ত থাকবে। আর আমার সঙ্গেও মিলবে ভাল।"

পড়াশুনায় সুকান্তের অমনোযোগিতায় এবং অবহেলায় মেজবৌদির মনে একটা ক্ষোভ ছিল। তাই তিনি এ ব্যাপারে সুকান্তকে মাঝে মাঝে আগ্রহী

করার চেষ্টা করতেন। তাই সুকান্ত এই চিঠিতে নীচের ক'টি কথায় নিজের পড়াশুনার তৎকালীন উদ্যমের কথা বলেছে, মেজ বৌদিকে—

"...পড়াশুনায় হঠাৎ কয়েকদিন হল ভয়ানক ফাঁকি দিতে শুরু করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাঁকিবাজ হিসাবে নাম ক্রয় করেছি। পড়াশুনা করে না হোক, না করে যে ফার্স্ট হয়েছি, এইটাই আমার গর্বের বিষয় হয়েছে।..."

এটাই সুকান্তর প্রবেশিকা পরীক্ষার বছর। তাই সুকান্ত যেন মনে-প্রাণে চাইছিল মেজবৌদির কলকাতায় ফিরে আসা যাতে করে তিনি সুকান্তকে পড়াশুনার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলেন। তাই এই চিঠির সঙ্গে সুকান্ত একটি নীল নিমন্ত্রণ-পত্র মেজবৌদিকে পাঠিয়েছিল। নীচে এই নিমন্ত্রণ-পত্রের পূর্ণ বয়ান দেওয়া হল।

সময়োচিত নিবেদন,

আগামী...তারিখে মদীয় পরীক্ষোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে মহাশয়া ১১ডি, রামধন মিত্র লেনস্থিত ভবনে আগমনপূর্বক উৎসব সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিবেন।

বিনীত

সু. ভ.

বিঃ দ্রঃ লৌকিকতার পরিবর্তে তিরস্কার প্রার্থনীয়।

বাস্তবিক, সুকান্তর স্বভাবটাই ছিল এমন পরিহাসপ্রিয়। সবসময় সে ছোটখাট বা গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনার মাঝেও গুরুগম্ভীর আবহাওয়াকে হালকা করে তুলত লঘু, চপল রসিকতায়। এত গুরুগম্ভীর যার কবিতার বিষয়বস্তু, বক্তব্যের দৃঢ়তায় অভিব্যক্তি, ব্যক্তিগত জীবনে সে কিন্তু একজন পরিহাসপ্রিয় আমুদে মানুষ। চুপচাপ গাম্ভীর্যময় পরিবেশে তাকে কখনই দেখা যায় নি। তাকে ঘিরে একটা সরস পরিবেশ সর্বদাই যেন বিরাজ করত। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো লঘু পরিহাসের তালে তাল দিয়ে যেন নেচে উঠত, তাই তাকে আমরা হাস্যপরিহাস, মজাদার গল্প ও কথা, টিকা-টিপ্পনী এই সব নিয়ে মেতে থাকতে দেখেছি। শুধুমাত্র লেখার ক্ষণটিতে তার যেন চোখমুখের চেহারা বদলে যেত ক্ষণিকের জন্যে। সেই নবনব সৃষ্টির মুহূর্তগুলিতে সে যেন অন্য এক মানুষ।

মেজবৌদি রীণা ভট্টাচার্যের স্বভাব ছিল ভারী মিষ্টি, মধুর চরিত্রের। সারাদিন সংসারের কাজে খুবই পরিশ্রম করতে দেখা যেত তাঁকে। কিন্তু চোখে-মুখে কখনও কোন ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যেত না। ভারি হাসিখুশী ভরা এই মানুষটি ; সবসময় তাঁকে সদা হাস্যময়ীরূপে দেখা যেত। সদাই মনে হত তাঁর কথায় যেন খুশী উপচে পড়ছে। না হেসে তিনি কথা বলতে পারতেন না। মুখে মৃদু হাসি লেগে থাকত তাঁর হাজার কাজের মাঝেও। কোথা থেকে যে তিনি পেয়েছিলেন এমন অফুরন্ত খুশীর জোগান। কাজকর্মের বাড়ীতে মেজবৌদি এসে না পৌঁছান পর্যন্ত যেন উৎসব-বাড়ীর আবহাওয়াটা কিছুটা ম্রিয়মান এবং বিশৃঙ্খল। কিন্তু তিনি এলেই এ ভাবটা যেত বদলে। গুরুজনরা নিশ্চিন্ত হতেন। কারণ সবদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি করতে পারবেন যথাযথ বিলি-ব্যবস্থা। তেমনই ছোটরা এবং তাঁর সমবয়সীরা খুশী, কারণ তাঁকে ঘিরে শুরু হবে সরস, লঘু আবহাওয়া, খুশীর আমেজ, তাই মজা হবে খুব। ছোট-বড় সবার সঙ্গে সমানভাবে সহজ করে মেশবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি সবার প্রিয়, সবার আপনজন। প্রাণ দিয়ে অক্লান্তভাবে তিনি অসুস্থ মানুষকে সেবা করতে পারতেন। জীবনে তাঁর না ছিল লোভ না ছিল হিংসা, দ্বেষ। পারিবারিক মনোমালিন্যে কখনও তাঁকে জড়িত হতে দেখি নি। তাঁর কাছে সবাই সমান। একান্নবর্তী পরিবারের তিনি আদর্শ গৃহিনী।

এমন একটি চমৎকার মানুষের প্রতি সুকান্ত আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক। সে মাতৃহীন, এবং কিছুট ভাবপ্রবণ। তাই সুকান্ত যেমন মনপ্রাণ দিয়ে মেজবৌদিকে কাছের মানুষ বিবেচনায় ভাল বেসেছিল, মনের দুয়ার খুলে দিয়েছিল তাঁর কাছে, তিনিও তেমনই পরম আদরে স্নেহে আর একান্ত অনুরাগে সুকান্তকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। এই মেজবৌদি ছিলেন সুকান্তের একদিকে গুরুজন, অপরদিকে মনের মত বন্ধু ও প্রিয়জন। সুকান্তকে তিনি যেমন সস্নেহে প্রশ্রয় দিতেন, তেমনই প্রয়োজনবোধে তিরস্কার করতেন। তাই সুকান্ত মনে মনে মেজবৌদির তিরস্কারকে ভয় পেত। যেহেতু ঐ তিরস্কার বা শাসনের সঙ্গে অনুরাগ মিশ্রিত থাকত, তাই সুকান্তকে এই শাসনের মূল্য দিতে হত।

মেজবৌদির সঙ্গে সবারই খুব সদ্ভাব ছিল, একথা বলেছি। তাই বাইরে কেউ কোথাও গেলেই, আর কাউকে না হ'ক অন্ততঃ মেজবৌদিকে চিঠি একটা লিখত প্রথমেই। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেটা ১৯৪৫ সালের কথা। আমি অফিসের কাজে গৌহাটি গেছি এবং যথানিয়মে অন্যান্যদের সঙ্গে মেজবৌদি আর সুকান্তকে চিঠি লিখে চলেছি নিয়মিত। বেশ বড়-সড় একটা চিঠি লিখেছিলাম সুকান্তকে গৌহাটি থেকে। কামাখ্যা পাহাড়, তার রমণীয় পরিবেশ, সেখানকার বসবাসকারী মানুষ আর মন্দিরের কথায় আর ব্রহ্মপুত্র নদীর বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরে লিখেছিলাম সে চিঠি। পুরোপুরি একটা ছোটখাট ভ্রমণ কাহিনী। চিঠির শেষপ্রান্তে এসে শুধু লিখেছিলাম ব্যক্তিগত কথাবার্তা। মেজবৌদিকে আবার আলাদাভাবে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি না করে সেই চিঠিখানারই একখানা কার্বন-কপি পাঠিয়েছিলাম। আগের চিঠির মতই এ চিঠির শেষে মেজবৌদির কাছে লিখেছিলাম ব্যক্তিগত কথাবার্তাগুলো। মেজ-বৌদিকে লেখা চিঠিতে ব্যক্তিগত কথাগুলো কার্বন-কপিতে লিখেছিলাম চিঠির কালিতে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য, যেন নীল পেন্সিলে লেখা একখানা বড়-সড় চিঠি। কার্বন-কপি সম্বন্ধে মেজবৌদি বিশেষ মাথা ঘামাবেন না, এই ছিল ভরসা। সুকান্তকে অবশ্য আগাগোড়া পাঠিয়েছিলাম কপিং-পেন্সিলে লেখা পাতাগুলো। দু'টো চিঠির মূল বিষয়বস্তু ছিল এক শুধু শেষ পাতা দুটি ছাড়া। আসলে একই বিষয়বস্তুকে আলাদা করে লেখবার কষ্ট বাঁচানই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, এই চিঠি দু'খানা তাকে দিয়েছিলাম কলকাতায় ফেরার দিন কয়েক আগে।

কলকাতায় ফিরে মেজবৌদির সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমার শেষ চিঠিখানার খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন যে, সুকান্তকে ওই চিঠিখানা পড়তে দিয়েছেন। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। কী সর্বনাশ? সুকান্ত কি আমাকে সহজে ক্ষমা করবে? সে এ ধরনের ফাঁকিবাজী পছন্দ করে না। তার মতে চিঠি হল ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রকাশ এবং চিঠিগুলি পরস্পরের একান্তই আপন সম্পদ। তাই এগুলি কেবল লেখক এবং গ্রাহকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা ॥

এ এক বিচিত্র অভ্যাস সন্দেহ নেই। জানি না, পৃথিবীর আর কোন কবির এমন অদ্ভুত অভ্যাস ছিল কিনা। নবেদা এই কবিতাগুলোর নাম দিয়েছে দেয়ালিকা এবং এই নামেই এর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সুকান্ত-সমগ্র গ্রন্থে। এই কবিতাগুলির আদি কবিতাটি সম্ভবতঃ দু-লাইন "কালিরতন, চাঁদবদন"। এই দেয়ালিকার দেখা পাওয়া গেছে আমাদের বাড়ী, পিসীমার বাড়ী আর সুকান্তর নিজের বাড়ীর দেয়ালে। যাদের চোখে পড়েছে তারা এগুলো তাদের স্মৃতিতে স্থান দিয়েছে, তাই কিছু পাওয়া গেছে আর তা তুলে ধরা হয়েছে বাঙ্‌লা দেশের পাঠক সমাজের কাছে। প্রকৃতি যেমন সুন্দর সুন্দর ফুলের সৃষ্টি করে, অথবা পথপাশে ফুটে ওঠে যে-সব বনফুল তা যেন শুধু প্রকৃতির খেয়ালের খেলা। কবিও তেমনই সৃষ্টি করে চলেছিল এই দেয়ালিকা আপন সৃষ্টির আনন্দে; সে এ নিয়ে পরবর্তীকালে আর মাথাও ঘামায় নি। তাই আমার অনুমান যতটুকু পাওয়া গেছে, উদ্ধার করা গেছে দেয়ালিকার, তার অনেক বেশী গেছে হারিয়ে। এইগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল নবেদার। তাই যখন যেখানে কবির সৃষ্ট দেয়ালিকা তার চোখে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে তার মনের গভীরে, কিন্তু অনেক লেখাই হয়ত লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বা ভুলে গেছে।

এই লেখাগুলি সম্বন্ধে সুকান্তর মনোভাব কিন্তু অদ্ভুত। এই কবিতাগুলো যা আমাদের চোখে পড়েছে তা ওর সামনে আবৃত্তি করলেও তার ভাবের কোন পরিবর্তন হত না বা সে এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেখাত না—কেন জানি না। তবে যতদিন তার খেয়াল বজায় ছিল, সে এগুলো লিখে চলেছিলো, তারপরে এক সময় হঠাৎ এ লেখা সে বন্ধ করে দিল। ১৩৪১ সাল থেকে শুরু করে সম্ভবতঃ ১৩৪৫ সালের মধ্যেই লেখাগুলো শুরু এবং শেষ।

আমাদের বাড়ীর দেয়ালে প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম এই কবিতাটি:

হরদম বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই 'রেডি'ও।

এই কবিতাটিই আবার পিসীমার বাড়ীর দেওয়ালে দেখেছি এই ভাবে :

বেজে চলে রেডিও

সর্বদা গোলমাল করতেই

'রেডি' ও।

আরেকটি কবিতা আমাদের বাড়ীর দেয়ালে লেখা ছিল :

দিদি

আজ তোমারে কি দি ?

'দেয়ালিকার' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে নীচের কবিতাটি দেখলাম না।

বিশ্বের হাস্যের মূর্তি

তুমি মোনালিসা

অফুরন্ত বঞ্চিতের তৃষা।

এই পঙ্‌ক্তি কটি সত্যই অনবদ্য এবং সুন্দর ইঙ্গিতপূর্ণ ; ভাবরসে সমৃদ্ধ।
নীচের উদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে কবির ইঙ্গিতবর্ণের সন্ধান পাওয়া যায়।

হে রাজকন্যে

তোমার জন্যে

এ জনারণ্যে

নেইকো ঠাঁই—

জানাই তাই ॥

মনে হয় দেয়ালিকা কবিতাগুলির মধ্যে নীচের কবিতাটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
এই রচনার মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় :

আঁধিয়ারে বাঁদ নায় সলতে :

'চাইনে চাইনে আমি জ্বলতে ॥'

খুব ছোটবেলা থেকেই কিন্তু সুকান্তর গদ্য-লেখার অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন
হাতে-লেখা পত্রিকায়, তার লেখা অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'শিখা'
নামে ছোটদের পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
তাঁরই উৎসাহে ঐ পত্রিকাতে বালক বয়সে কবির কিছু গল্প এবং পরে কবিতা
এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সুকান্তের গদ্য-লেখার ভঙ্গীটিও ছিল স্বতন্ত্র
এবং সুললিত ভাষায় সমৃদ্ধ। অবশ্য বাংলা ভাষা যার দখলে তার গদ্য লেখা

সুকান্ত মেজবৌদিকে আর একখানা চিঠি লিখেছিল কবিতায়। এ চিঠিখানিও পাওয়া যায় নি, মেজদা তাঁর স্মৃতি থেকে যতটুকু উদ্ধার করতে পেরেছেন—তা তুলে ধরা যাক।

কাশী গিয়ে হু হু ক'রে কাটলো কয়েক মাস তো,
কেমন আছে মেজাজ ও মন, কেমন আছে স্বাস্থ্য ?
বেজায় রকম ঠাণ্ডা সবাই করছে তো বরদাস্ত ?
খাচ্ছে সবাই সস্তা জিনিস, খাচ্ছে পাঁঠা আস্ত ?
সেলাই কলের কথাটুকু মেজদার দু'কান
স্পর্শ ক'রে গেছে বলেই আমার অনুমান।
ব্যবস্থাটা হবেই, করি অভয় বর দান।
আশা করি, শুনে হবে উল্লসিত প্রাণ।
এতটা কাল ঠাকুর ও ঝি লোভ সামলে আসতো,
এবার বুঝি লোভের দায়ে হয় তারা বরখাস্ত
চারুটাও হয়ে গেছে বেজায় বেয়াড়া,
মাথার ওপরে ঝোলে যা খুশীর খাঁড়া।
নতেদা'র বেড়ে গেছে অঙ্গুলি হাড়া,
ঘেলুর পরীক্ষাও হয়ে গেছে সারা ;
এবার খরচ ক'রে কিছু রেল-ভাড়া
মাতিয়ে তুলতে বলি রামধন পাড়া।
এবার বোধহয় ছাড়তে হল কাশী,
ছাড়তে হল শৈলরাম, ইন্দু ও ন'মাসী।
দুঃখ কিসের, কেউ কি সেথায় থাকে বারোমাসই ?
কাশী থাকতে চাইবে তারা, যারা স্বর্গবাসী।
আমি কিন্তু কলকাতাতেই থাকতে ভালবাসি।
আমার যুক্তি শুনতে গিয়ে পাচ্ছে কি খুব হাসি ?
লেখা বন্ধ হোক তাহলে, এবার আমি আসি॥

কিছু পরিচয়লিপি দেওয়া যেতে পারে। সেলাইকল সম্বন্ধে মেজদার কাছে মেজবৌদির কোন বক্তব্য সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। চারু

হল এ বাড়ীর ঝি এবং সে কিছুটা স্বাধীন-প্রকৃতির। তাই খুশীমত কাজ করার সুযোগ তার ঘটেছে মেজবৌদির অনুপস্থিতির জন্য। রামধন পাড়া অর্থে এখানে ১১ডি রামধন মিত্র লেনের বাড়ী।

যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে শেষ কটা দিন সুকান্ত মেজবৌদির কাছে শুশ্রূষাধীন ছিল। এবাড়ী থেকে তাকে যাদবপুরে স্থানান্তরিত করার সময় মেজবৌদির চোখে আমি জল দেখেছিলাম। তার সেই হাসিমাখা মুখে নেমেছিল বিষাদের ছায়া। এবাড়ী থেকে চলে যাওয়ার আগে আলমারীতে লুকিয়ে একটা মোড়ক রেখেগিয়েছিল সুকান্ত সেটা আর কিছু নয়, তারাশংকরের 'ধাত্রীদেবতা', মেজবৌদিকে সুকান্তর সকৃতজ্ঞ উপহার। তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচবশে সুকান্ত এ উপহার মেজ-বৌদিকে নিজ হাতে দিতে পারে নি।

আমাদের সকলের প্রিয় এই মেজবৌদি গত ১৯৬৭ সালে হঠাৎ কেরোসিনের আগুন কাপড়ে লেগে ভীষণভাবে আহত হন। আগুন তাঁর যতটা না ক্ষতি করুক, কেরোসিনের গ্যাস তাঁর ক্ষতি করেছিল বহুগুণ বেশী। তাই তিনি অকালে চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে। এই মৃত্যুতে ছোট-বড় সবার চোখের জল বাধা মানে নি। সবাই হয়ত মনে মনে ভেবেছে, যিনি আজীবন সবাইকে পরম নিষ্ঠায় ভালবেসেছেন, মাতিয়ে রেখেছেন নিজের সুমধুর ব্যবহারে, তিনি কেন বিদায় নিলেন এমন অসাধারণভাবে আর তাঁর মৃত্যু তাঁর পক্ষে শারীরিক কষ্টের এত কারণ হল কেন—এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

২৩

সুকান্তর একটি বিচিত্র স্বভাব ছিল এই যে, সে মাঝে মাঝে দেওয়ালের গায়ে পেন্সিলে দু'চার পংক্তি সুন্দর ছন্দোময় কবিতা লিখে রাখত। তার নিজের কথায় বলি:

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা।

সাজগোজ করে বাইরে পাঠান। সুকান্তর রচনার ক্ষেত্রে এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম বরাবরই দেখা যেত। তার হাত দিয়ে যে কবিতা বেরিয়ে এসেছে তার কোন পরিবর্তন সে করত না। জনতার কবি জনতার মাঝে তার কবিতাগুলিকে সাজসজ্জায় ভূষিত না করেই প্রকাশ করত। সম্ভবত এই কারণেই তার কবিতাগুলি এত জীবন্ত প্রাণময় এবং বলিষ্ঠ। এখানে কৃত্রিমতার ছিল একান্ত অভাব। তাই কবির কবিতাগুলি স্বচ্ছ সুন্দর সজীব স্বতস্ফূর্ত আর তেজোদীপ্ত।

২৪

গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে সুকান্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অল্পই কারণ কলকাতা শহরেই তার জন্ম এবং এখানেই তার জীবন কেটেছে। তার জীবন ছিল রূঢ় গদ্যময় এবং তার পরিবেশ ছিল নীরস ও একান্তই বৈচিত্র্যহীন। তবু তারই মধ্যে কবি অন্বেষণ করে ফিরত আনন্দময় বৈচিত্র্যের। রসিকের মত টেনে বার করত রসধারা। কিন্তু শহরের মানুষ সুকান্তকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকর্ষণ করত খুবই নিবিড় ভাবে। গাছপালা পুকুর বাগান পাহাড় নদী এসব যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত অহর্নিশি। কিন্তু কলকাতার মত শহরে, শহরের ক্রমবর্ধমান বাহুবিস্তারে গাছপালা পুকুর বাগান সবই কমে আসছে বছরের পর বছর। সবুজ সজীব গাছপালা শহরের ক্ষুধার গ্রাস। বেলেঘাটায় পিসিমার বাড়ীর পেছনে ছিল ন্যাশনাল নার্শারীর সুন্দর বাগান। এই বাগানে ছিল নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ আর অনেক ফলবান বৃক্ষ। ঠিক মাঝে ছিল একটা সুন্দর গভীর পুষ্করিণী। সুকান্তর কাছে এই বাগান ছিল এক আনন্দদায়ক লোভনীয় সম্পদ। কত নির্জন দুপুরে অথবা জ্যোৎস্নাময় রজনীতে এখানে একলা বসে সে সময় কাটিয়ে দিত। এখানে আমি ওর সঙ্গে বেড়িয়েছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি—সে সব স্মৃতি আজও আমায় আনমনা করে তোলে। শহর বেড়ে যাবার তাগিদে এ বাগান আর পুষ্করিণী বিদায় নিয়েছে। যে বাগান সুকান্তর স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে ছিল সেখানে আজ তৈরি হয়েছে বাড়ী।

বাইরে বেরিয়ে পড়ার একটা আদম্য আগ্রহ ছিল কবির। একটা অনিশ্চিত জীবন যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত প্রতিনিয়ত। একবার সে প্রস্তাব করল যে, সে আমি আর খোকন এই তিনজনে মিলে জি, টি, রোড ধরে চলতে শুরু করব এবং তা হবে আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য আমাদের থাকবে না। শুধুই পথ চলা। সেই বাসনায় সুকান্ত আর খোকন স্থির করল নিয়মিত পয়সা জমাতে হবে। আমাকেও এ ব্যাপারে আগ্রহী করার চেষ্টা হল। ওদের ইচ্ছা মোটামুটি কিছুটা অর্থ জমলেই বেরিয়ে পড়ব এই অনির্দিষ্ট পদযাত্রায়। এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ না থাকায় ওরা বিরক্ত হল এবং সুকান্ত করল তিরস্কার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই নিরুদ্দেশ যাত্রা সার হয়ে ওঠেনি।

বাঙলা দেশের গ্রাম সুকান্তকে আমন্ত্রণ করেছে, আকর্ষণ করেছে। কিন্তু গ্রাম বাঙলা দেখার বিশেষ সুযোগ কবির জীবনে ঘটে নি। তাই গ্রাম্য জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার হয় নি।

তবে কলকাতার বাইরে সে গেছে বেশ কয়েকবার। প্রথম যখন সে তার দাদামশাই এবং মামাবাড়ীর অন্যান্যদের সঙ্গে কাশীতে গেছলো তখন সেজমাসীমা জীবিত এবং এসময় সুকান্ত নিতান্তই শিশু। এর পরে পিসিমার বাড়ীর সকলের সঙ্গে সুকান্ত যশিডি বেড়াতে গেছলো। এ সময় রমাও গেছলো এই সঙ্গে, কারণ আগেই বলেছি যে আমার জেঠিমার অকাল মৃত্যুতে রমা পিসিমার বাড়ীতে থাকত। এ যশিডি ভ্রমণ ঘটেছিল সম্ভবত ১৯৩৫/৩৬ সালে। পিসিমার বাড়ীতে এ্যালবামে একখানা ফটো দেখেছিলাম ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় দুটি শিশু, সুকান্ত আর রমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিটি যশিডিতে তোলা।

আমার সেজমাসীমা যখন প্রথম বার মধুপুরে গেছলেন ১৯৩৮ সালে তখন সুকান্ত তার অন্যান্য ভায়েদের সঙ্গে সেখানে গেছলো।

বড় হয়ে আর একবার কাশী গেছলো মেজবৌদির সঙ্গে। সেটা সম্ভবত ১৯৪৪ সালে। তার মন ছিল সংস্কারমুক্ত, উদার এবং জনদরদী। তাই ধর্মের লেবেল আঁটা যে কোন বস্তুর ওপর তার ছিল একান্ত বিরাগ। কিন্তু ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি তাকে আকৃষ্ট করেছে বারবার।

সুন্দর হবে, এটাই স্বাভাবিক। তার ব্যবহৃত উপমাগুলিও খুব সুন্দর। এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তার অনেক কিছু ভুলে গেছি। তবু দু-একটি কেন জানি না—আমার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

প্রথম যে উপমাটির কথা মনে পড়ে সেটি চমকসৃষ্টিকারী গভীর ভাবরসে সমৃদ্ধ। সুকান্তর লেখা একটি গল্পে নিচের উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। 'তারায় ভরা আকাশ যেন পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' আর একটি বৈচিত্র্যময় উপমার ব্যবহার দেখেছিলাম তার লেখা আর একটি গল্পে "আমি তাকে পেতে চাই মৃত্যুর মত করে, যে একেবারে নিশ্চিত ভাবে যার পরে আর কিছু নেই।" সুকান্ত, খোকন, আমি আর অরুণ এই চারজনে মিলে একটা বারো য়ারী উপন্যাস লিখছিলাম—এই উপন্যাসের মধ্যে সুকান্ত একটি শব্দ ব্যবহার করেছিল, যা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল বিরাট আগ্রহ। শব্দটি হচ্ছে: খলনায়ক নায়িকার সঙ্গে কথা বলবার সময়—"চোখে ইন্দ্রধনুর বিদ্যুৎ হেনে বিজয় বলল : ... ।"

সুকান্তর গদ্য-রচনা যে কত সুন্দর তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে আমাকে লেখা একটি চিঠি থেকে।

"একটা চিঠি লিখছি। অত্যন্ত অনিচ্ছায় কিংবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে না হলেও খুব মন দিয়ে লিখছি না। একটা সুযোগের প্রলোভনে চিঠি লিখতে বাধ্য হলুম; কেন জানি না তোমাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে তাকে দমন করতে পারি না। তবুও লিখে তৃপ্তি পাই না। আবার লেখার তৃষ্ণা বেড়ে যায়। এই যে চিঠি লিখলাম! আবার একটু পরে হয়তো লিখতে হবে দেখতে ইচ্ছা করবে। আগুনের মধ্যে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপ দিতে চায়... চঞ্চল মনের অঞ্চল হয়তো বসন্তের বাতাসে একটু দুলতে চাইবে, তাতে মাদকতা হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু শীর্ণ শাখায় সে দোলা সুখের দিনগুলিকে ঝরিয়ে দেবে। আজকাল মাঝে মাঝে অব্যক্ত স্পৃহা সরীসৃপের মত সমস্ত গা বেয়ে সুস্থ মনকে আক্রান্ত করতে চায়। আমি এ সমস্ত সহ্য করতে পারি না। আমার চারিদিকের বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকেই দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর বিশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে। আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার

নির্বাসন। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই ; দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে, তোমাদের কাছে শেখা মাবণ-মন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা আমি পারব না ;—আমার ধ্বংস—অনিবার্য। আজ বুঝেছি কেন এত লোক দুঃখ পায়, সঠিক পথে চলতে পারে না। আলেয়া-যৌবন তার দিক্‌-ভ্রান্তি ঘটায়। হঠাৎ স্বপ্নাকাশে বাস্তবের মেঘগুলো জড়ো হয়ে দাঁড়ায় ভিড় করে, হাতে থাকে বুভুক্ষার [illegible]-খড্গ আর অক্ষমতার হাঁড়ি কাঠে [illegible] মাথা কাটা পড়ে। এই তো জীবন। প্রথম যৌবনের অলস অসতর্ক মুহূর্তে আমরাই আমাদের শ্মশানের চিতা সাজাই হাস্যমুখর দিনের পরিবেশনে। অশিক্ষিত আমাদের দেশে যৌবনে দুর্ভিক্ষ আসবেই। আর তারই বহ্নিময় ক্ষুধা আমাদের মনকে তিক্ত, অতৃপ্ত, বিকৃত করে তোলে। জীবনে আসে অনিত্যতা, [illegible]নাশক্তি যায় ফুরিয়ে, কাজে আসে অবহেলা, ফাঁকি আমরা তখনই দিতে [illegible]খ আর তখনই আসে জীবনকে ছেড়ে চুপি চুপি সরে পড়বার দুরন্ত দুরভিসন্ধি।

আমার ক্রমশ [illegible] যাত্রার প্রাক্‌ দুই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে এই ধূলিধূসরিত কুয়াশাচ্ছন্ন পথেই অবসাদের শূন্যতা জানিয়ে দেয় [illegible] অনেক কিন্তু পেট্রোল নেই। তোমরা দিতে পার এই পেট্রোলের সন্ধান? বহুদিন অব্যবহৃত স্টীয়ারিংএ মরচে পড়ে গেছে সে আর নড়তে চায় না, ঠিক পথে চালায় না—আমাকে। তোমরা মুছিয়ে দিতে পার সেই মলিনতা, ঘুচিয়ে নিতে পার তার অক্ষমতা ?......"

(সুকান্ত সমগ্র ঃ পত্রগুচ্ছ)

সুকান্তর লেখার আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ঝর্ণাধারার মত তার কলম দিয়ে লেখা বেরিয়ে আসত স্বচ্ছন্দ গতিতে। তাই তার লেখায় কাটাকাটির কোন অভ্যাস ছিল না। অনেকের লেখার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাদের লেখার প্রথম রচনার পর মুহূর্তেই কাটাকাটি করে নতুন নতুন পছন্দসই শব্দ যোজনা করতে। এতে মূল রচনার প্রকৃতি ও বক্তব্য বিষয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। এ যেন ঘরের কবিতাকে পোশাক পরিয়ে

যে তার বাড়ীতে গেলে সে আমাদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ত এবং আমাদের নিয়ে যেত বেলেঘাটা অঞ্চলের না দেখা জা গাগুলোতে বা বেলেঘাটার না-হাঁটা পথে। খোকনের মুখে শুনেছি একটা মজার ঘটনা। ২০ নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের যে বাড়ীটাতে শেষ জীবনটা সুকান্ত কাটিয়ে গেছে সে বাড়ীর গা ঘেঁষে যে রেলপথ চলে গেছে উত্তর-দক্ষিণে সেই রেলপথ ধরে এগিয়ে চলার একটা দুরন্ত নেশা ওকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসত। একদিন খোকন আসতেই তাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল এবং হাঁটতে সুরু করল এই রেলপথ ধরে উত্তর দিকে। মূল জমি থেকে এই রেলপথ অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। এখন এ পথের পূর্ব দিকে নতুন কলকাতার পত্তন হয়েছে তাই সেই আগেকার রূপ গেছে হারিয়ে। এই পথ ধরে সুকান্ত আর খোকন হেঁটে চলেছিল দিনের শেষ প্রান্তে মাইলের পর মাইল। চলার পথে সঙ্গী হিসেবে যেমন পাচ্ছিল আরও কয়েকজন পথচারীকে তেমনি সেই সঙ্গে ওদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল বিরাট দৈত্যাকার পূর্ব ন কয়লার ইন জিনগুলো বিকট গর্জন করতে করতে পেছনে টানে ব সার্ভিস এর রেলগাড়ির বগিগুলো। এসব দিকে অবশ্য ওদের হুঁশ ছিল না, ওরা আপন মনে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলছিল। চারিদিকের দৃশ্য সুন্দর, দিগন্তের গায়ে ছবির মত আঁকা আছে গাছপালা, শান্ত পরিবেশ। এই রেলসড়কের তলা দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তা চলে গেছে। আর গেছে কেষ্টপুরের খাল। ওপর থেকে দেখতে মন্দ লাগে নি। এ দৃশ্যগুলি বৈচিত্র্যময় সন্দেহ নেই; কবি কতকটা আপন খেয়ালে এগিয়ে চলেছে নিজের মনে আর খোকন চলেছে কবির দুরন্ত আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে। হঠাৎ খোকনের নজরে পড়ল একটি মাঝারি আকারের বহুবর্ণ রঞ্জিত সাপ রেল লাইনের ওপরে চুপটি করে শুয়ে রয়েছে। এবং ওরা আসতেই সেটা নড়ে চড়ে উঠল। খোকন সুকান্তর একটা হাত ঝপ করে ধরে নিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়ে বলে উঠলো "সাপ! সাপ!" তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। পাখীরা পরম কোলাহলে চলেছে কুলায়। আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এই সমস্ত পরিবেশের মধ্যে সাপের উপস্থিতি নেহাৎই বেমানান। খোকন মুহূর্তেই ছুট্ লাগায়

ফিরতি পথে, মুখে তার তখন ধ্বনি "সাপ! সাপ! চল পালাই।" ভাল করে অবস্থাটা উপলব্ধি করার আগেই খোকন সুকান্তর একটা হাত ধরে টান্‌তে টান্‌তে ফিরে চলে। সুকান্ত তখনও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সাপটার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে।

বর্গীর অত্যাচার থেকে কলকাতাকে রক্ষা করবার জন্যে নবাব আলিবর্দী খাঁ এই শহরকে ঘিরে খাল কাটিয়েছিলেন। সম্ভবত মারাঠা ডিচ লেন নামে খাল ধার দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে তা এই স্মৃতি বহন করছে। উল্টাডাঙ্গা থেকে এই খাল একটা চলে গেছে বেলেঘাটার আর অপরটি কেষ্টপুরের পথে। বেলেঘাটা মেন রোডের শেষ হয়েছিল খাল প্রান্তে এসে। এই খালে তখন বড় বড় নৌকো আসত মাল বোঝাই করে, কখনও খড়, চালের বস্তা, অথবা মাটির তৈরী কুঁজো কলসী প্রভৃতি নিয়ে। এখানে সুকান্ত প্রায়ই আসত, কিসের আকর্ষণে তা অবশ্য বলতে পারব না। তবে ওর সঙ্গে সঙ্গী হিসেবে গেছি আমি, খোকন এবং অরুণাচল বেশ কয়েকবার। অনেক সময় আমরা নৌকোর ওপরেও উঠে বসেছি এবং সুকান্তকে দেখেছি নৌকোর মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে আলাপ করতে। এই খাল পথে আগে মোটর লন্‌চ চলত এবং দেশবন্ধু পার্কের পিছন দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই লন্‌চ চলার দৃশ্য সুকান্ত, খোকন আর আমি প্রত্যক্ষ করতাম গভীর কৌতূহলে।

বাগবাজারের গঙ্গার ঘাট ছিল আমাদের বেড়াবার আর একটা জায়গা। গঙ্গার ধারের পথ ধরে আমরা কখনও উত্তর দিকে আবার কখনও বা দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলতাম সুকান্তর সঙ্গী হিসেবে। গঙ্গার পারে ছিল অনেকগুলো পাটকল। এখান থেকে পাট গাঁটবন্দী হয়ে গাধাবোটে তোলা হত, আমরা জেটিতে দাঁড়িয়ে তা দেখতাম। গাঁটবন্দী পাট নামিয়ে দেবার জন্য জেটিতে স্লিপ লাগানো থাকত। এই স্লিপের ওপরে কাঠের তক্তায় চড়ার মত দুঃসাহস আমার আর সুকান্তর হয়েছিল দুয়েকবার। নিচে ঘূর্ণায়মান লোহার নলগুলোর সাহায্যে আমরা ঢালুপথে নেমে যেতাম।

জেটির ধারে লেগে থাকা নৌকো বা গাধাবোটগুলোর ওপরে আমরা গিয়ে বসতাম। কোনো স্টীমার গেলে ঢেউয়ের দোলা আমাদের দুলিয়ে

এই সম্বন্ধে সে লিখিছে "… …কাশীর আমি প্রায় সব দ্রষ্টব্যই দেখেছি। ভাল লেগেছে কেবল ইতিহাসখ্যাত চৈত সিংহের যুদ্ধঘটনাজড়িত প্রাসাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, আর রাজা মানসিংহ স্থাপিত 'অবজারভটরি' মানমন্দির। অবিশ্যি বিখ্যাত বেণীমাধবের ধ্বজা থেকে কাশী শহর খুব সুন্দর দেখায়, কিন্তু সেটা বেণীমাধব বা কাশীর গুণ নয়, দূরত্বের গুণ। কাশীর গঙ্গা এবং উপাসনার মত স্তব্ধ তার শ্যামল পরপার, এ দুটোই উপভোগ্য। কাশী শহর হিসেবে খুব বড় সন্দেহ নেই; বিশেষত আজকের দিনে আলো-ঝলমল শহর হিসেবে অর্থাৎ এখানে 'ব্ল্যাক-আউট' নেই। আর পথে পথে এখানে দেখা যায় লোকের ভিড় কলকাতার মতই।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'ছাত্র নিবাস-মূলক' বিশ্ববিদ্যালয়। আর দেখলাম গান্ধীজী পরিকল্পিত ভারতমাতার মন্দির। দুটোতেই ভাল লাগার অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও ধর্মের লেবেল আঁটা বলে বিশেষ ভাল লাগল না। আর সবচেয়ে ভালো লাগল সারনাথ। তার ঐতিহাসিকতায়, তার নির্জনতায়, তার স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তার ইটপাথরে খোদিত কর্মগাথায় সে মহিমাময়।"

(সুকান্ত সমগ্র ঃ পত্রগুচ্ছ)

একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে সুকান্ত কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির সম্বন্ধে এ চিঠিতে সম্পূর্ণ নীরব। যদিও এ মন্দিরের পেছনে রয়েছে কাল পাহাড়ের ইতিহাস। মোগল সম্রাট আওরংজেবের সময় আসল মন্দির ধ্বংস করে গড়ে উঠেছিল এক মসজিদ যা আজও রয়েছে। এসময়ে আসল বিশ্বনাথকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত এক বিরাট ইঁদারায়। বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দির গড়ে উঠেছিল এর পরবর্তী কালে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারছি না তা হল কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার কথা। মালব্য সেতুর ওপর দিয়ে কাশীতে যাওয়া এবং আসার সময় বেণীমাধবের ধ্বজা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই একটি ধ্বজার ওপরে উঠে কাশীর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সুকান্তর হয়েছিল। এই দুটি ধ্বজাই একে একে পড়ে গেছে এবং এর ইতিহাস তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে।

সুকান্ত ছাত্র ফেডারেশানের সম্মেলনে একবার চট্টগ্রাম গেছলো কিন্তু সঙ্গে তার বেশী অর্থ ছিল না। তার স্বভাব সুলভ সংকোচ বশে সে কারুর কাছে তার অর্থের অসুবিধার কথা বলে নি ফলে ফেরবার সময় পড়েছিল অত্যন্ত অসুবিধায়, প্রায় অনাহারে ফিরেছিল কলকাতায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে এই যে, নিজের সংগঠনের জন্য সংগৃহীত টাকা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও খরচ করে নি সে, কারণ তার কাছে এটা দুর্নীতি। আশ্চর্য এই যে টাকাটা কলকাতায় ফিরলে সে পূরণ করতে পারত।

চট্টগ্রাম তার ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল অদূরের সমুদ্র কাছের কর্ণফুলি নদী আর পাহাড়ের সহাবস্থান। কবির কাছে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক নবরূপে দেখা দিয়েছিল, দোলা দিয়েছিল তার কবিমনকে।

চট্টগ্রামের আর একটি বিরাট আকর্ষণ ছিল সুকান্তর কাছে, ভারতের মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান। বীর প্রসবিনী চট্টগ্রাম কবির কাছে আর এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। কবির ভাষায় বলি—

"ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
চট্টগ্রাম : বীর চট্টগ্রাম !"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল রেড এড কিওর হোম থেকে আমাকে একটা চিঠিতে সুকান্ত জানিয়েছিল "... ...আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয়, সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। শিশুর মত সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হত। আমার সঙ্গে তো এঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এই সব বীরদের প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মত হাসি-খুশি, সরল, আমোদপ্রিয়।... ..."

(সুকান্ত সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

তাই এই ভ্রমণ সুকান্তর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই। একদিকে সৌন্দর্য বোধের পরিতৃপ্তি অপর দিকে বীর চট্টগ্রাম দর্শনে স্বাধীনতা প্রিয় কবির অপরিসীম আনন্দ। গ্রাম্যজীবন কেন শহরের পথে পথে ঘুরতেও সুকান্তর আগ্রহের কোন অভাব ছিল না। নতুন নতুন পথে চলা বা নতুন পথ আবিষ্কার করা যেন ওর নেশা ছিল। এর আগেই বলেছি

দিত। গঙ্গার এপারে বসে ওপারের দৃশ্য দেখতাম পরম আগ্রহভরে। এই নির্জন এবং বৈচিত্র্যময় পরিবেশ সুকান্তর পছন্দসই ছিল। অনেক সময় আমরা বেশী রাত পর্যন্ত ওখানে বসে গল্পগুজব করতাম।

ফেরার পথে কাশী মিত্র শ্মশানে একটু উঁকি দিতে চাইতাম আমি এবং দুচার মিনিট দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে হত। কিন্তু এ ব্যাপারটা সুকান্তর একেবারেই পছন্দসই ছিল না। আমি ভেতরে গেলেও ও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত।

সুকান্তর কবি সত্তা, তার বহির্মুখী সদামুক্ত মন সবচেয়ে তৃপ্তি লাভ করেছিল মেজদা-মেজবৌদির সঙ্গে রাঁচিতে বেড়িয়ে। সালটা সম্ভবত ১৯৪৩। রাঁচির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, গোমো জংসন থেকে রাঁচি রোড যাবার পাহাড়ী রেলপথ, বিশেষ করে জোন্‌হা জলপ্রপাত এবং তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কবিকে আকুল করে তুলেছিলো; তাকে দিয়েছিল অফুরন্ত আনন্দ। অরুণকে এই সম্বন্ধে লেখা চিঠিখানি একটি অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি।

"অনেক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অনেক অবিশ্বাস আর অসম্ভবকে অগ্রাহ্য করে শেষে সত্যিই রাঁচি এসে পৌঁছেছি। আসার পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখি নি, কেবল পূর্ণিমার অস্পষ্ট আলোয় স্তব্ধ গম্ভীর বরাকর নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

তখন ছিল গভীর রাত (বোধহয় রাত শেষ হয়েই আসছে) আর সেই রাত্রির গভীরতা প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই মৌন মূক বরাকরের জলে। কেমন যেন ভাষা পেয়েছিল সব কিছুই। সেই জল আর অদূরবর্তী একটা বিরাট গম্ভার পাহাড় আমার চোখে একটা ক্ষণিক স্বপ্ন রচনা করেছিল।

বরাকর নদীর একপাশে বাঙলা, অপর পাশে বিহার আর তার মধ্যে স্বয়ংস্ফূর্ত বরাকর; কী অদ্ভুত, কী গম্ভীর! আর কোনো নদী (বোধহয়, গঙ্গাও না) আমার চোখে এত মোহ বিস্তার করতে পারে নি।

আর ভাল লেগেছিল গোমো স্টেশন। সেখানে ট্রেন বদল করার জন্যে শেষ রাতটা কাটাতে হয়েছিল। পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা সেখানে উপলব্ধি করেছি। স্তব্ধ স্টেশনে সেই রাত আমার কাছে তার এক অস্ফুট সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে রইল চিরকাল।

তারপর সকাল হলো। অপরিচিত সকাল। ছোট ছোট পাহাড়, ছোট ছোট বিশুষ্কপ্রায় নদী আর পাথরের কুচি-ছিটানো লালপথ, আশে পাশে নাম-না-জানা গাছপালা ইত্যাদি দেখতে দেখতে ট্রেনের পথ ফুরিয়ে গেল।

তারপর রাঁচি রোড ধরে বাস-এ করে এগোতে লাগলুম। বাসের কী শিংভাঙা গোঁ। সে বিপুল বেগে ধাবমান হলো পাহাড়ী পথ ধরে। হাজার হাজার ফুট উঁচু দিয়ে চলতে চলতে আবেগে উছলে উঠেছি আর ভেবেছি এ-দৃশ্য কেবল আমিই দেখলুম; এই বেগ আর আবেগ কেবল আমাকেই প্রমত্ত করলো! হয়তো অনেকেই দেখেছে এই দৃশ্য, কিন্তু তা এমন করে অভিভূত করেছে কাকে?

রাঁচি এসে পৌঁছলাম। আমরা যেখানে থাকি, সেটা রাঁচি নয়, রাঁচি থেকে একটু দূরে—এই জায়গার নাম 'ডুরাণ্ডা'। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী। আর তারই কূলে দেখা যায় একটা গোরস্থান। যেটাকে দেখতে দেখতে আমি মাঝে মাঝে আত্মহারা হয়ে পড়ি। সেই গোরস্থানে একটা বটগাছ আছে, সেটা শুধু আমার নয় এখানকার সকলেরই প্রিয়। সেই বটগাছের ওপরে এবং তলায় আমার কয়েকটি বিশিষ্ট দুপুর কেটেছে।

গত শুক্রবার সকাল থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ আমাদের অনির্বচনীয় আনন্দে কেটেছে—কারণ, এই সময়টা আমরা দলে ভারী ছিলাম। রবিবার দুপুরে আমরা রাঁচি থেকে ২৮ মাইল দূরে জোন্‌হা প্রপাত দেখতে বেরুলাম। ট্রেনে চাপার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টি নামলো এবং ট্রেনে বৃষ্টির আনন্দ আমার এই প্রথম। দু'ধারে পাহাড় বন ঝাপসা করে, অনেক জলধারার সৃষ্টি করে বৃষ্টি আমাদের রোমাঞ্চিত করল।

কিন্তু আরো আনন্দ বাকী ছিল—প্রতীক্ষা করে ছিল আমাদের জন্যে জোন্‌হা পাহাড়ের অভ্যন্তরে। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক পথ হাঁটার পর সেই পাহাড়ের শিখরদেশে এক বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির-রক্ষক এসে আমাদের দরজা খুলে দিলো। মন্দিরের সৌম্য গাম্ভীর্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম নিঃশব্দে, ধীর পদবিক্ষেপে। মন্দির সংলগ্ন কয়েকটি লোহার দুয়ার এবং গবাক্ষবিশিষ্ট কক্ষ ছিলো। সেগুলি আমরা

ঘুরে ফিরে দেখলাম, ফুল তুললাম, মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করলাম। সেই ধ্বনি পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছল না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেই অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে বাঘের ভয় অত্যন্ত বেশী। আমরা তাই মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর গেলাম অদূরবর্তী প্রপাত দেখতে। গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। এতো দিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিলো। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না লিখে পারলো না। সে কবিতা আমার কাছে আছে, ফিরে গিয়ে দেখাব। জোন্‌হা যে দেখেছে, তার ছোটনাগপুর আসা সার্থক। যদিও হুড্রু খুব বিখ্যাত প্রপাত, কিন্তু হুড্রুতে প্রপাত দর্শনের এবং উপভোগের এতো সুবিধা নেই, একথা জোর করেই বলবো। এবং জোন্‌হা যে দেখেছে সে আমার কথায় অবিশ্বাস করবে না। জোন্‌হা সব সময়েই এতো সুন্দর, এতো উপভোগ্য, তা নয়, এমন কী আমরা যদি তার আগের দিনও পৌঁছতাম তা হলেও এ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম নিশ্চিত।

প্রপাত দেখার পর সন্ধ্যার সময় আমরা বুদ্ধদেবের বন্দনা করলাম। তারপর গল্পগুজব করে, সবশেষে নৈশ-ভোজন শেষ করে আমরা সেই স্তব্ধ নিবিড় গহন অরণ্যময় পাহাড়ে জোন্‌হার দূর-নিঃসৃত কলধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জোন্‌হা সারারাত বিপুল বেগে তার গৈরিক জলধারা নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগলো কঠিন পাথরের ওপর, আঘাত জর্জর জলধারার বুকে জেগে রইলো রক্তের লাল আর রুদ্ধঘায়ে শোনা যেতে লাগলো আমাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাস। প্রহরীর মতো জেগে রইল ধ্যানমগ্ন পাহাড় তার অকৃপণ বাৎসল্য নিয়ে, আর আমাদের সমস্ত ভাবনা ঢেলে দিলাম সেই বিরাটের পায়ে।

পরদিন আর একবার দেখলাম রহস্যময়ী জোন্‌হাকে। তার সেই উচ্ছল রূপের প্রতি জানালাম আমার গভীরতম ভালবাসা। তারপর ধীরে ধীরে চলে এলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আসবার সময় যে বেদনা জেগেছিল, বিদায়ের জন্যে তা আর ঘুচলো না। সেইদিনই দুপুরে আমাদের দলের

অর্ধেককে বিদায় দিয়ে সেই বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হল। জোন্‌হার ফিরতি পথে, ফেরার সময় মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, আমাদের এই যাত্রা যেন অনন্ত হয়। কিন্তু পথও ফুরলো, আর আমরাও জোন্‌হাকে ফেলে, সেই আশ্রয়দাতা বুদ্ধমন্দিরকে ফেলে রাঁচি চলে এলাম। এ থেকে বুঝলাম, কোন কিছুর আসাটাই স্বপ্ন আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব। খুব কম জিনিসই কাছে আসে; কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই। জোন্‌হাই তার বড়ো প্রমাণ।…"

(সুকান্ত সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

রাঁচি ভ্রমণ সুকান্তর মনে যে প্রবল আলোড়ন এনেছিল, এনেছিল আনন্দের জোয়ার তার যথার্থ বর্ণনা এই চিঠিখানায় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের কথা জোন্‌হা দেখে যে কবিতা লিখেছিল সুকান্ত তা আর পাওয়া যায় নি। এরজন্যে তার লেখা যত্ন করে না রাখা আর অপরকে কবিতা পড়তে দিয়ে ফেরত না চাওয়ার স্বভাবই দায়ী।

২৫

ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ করেছি অপরের দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যথা, বেদনা সুকান্তকে কাতর করে তুলত। সে নিজের জীবনে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ছিল বলেই হয়ত স্নেহ ভালবাসা বঞ্চিত মানুষের প্রতি তার ছিল প্রবল সহানুভূতি। নিজের জীবনেই হোক বা অপরের জীবনেই হোক বিচ্ছেদ বেদনায় সে যেন দিশেহারা হয়ে পড়ত।

একবার আমাদের বাড়ীর সবার সঙ্গে সুকান্ত শরৎচন্দ্রের বড়দিদি গল্পের চিত্ররূপ দেখতে গিয়েছিল রূপবাণীতে। সম্ভবত ১৯৪১ সালে অমর মল্লিক পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের এই অনবদ্য চিত্ররূপটির মুক্তি ঘটেছিল। মূল ভূমিকায় ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, যোগেশ চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়), মেনকা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী ইত্যাদি। ছোটবড় নির্বিশেষে সবাকার এই ছবিটি ভাল লেগেছিল। সুপরিচালিত এবং সুঅভিনীত এমন চলচ্চিত্র বর্তমানে বিরল। ছবিটি দেখে আমি এবং সুকান্ত

মুগ্ধ হয়েছিলাম। পাহাড়ী সান্যালের সুরেন এবং মলিনা দেবীর বড়দিদির ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ে আমরা হয়েছিলাম চমকিত, বিস্মিত এবং অভিভূত। কাহিনী যেন বাস্তব মূর্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসেছিল আর আমরা চিত্রটির মধ্যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

সুরেনরূপী পাহাড়ী সান্যাল যখন ঘোড়া ছুটিয়ে বড়দির নৌকো ফিরিয়ে আনবার বাসনায় নদীর পাড় দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে চলেছেন আর মাঝে মাঝে বড়দিদি! বড়দিদি! বলে অন্তর স্পর্শকরা ডাক দিচ্ছেন তখন আমরা উভয়ে বিষাদ ব্যথায় অভিভূত হয়ে পড়েছি। পরিস্থিতিটা এমনই করুণ আর বেদনাময় যে আমাদের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। ঘটনার বিচ্ছেদ-ব্যাকুল পরিবেশ আমাদের দুটি বালক হৃদয়কে দলিত মথিত করে চলেছে। জলকাদার মধ্যে সুরেন পড়ে গেলেন এবং করুণ কাতর কণ্ঠে থেমে থেমে ডাকতে লাগলেন বড়দিদি! বড়দিদি! বলে। এ দৃশ্য আমাদের এতখানি ব্যথার কারণ হয়েছিল যে এতদিনের ব্যবধানেও সে দৃশ্যটি আজও স্পষ্ট মনে আছে।

ছবিটি শেষ হবার পরে সকলের সঙ্গে আমরাও বাইরে এলাম কিন্তু তখন আমরা দুজন যেন ভিন্ন মানুষ। আমাদের জীবনে যেন প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন এসে গেছে। বইয়ের করুণ দৃশ্যটি রেখে গেছে আমাদের মনের অন্তস্থলে গভীর ছাপ আর শোকের ছায়া। বিষাদ কাতর দুটি হৃদয় যেন এক হয়ে গেছে। বড়দিদি! বড়দিদি! সেই প্রাণ স্পর্শকরা ডাক একটু করুণ সুরের মত একটা মৃদু সুবাসের মত আমাদের ঘিরে রয়েছে। এ ডাক ভুলতে পারে নি সুকান্ত বহুদিন, ভুলতে পারি নি আমি আজও—এতই তা হৃদয়স্পর্শী। এ ছবিটি দেখার পর বহুদিন পর্যন্ত সুকান্তর মনে একটা স্থায়ী বিষাদের সুর লেগেছিল। সে বলেছিল বড়দিদি নাটকের ঐ দৃশ্য আর অমন আন্তরিক ডাক তার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। এমনি ছিল তার স্নেহকাতর নরম মন।

নিউ থিয়েটার্সের আরেকটি ছবি (উদয়ের পথে) সুকান্তর খুব ভাল লেগেছিল। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, দেবী মুখার্জি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, বিনতা রায়, রেখা বিশ্বাস। কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়।

পরিচালক বিমল রায়। এখানে কাহিনীর নায়কের সঙ্গে সুকান্ত যেন তাদের জীবনের আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিল। কারণ নায়ক ছিলেন একজন শ্রমিক নেতা। এই ছবিটি মনে আছে তখন জনমানসে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল।

নিউ থিয়েটার্সের পরিচ্ছন্ন চিত্রগুলি সুকান্তকে আকর্ষণ করত। প্রতিশ্রুতি আর কাশীনাথ এ দুটি ছবিও তার ভাল লেগেছিল।

সুকান্তর ভাল লেগেছিল নিউ থিয়েটার্সের আর একখানা ছবি জীবন-মরণ। এ ছবিটি অবশ্য আগের ছবিগুলোর অনেক পূর্বে মুক্তিপ্রাপ্ত। এখানে নায়ক কে, এল, সায়গল আর নায়িকা লীলা দেশাই আর পার্শ্ব চরিত্রে ছিলেন শৈলেন চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) ইত্যাদি। সায়গলের গাওয়া একটি গান—"পুরবাসিজন কালি দেবে কুলে ফিরে গেলে" সুকান্তর খুব প্রিয় ছিল। সে সায়গলের কায়দায় বাঁ হাত নেড়ে নেড়ে এই গানটা প্রায়ই গাইত এবং বলত যে এই বাঁ হাত নাচিয়ে গানটি গাওয়ায় এই দৃশ্যটিতে কেমন যেন একটা সুন্দর ভাব ফুটে উঠেছে।

প্রথম জীবনে সুকান্ত চলচ্চিত্রের খুব ভক্ত ছিল বলা চলে। কারণ ও ছায়াছবি দেখতে পছন্দ করত। ওরা যখন হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ীতে বাস করছে তখন একদিন বেলেঘাটায় যখন গেলাম সে সিনেমা দেখার প্রস্তাব করল। আমাদের অগতির গতি বেলেঘাটার রবীন টকি (বর্তমানের সন্তোষ টকিজ) তখন ভরসা। কারণ আলোছায়া চিত্রগৃহটি তৈরী হয়েছে এর অনেক পরে আমাদের চোখের সামনে। এই চিত্রগৃহে খোকন সুকান্তর সঙ্গে বিদ্রোহী নামে একটা ছবি দেখেছিল মাথাপিছু দুয়ানা দর্শনী দিয়ে এবং সুকান্তর আগ্রহে।

সুকান্ত বোম্বাইমার্কা হিন্দি ছবি একদম পছন্দ করত না। আমাদের ছেলেবেলায় এত হিন্দি ছবির বাহুল্যও ছিল না। যেহেতু তখনও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি তাই বাঙলা ছবির বাজার ছিল অনেক বড়, এবং বাঙলা ছবিও তৈরী হত অনেক বেশী। সে অবশ্য অশোককুমার এবং দেবিকা রাণী অভিনীত অচ্ছুৎ কন্যা দেখে খুশী হয়েছিল। ওঁদের অভিনয় ওর ভাল লেগেছিল। চিত্র পরিচালকদের মধ্যে প্রথমেশ বড়ুয়ার প্রতি সুকান্তর

শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে মুক্তি এবং প্রহসন চিত্র রজত-জয়ন্তী সুকান্তকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

কিছু কিছু ইংরেজী ছবিও সুকান্ত দেখেছিল। যার অন্তরে বিপ্লবের বাসনা অঙ্কুরিত হয়েছিল অতি অল্প বয়সেই তার যে "এ টেল অব টু সিটিজ" ভাল লাগবে একথা বলাই বাহুল্য। ছবিটা দেখবার আগেই মূল কাহিনী তার পড়া ছিল। তাই আমাদের চেয়ে এ চিত্রটির রস গ্রহণ করতে তার অনেক সুবিধা হয়েছিল। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে তৈরী বিপ্লব কাহিনী সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র মেরী এন্টনিয়েট সুকান্ত দেখেছিল। উচ্চমানের ইংরেজী ছবিগুলি সুকান্তকে আকৃষ্ট করত। যে কোন কারণেই হোক সে ছবির মূল বিষয়-বস্তুটিকে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারত। আমরা যখন কোন ইংরেজী ছবি দেখে ভাষার ব্যবধানের জন্যে অথবা পরিণত বুদ্ধির অভাবে মূল কাহিনী বুঝতে অসুবিধা বোধ করতাম তখন দেখেছি সুকান্ত মূল কাহিনী ছাপিয়ে মূল বক্তব্যও অনুধাবন করতে পারত। হয়ত ওর পরিণত মনই ওকে সাহায্য করত। এ সম্বন্ধে খোকনের একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সম্ভবত ১৯৪৪ সালের এক সন্ধ্যায় খোকন আর সুকান্ত লাইট হাউসে 'টু নাইট এণ্ড এভরি নাইট' নামে একটি ছবি দেখতে গিয়েছিল। নায়িকা ছিল রিটা হেওয়ার্থ; নায়কের নাম এখন আর খোকনের মনে পড়ে না। চিত্রটি যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের একটি সমাজ চিত্র। ছবি দেখে বেরিয়ে এসে খোকন সুকান্তকে জিজ্ঞাসা করল ছবিটির এই নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? সুকান্ত অতি সরল ভাষায় তার ব্যাখ্যা করে বোঝাল যে এটি একটি দেশপ্রেম-মূলক চিত্র। যুদ্ধকালিন মানুষের মনোবল অটুট রাখাই এর উদ্দেশ্য। একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে নৃত্যগীত চলাকালিন অবস্থায় বিমান আক্রমণে নাট্যমঞ্চের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ল কিন্তু নাচ গান বন্ধ হল না এবং দর্শকরাও আসন ছেড়ে বাইরে গেল না। ঐ দৃশ্যটির উল্লেখ করে সুকান্ত বোঝাল যে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মানুষ যুদ্ধটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছে। তাই এই নৃত্যনাট্যটি আজ রাত্রে যেমন অভিনীত হচ্ছে কালও তেমনি অভিনীত হবে। দেশের মধ্যে যাই ঘটুক না কেন এই অভিনয় চলবে। তাই এই চিত্রটির নাম 'টু

নাইট এণ্ড এভ্‌রি নাইট'। মনে রাখতে হবে এ সময়ে সুকান্তর বয়স আঠার বছরের বেশী নয়।

পয়সার অভাবে নাটক অবশ্য আমাদের বিশেষ দেখা হয় নি। বর্তমানে যেমন নাটক এবং যাত্রার একটা জোয়ার এসেছে, আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু নাটকের প্রতি মানুষের আগ্রহ যেন একটু কম বলে মনে হত। কোন নাটকই তখন বেশীদিন চলত না। এখনকাব মত তখন অবশ্য নাটক নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হত না। তখন চলচ্চিত্রই মানুষকে বেশী আকর্ষণ করত। তখন রেডিওতে অবশ্য তিন ঘণ্টা ব্যাপী নাটক প্রচারিত হত প্রতি শুক্রবার। এই নাটক শোনার ব্যাপারে সুকান্তর আগ্রহ ছিল। রাস্তায় মোড়া পেতে বসে খোকনের সঙ্গে রেডিওর নাটক শোনার ঘটনাও সুকান্তর জীবনে ঘটেছে। যখন পাস পাওয়া যেত তখনই মাত্র পেশাদারী মঞ্চে নাটক দেখা সম্ভব হত। আমার বাবার সঙ্গে পেশাদার মঞ্চের যোগাযোগ ছিল কারণ তিনি ছিলেন নাট্যকার। এছাড়া তৎকালীন কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁরা বাবার কাছে তাঁদের চিকিৎসার জন্য আসতেন। তাই মাঝে মাঝে পাসে নাটক দেখার সুযোগ আমাদের ঘটত এবং সুকান্ত ও খোকন মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গী হত।

পরবর্তীকালে কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রতি সুকান্তর আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। তার কারণ অবশ্য রাজনৈতিক কাজের চাপের দরুন তার সময়াভাব।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতি সুকান্তর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। ওর বন্ধুদের মধ্যে অরুণাচল বসুর তুলির টান সুন্দর। সুকান্তর বৈমাত্রেয় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের সুন্দর আঁকার হাত ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তুলির টানের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তাই ছবির ভাষা সে বুঝত অনেক বেশী। আর তাছাড়া তার শিল্প সংস্কৃত মন তাকে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের এই ধারার সঙ্গে পরিচিত ও আকৃষ্ট করেছে।

চিত্রকলা বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে জানতে হলে বা পরিচিত হতে হলে এগুলি দর্শন এবং পর্যালোচনা করা দরকার, এ কথা সে জানত। তাই দেখা যায় কলকাতা শহরের নামী অনামী যত শিল্পীর প্রদর্শনী হয়েছে তাতে সুকান্ত হাজির থেকেছে এবং মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি শিল্পকর্ম দেখেছে। এসব

ক্ষেত্রে তার সঙ্গী হবার সুযোগ বেশী পেয়েছে খোকন এবং তার অন্যান্য শিল্পী বন্ধুরা।

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত বস্তুর প্রতি সুকান্তের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তাই মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারীতে এবং বিভিন্ন ভাস্কর্য কর্মের মাঝে সে ঘুরে বেড়াত। এছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব জন্তুর ফসিলের ঘরগুলো সে দেখত পরম নিষ্ঠা ভরে। দেখত সম্রাট অশোকের সময়কার শিল্প নিদর্শন-গুলি। সময় সুযোগ পেলে সে মাঝে মাঝে তাই মিউজিয়ামে হাজির হত।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ঐতিহাসিক চিত্রাবলীর এবং সমরোপ-করণগুলির প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তাই সময় সুযোগ মত এখানেও সে মাঝে মাঝে যেত।

গান বাজনার জলসায় সে হাজির হত এবং তার প্রিয় শিল্পীদের গান শুনতে ভাল বাসত। এর আগেই বলেছি সমরেশ চৌধুরী ও পঙ্কজ মল্লিকের গান সে পছন্দ করত। এছাড়া দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুনীল রায় ইত্যাদি শিল্পীদের গানও তার ভাল লাগত।

কলকাতায় যখন যেখানে যত এগজিবিশান হয়েছে সেখানে হাজির থাকা সুকান্তর যেন অবশ্য কর্তব্য ছিল। পার্কসার্কাস ময়দানে কি একটা এগজিবি-শানে খোকন আর সুকান্ত হাজির ছিল। সেখানে দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত 'ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কারে বাজলো ভেরী বাজলো রে' সুকান্তর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই সময় অসময়ে এই গানটি সে গেয়ে উঠত।

২৬

সুকান্তর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। সে আর পাঁচজন লোকের মতই সাধারণ, চেহারায় তার এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যার দ্বারা তাকে অপরের কাছ থেকে পৃথক করা যেতে পারে।

একটা কথা মনে পড়ে গেল। সুকান্ত যখন সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে উঠেছে এমনি সময় আমার পরিচিত একটি কিশোর তাকে দেখবার বাসনা প্রকাশ করেছিল আমার কাছে। সুযোগ ঘটে গেল, একদিন আমি

খোকন আর সুকান্ত আমাদের বৃন্দাবন পাল লেনের বাড়ী থেকে বেরিয়েছি পথে তার সঙ্গে দেখা হল। আমি তাকে বললাম যে আমার সঙ্গী দুজনের মধ্যে একজন কবি সুকান্ত। তাকে বললাম এর মধ্যে থেকে কে সুকান্ত তা দেখিয়ে দিতে। সে বিনা দ্বিধায় খোকনকে দেখিয়ে দিল।

সুকান্ত মাথায় প্রায় আমার সমান অর্থাৎ পাঁচফুট চার ইঞ্চির মত ছিল। চোখ দুটো ছিল স্বপ্নালু, বড় বড়। ঠোঁট ঈষৎ পুরু আর ওপরের পাটির দাঁতগুলো ছিল পাতানো সামান্য উঁচু। গায়ের রং ছিল ময়লা কিন্তু কালো নয়। সেজমাসীমার ছেলেদের মধ্যে সুকান্তই ছিল শ্যামবর্ণ। নাকটি খুব টিকলো নয়। দাঁতগুলি খুব সাদা ঝকঝকে পরিষ্কার, মাথায় একরাশ ঘন কেশ। কথা বলার ভঙ্গীটি বড দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ কমনীয়। বেশ সুগঠিত ছিল ওর দেহ, রোগা ছিল না কোনদিন। শরীরে শক্তির অভাব ছিল না কোন। সুকান্তর কিছুটা অংশ তার এক ভাই অশোক পেয়েছে। ওর লেখা কিছু কবিতা এবং গদ্যসাহিত্য এরই মধ্যে পাঠক সমাজে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

সুকান্তর চেহারার সবচেয়ে বড বৈশিষ্ট্য যে ওর বুকের ওপরে একটা বড সরোম তিল ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা পি. এম. বাকচীর পঞ্জিকা নিয়ে নাডাচাডা করতাম। সুকান্তও আমাদের সঙ্গে যোগ দিত। পঞ্জিকার মধ্যে তিল তত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব এবং বর্ষফল ইত্যাদি বিষয় ছিল পঞ্জিকার প্রতি আমাদের আকর্ষণের মুখ্য কারণ। এখানেই দেখেছিলাম বুকে সরোম তিল থাকা কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। আমরা অর্থাৎ বমা, বৌদি অমলা, ঘেলু, খোকন, আমি, আমার দাদা হীবেন, সবাই পঞ্জিকাব এই বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে সুকান্ত জীবনের মিল দেখে বিস্ময় বোধ করতাম। এখনও মনে আছে ওর বুকের তিলটা খুব বড ছিল বলে আমরা বলতাম সুকান্ত শুধু কবি নয় বেশ বড় দরের কবি হবে। সে এসব আলোচনায় যোগ দিত এবং মৃদু মৃদু হাসত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চাইত রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন কবির বুকে তিল ছিল কিনা।

মাথাটা ঈষৎ কাত করে মাঝারি গতিতে সাধারণত রাস্তার পাশ ঘেঁষে সে পথ চলত। তার হাতে সব সময়েই কিছু না কিছু কাগজ, পত্র-পত্রিকা অথবা বই থাকত।

কারুর সঙ্গে কথা বলতে হলে সে নিজের চোখ দুটিকে পরিপূর্ণ তার চোখের ওপর মেলে ধরত এবং একটু হেসে কথা বলত। এ সময় পাওয়া যেত ওর স্বপ্নালু চোখ দুটির পরিচয়। অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলায় একটা অস্বস্তি বা সঙ্কোচ তার ছিল। কানে কিছু কম শুনত বলে একটু বেশীই যেন তার লজ্জা ছিল।

যারা কানে কম শোনে তারা সাধারণত যে-কানে একটু বেশী শোনে সেই কানটার পাশে একটা হাত দিয়ে কানটাকে একটু এগিয়ে ধরে যাতে কথাগুলো তার কানে আসতে পারে আরও একটু স্বচ্ছন্দ গতিতে। সুকান্ত লজ্জায় এ কাজ করতে পারত না। তাই তাকে দেখা যেত কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় মাথা কাত করে তার ডান কানটা কাঁধের কাছে নিয়ে যেতে এবং কাঁধের প্রান্ত দিয়ে তার ডান কানটাকে একটু এগিয়ে ধরতো যাতে তার শুনতে সুবিধা হয়। কিন্তু এ কাজেও তার অত্যন্ত সঙ্কোচ ছিল।

প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হতে না হতেই সুকান্ত কিন্তু নবপরিচিতকে আপন করে নিতে পারত গভীর আবেগে। তবে সুকান্তর পরিচিতের সংখ্যা যদিও ছিল অসংখ্য কিন্তু বন্ধুর সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।

কবির লেখার ভঙ্গীটিও ছিল ভারী সুন্দর। সাধারণত ডান দিকে হেলে মাথাটা ডান হাতের কাছাকাছি নিয়ে যেত। যখন ও খুব একাগ্র চিত্তে লিখত তখন মুখের ভেতরে জিভটা দিয়ে নিচের ঠোঁটের ওপর দিকটা ডান দিকে সামান্য উঁচু করে ঠেলে ধরত। এবং জিভটা ভেতরে নড়ত। এটা ছিল ওর মুদ্রাদোষ, ধরিয়ে দিলে হাসত। ঘেলু রসিকতা করে বলত সুকান্ত যখন 'ঐ' কিংবা 'ঔ' লিখবে তখন জিভটা আরও ওপর দিকে উঠে যাবে নয়ত বেরিয়ে আসবে। এই পরিহাসে সুকান্ত খুব হাসত।

প্রথম জীবনে সুকান্ত খুব ধোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। মেজমাসীমার রুচিস্নিগ্ধ মনের কথা আগেই বলেছি। তিনি এ পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে ছেলেদের সাজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন। একেবারে শিশু অবস্থায় এমনকি একটু বড় হয়েও সুকান্ত কিন্তু জামাকাপড় পরতে চাইত না। নিরাবরণ দেহে একটা বল হাতে সে

সময় ঘুরে বেড়াতো। বড়রা এ ব্যাপারে রাগারাগি করলে শুনেছি সে তাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে তাদের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিত। তার যুক্তি খুব সরল—যদি বড়রা ইচ্ছে করে তবে তারাও দিগম্বর হতে পারে, অন্তত সুকান্ত তাদের নিশ্চয়ই কিছু বলবে না। শুধু শুধু তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কি যুক্তি থাকতে পারে। এ ব্যাপারে সুকান্তকে তিরস্কার করতে গিয়ে ছোড়দার একবার এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

বালকবয়সে সুকান্ত সাধারণত হাফ-প্যান্ট এবং সার্ট ব্যবহার করত। কাবলি-জুতো ওর খুব প্রিয় ছিল। তাই সাধারণত সে চটি অথবা কাবলী জুতোই ব্যবহার করত। একটু বড় হয়ে সে ধুতি শার্টকে তার নিত্যকার পোশাক হিসাবে গ্রহণ করল।

গরম জামার বাহুল্য তার ছিল না। এবং যেন মনে হয় বিশেষ দরকারও সে বোধ করত না। সারা কলকাতায় যাকে হাজার কাজে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে কারণে আর অকারণে তার বেশী গরম জামাকাপড় পরবার অবকাশ কোথায়? তাই শীতকালে ধুতি-পাঞ্জাবীর ওপর একটি সোয়েটারই শীত কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একবার সে একটা কাল রঙের সোয়েটার পরে এল আমাদের বাড়ী, কে যেন বুনে দিয়েছে। সাদা পাঞ্জাবীর ওপরে এই কাল সোয়েটারটি মানিয়ে ছিল সুন্দর। একটু কৌতুক করবার জন্য সোয়েটারটি কেমন দেখবার আছিলায় সামনে থেকে আমি তার পেছন থেকে ঘেলু টেনে উঁচু করে ধরলাম সোয়েটারের নিম্নাংশটি। ও বার কয়েক হাঁ হাঁ করে আমাদের পরিহাসটি উপভোগ করে বলে উঠল, "তোরা সোয়েটার ধরে যেমন টানাটানি করছিস তাতে অচিরেই এটা বড় হয়ে যাবে এবং স্বচ্ছন্দেই একটা বিরাট ভুঁড়ি এর মধ্যে আশ্রয় নিতে পারবে।" এই রসিকতায় আমরা সকলে হেসে উঠলাম।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তার অবহেলা যেন চরমে উঠেছিল। তখন ধূলি-ধূসরিত মলিন ইস্ত্রীবিহীন কোঁচকান জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে কবির যেন কোন দ্বিধা ছিল না। এই সম্বন্ধে আমরা তার ত্রুটি ধরিয়ে দিলে সে হেসে উড়িয়ে দিত।

খাওয়া-দাওয়ার প্রসঙ্গে প্রথমে যা বলতে হয় তা হল এই—সে কোনদিনই

ভোজনবিলাসী ছিল না। কিন্তু ভাল খাওয়াদাওয়ার প্রশংসায় সে চিরদিনই ছিল পঞ্চমুখ। আসলে সে ছিল অল্পেই তুষ্ট। একটি বিশেষ সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তার ছিল অপরিসীম লজ্জা আর সংকোচ। এ ধরনের অর্থহীন লজ্জা ও সংকোচের জন্য ওকে নিয়ে ভারি সমস্যার সৃষ্টি হত। কোন বাড়ীতে বসে হয়ত সে গল্পে মেতে উঠেছে, প্রাণখোলা হাসিঠাট্টায় আসর জমিয়ে রেখেছে, এমন সময়ে যদি কোন খাবার তাকে দেওয়া হত সে-সময় ও যেন একেবারে সংকুচিত হয়ে পড়ত। তার এই স্বভাবের জন্য একাধারে সে যেমন তিরস্কৃত হত, তেমনই ওকে যারা স্নেহ করত, ভালবাসত তাদের কাছে এ ব্যাপারটা যেন এক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার মা বা মেজবৌদির কাছে পর্যন্ত লজ্জায় সে সত্যগোপন করত। কোনদিন হয়ত রাত্তিরে অথবা দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ী অথবা পিসীমার বাড়ী এসে হাজির হল। তখনও সে হয়ত অভুক্ত। তাকে যদি সে-সময় জিজ্ঞাসা করা হত, তার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে কিনা সে অম্লানবদনে সত্য গোপন করত। বলত, এ কাজ সেরে সে বেরিয়েছে। এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরবর্তী কালে এতটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ও এলে আর সকলের সঙ্গে ওর জন্যও খাবার জায়গা হত এবং ওকে ডেকে খেতে বসান হত। ও খেয়ে এসেছে কিনা আর জিজ্ঞাসা করা হত না।

যদিও কোন ব্যাপারেই ওর না ছিল লোভ, না ছিল কৌতূহলসৃষ্টিকারী আগ্রহ। কিন্তু একটা ব্যাপারে ও ছিল দারুণ লোভী আর ক্ষুধিত। এবং তা হচ্ছে বই পড়া। এতে ওর কোন লজ্জা, সংকোচ বা দ্বিধা ছিল না। বই হাতে পেলে এক নিঃশ্বাসে তা শেষ করতে না পারলে তার শান্তি নেই। তবে আগেই বলেছি, সে বেছে বই পড়ার পক্ষপাতি ছিল।

মানুষ হিসাবে সুকান্তর আর এক গুণ—ন্যায়ের প্রতি আসক্তি আর অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা। ছেলেবেলা থেকেই ন্যায় এবং অন্যায় সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা এবং মতামত ছিল। অভিমান এবং হৃদয়াবেগের বিকাশও তার চরিত্রে দেখা যায়। একেবারে শিশুকাল থেকেই যেন তার বিদ্রোহী স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। সুকান্ত

যখন নিতান্তই বালক তখন একদিন তার পিতার সঙ্গে কালীঘাটে মামার বাড়ী যাচ্ছিল বাসে করে। সঙ্গী অন্যান্য ভাইয়েরাও ছিল। মেসোমশাই হিসেব করে টিকিট করে ছিলেন এবং সুকান্তর নাম করে আর আলাদা টিকিট কাটেন নি। কণ্ডাক্টার যখন সুকান্তকে দেখিয়ে তার জন্য আলাদা টিকিট চাইল তখন মেসোমশাই বললেন, 'এতগুলো টিকিট ত' করেছি, মনে কর না বাসে এত লোক যাচ্ছে, ও অন্য কারও ছেলে।' কণ্ডাক্টার মৃদু হেসে চুপ করে গেল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সবাই বাস থেকে নামতেই সুকান্ত উল্টো পথে হাঁটা শুরু করল। মেসোমশাই যখন জানতে চাইলেন, সে মামাবাড়ীর পথ না ধরে অন্য পথে যাচ্ছে কেন? জবাবে সুকান্ত অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমি ত' তোমার ছেলে নই, আমি তোমার সঙ্গে যাব কেন?' ঘটনাটি পরে বড়দের মুখে সরস আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুকান্তের বিচারবোধ এত কঠোর ছিল যে অন্যায় ব্যবহার করে বা অন্যায় কথা বলে তার প্রিয় বন্ধুবান্ধব সকলকেই সুকান্তর কাছে তিরস্কৃত হতে হত। তার ক্ষমা পাওয়া কঠিন ছিল।

জীবনভোর অন্যায়ের সঙ্গে সে কখনও আপোষ করে নি। এটাই ছিল তার চরিত্রগত গুণ। আমাদের বয়সী একটি আত্মীয় ছেলে আমাদের বাড়ীতে কয়েক মাস ছিল। তারপরে সে তার বাড়ী পূর্ববাংলার গ্রামে আবার ফিরে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে সে তার চরিত্রের এবং কর্মের পূর্ণ ছাপ রেখে গেল আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব মহলে। ঘেলুর বেশ কিছু টাকা চুরি গেল। রমার বন্ধু বেলুকে এবং আরও কয়েকজনকে দিয়ে গেল প্রচণ্ড মানসিক আঘাত। কিন্তু সে ছেলেটি চলে যাবার পরে এইসব ঘটনা আমরা জানতে পারলাম একে একে। এ সম্বন্ধে কী করা যায় এবং কেমন করে আমরা সেই দুষ্টুকে সায়েস্তা করতে পারি। সে আমাদের নাগালের বাইরে বলে যখন নিষ্ফল আলোচনায় সবাই ব্যস্ত তখন সুকান্ত পরামর্শ দিল ওকে একখানা চিঠি লেখা যাক—যাতে আমাদের সবার সই থাকবে। সে জানতে পারবে যে আমরা তার স্বরূপ জেনে ফেলেছি। কথাটা সবার মনোমত হল এবং এরকম একখানা চিঠি পাঠান

হল। সেখানা ছেলে মেয়ে মিলিয়ে প্রায় ১৫ জন সই করল। পরে আমরা খবর পেলাম চিঠির ফল হয়েছিল মারাত্মক।

উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সুকান্তর কাছে অসহ্য ছিল। যে সব রসিকতা বা ব্যঙ্গের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের অভাব থাকত বা যে সব বিদ্রূপের মূল উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র অপরকে আঘাত করা, সে সব রসিকতা সে শুধু অপছন্দই করত না, সবার মুখের উপরে স্পষ্ট প্রতিবাদ জানাত। এ ব্যাপারে তার আত্মায় বন্ধু-বান্ধব বা নিকট-জন বলে রেহাই পাবার কোন সুযোগ ছিল না।

সুকান্তের প্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ নিয়ে বাইরে প্রায়ই নানারূপ বিদ্রূপ আলোচনা বা মন্তব্য শোনা যেত এবং বিভিন্ন কাগজেও প্রকাশিত হত। একবার সুকান্তর এক বন্ধু এই ধরনের এক হালকা রসিকতা করেছিল। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই সংগঠনটিকে হেয় করা। সুকান্ত বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ বন্ধুটিকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিল। এমনই ছিল সে কঠিন এবং দৃঢ়চেতা—অন্যায় এবং অসতগতির মোকাবিলায়।

কিন্তু বুদ্ধিসিঞ্চিত সরস রসিকতা এবং কৌতুককর কথাবার্তা সে খুব পছন্দ করত।

২৭

বিশেষ কোনো মেয়েকে ভালো লাগা নিয়ে আমরা সুকান্তকে যথেষ্ট প্রশ্ন এবং আগ্রহ ও কৌতূহল প্রকাশ করতাম। কখনো আন্তরিক-ভাবে আবার কখনো হাল্‌কাভাবে। এটা আমাদের যেন সাধারণ ঠাট্টা তামাসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কিন্তু আমাদের কাছে এ ব্যাপারে নিরাসক্ত ভাবই বজায় রেখেছিল। হরমোহন ঘোষ লেনের ৩৮ নম্বর মাঠ কোঠার বাড়ীর কাছাকাছি ভারি সুশ্রী একটি মেয়ে থাকতো। এর প্রতি সুকান্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, চেষ্টা করেছি আমরা এর প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি করতে। বলেছি আলাপ পরিচয় করে নিয়ে, একটি হৃদয়া-বেগের ঘটনা সৃষ্টিতে তার অসুবিধা কোথায়। সে যখন কবি তখন তার

একজন মনের মানুষ থাকাই তো স্বাভাবিক। এই ব্যাপারে, অর্থাৎ এই প্ররোচনা সৃষ্টিতে আমি খোকন আর ঘেলুই মুখ্য ভূমিকা নিতাম। সে এই আলাপ আলোচনা, এই পরিহাস উপভোগ করতো, হাসতো মৃদু মৃদু এবং আমাদের উৎসাহিত করবার জন্য মজার মজার গল্প সৃষ্টি করতো ঐ মেয়েটি বা তার বাড়ীর অন্যান্য লোকদের নিয়ে।

একদিন বিকেল বেলা সুকান্ত আমাদের বাড়ী এলো। তার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে দেখলাম তুলো আর কাপড় দিয়ে একটি পট্টি বাঁধা। ওকে পায়ে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে ও এমন একটা ভাব দেখালো যেন এ ব্যাপারে আমরা এবং তার সঙ্গে ঐ মেয়েটিও দায়ী, এবং নানা কথা বলে এমন একটা রহস্য সৃষ্টি করলো—যেন কিছুতেই আমাদের বুঝতে দিতে চায় না যে পায়ের এই পট্টির সঙ্গে মেয়েটির বা আমাদের সম্পর্ক কি। ধীরে ধীরে অবশ্য রহস্য পরিষ্কার হল। সুকান্তর কৃত্রিম রাগ এবং আমাদের প্রতি গালাগালি আমরা উপভোগ করলাম সবাই। ঘেলুতো বলে বসলো মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করা এখন খুবই সহজ হবে, চাই কি আমরাও সুকান্তর সঙ্গে মেয়েটির বাবার কাছে যেতে পারি। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নয়, শুধু তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য, বলা যায় না হয়তো এই সুযোগে মেয়েটির করুণা মাখানো দৃষ্টিও লাভ হয়ে যেতে পারে। আর সত্যিই তো সুকান্তর এই পায়ের চোটটা তো সাধারণ নয়, রীতি মত ফুলে গেছে, পায়ের পাতাতেও একটু লাল ভাব ফুটে উঠেছে।

সুকান্ত প্রথমেই তার স্বাভাবিক সরস ভঙ্গিতে মেয়েটির বাবার চেহারার একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে গেল। তাঁকে অবশ্য কেউই আমরা দেখি নি তবু সেই চেহারাটা আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। তিনি একাধারে যেমন কালো তেমনি ভারী দেহের অধিকারী। তিনি যখন একটি রিক্সায় করে যাচ্ছিলেন তখন সেই রিক্সার একটি চাকা সুকান্তর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর দিয়ে চলে যায় এবং স্বভাবতই তার খুব লাগে। যদিও যাদের ও দায়ী করছে তারা কেউই এ ব্যাপারে জড়িত নয় এবং জানেও না। কিন্তু সুকান্ত এ ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চয় যে এই আঘাতের জন্য মেয়েটি দায়ী এবং আমরাও দোষী।

একবার একখানা চিঠিতে আমি ওকে এ কথা সেকথা লেখার পরে পুনশ্চ দিয়ে লিখলাম—ভালো কথা—খবর কি ? সে কেমন আছে ? ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিল এবং পুনশ্চ দিয়ে লিখলো "বন্ধ্যা গরু দান করে সে কেমন দুধ দেয় জানতে চাইলে রসিকতা করা হয়—জানি।"

হঠাৎ ঘেলু একটা প্রকাণ্ড চিঠি পেল সুকান্তর কাছ থেকে। কি ব্যাপার না—কবি একটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। চিঠিখানা আমিও পড়লাম—পড়লো আরও দু'একজন, যেমন আমার বৌদি অমলা দেবী (এঁর সঙ্গে সুকান্তর প্রীতির সম্পর্ক ছিল) খোকন মামা ইত্যাদি। ছত্রে ছত্রে ভাষার বিন্যাসে বর্ণনার ইন্দ্রচ্ছটায় একটি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি। যদিও এ চিঠি পড়ে ধরা যাচ্ছিল না যে সুকান্তর কে মনে তুলেছে আলোড়ন। কিন্তু আমরা অনুমান করলাম—এ সেই মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নয়। ভারী খুশি হলাম আমরা। নিশ্চিন্ত হলাম—এবার সুকান্ত গভীর জালে জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের চেষ্টার ফল ফলেছে। চিঠির ভাষার কি আকুলতা অজানাকে জানবার. তাকে বোঝাবার কি ব্যাকুলতা। ওর সঙ্গে যদিও আমার সখ্যতা অনেক বেশী তাই চিঠিখানা আমাকে না লিখে ঘেলুকে লেখায় আমি একটু মনোক্ষুণ্ণ হলেও তার মনে যে কেউ আলোড়ন তুলেছে এতে আমি খুশিই হলাম। কে জানে হয়তো সুকান্তর লেখায় একটা নতুন ভাবধারা সৃষ্টি হবে, সেও সৃষ্টি করবে সুললিত কাব্য গাথা আর এই চিঠিখানাই তার সূচনা। যাই হোক, এর পরে আমিও পেলাম একখানা চিঠি যার মূল বক্তব্য একই—যদিও এ চিঠিখানা আকারে ছোট। নাটক জমে উঠেছে বোঝা গেল। আমাদের মহলে তখন দারুণ উত্তেজনা আর আলোচনা এই ব্যাপার নিয়ে। আমার বৌদি কিন্তু এ ব্যাপারে দুঃখিত হল, দোষ দিল আমাদের, বললো—আপন ভোলা নিরাসক্ত সুকান্তকে তোমরা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করাতে প্ররোচিত করেছ যার ফলে আজ সে এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে।

আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম সন্দেহ নেই। যাই হোক দু-তিনদিনের মধ্যেই কবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে যেমন মাঝে মাঝে হঠাৎ উদয় হতো তেমনি এসে হাজির হল শ্যামবাজারে। আমরা পরম আগ্রহে

তাকে লক্ষ করতে লাগলাম—কিন্তু আশ্চর্য ও অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দভাবে গল্পগুজব করতে লাগলো। আমাদের তখন অবাক হবার পালা। ওর কথার ধরন দেখে বা ওর ব্যবহারে কে অনুমান করতে পারে ওর মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। আমরা আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে চেপে ধরলাম সবাই মিলে সত্য প্রকাশ করবার জন্য। আমাদের আগ্রহ দেখে সুকান্ত সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসি করে উঠল—ও যা বললো তাতে আমরা খুবই নিরাশ হলাম। বৌদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো যাক ভালই হল। সুকান্তর উদ্বৃত্ত কিছু সময় ছিল আর হাতে ছিল কাগজ কলম তাই চিঠি মারফৎ এ হল নিছক কাব্যসৃষ্টি, আমাদের জন্য কিছু মুখরোচক আলোচনার খোরাক। তার "ঐ মেয়েটির দিকে দৃষ্টি দিতে বয়ে গেছে" ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে না বললে এই বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—তা হচ্ছে এই যে এই মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু সুকান্তর কোন দিনই পরিচয় হয় নি। সুকান্তর ভাষায় "বন্ধ্যা গরু কখনোই দুধ দেয় নি।"

এতদিন পরে বুঝেছি যে সুকান্ত তার মনের কথা আমাদের কখনও খুলে বলে নি। তার মনের গভীরে বিশেষ কারোর প্রতি আকর্ষণ বা অনুরাগের যে সৃষ্টি হয়েছিল আমি অন্তত জেনেছি তার মৃত্যুর পরে। এ ব্যাপারে অরুণাচল বসু বা খোকন ভাগ্যবান। কারণ তাদের কাছে ব্যাপারটা অজানা ছিল না। অরুণাচলকে লেখা সুকান্তর কিছু চিঠি এ ব্যাপারে খানিকটা আলোকপাত করে। ইদানীংকালে খোকনের লেখা একটি "দুর্যোগময় সন্ধ্যা" 'সুকান্ত স্মৃতি' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সুকান্তর হৃদয়ের গভীরে যে অনুভূতি জেগেছিল তার কিছু কথা সে গুছিয়ে লিখেছে। কবি যাকে মনে মনে ভালবাসতো সেই মেয়েটির কথা খোকনের লেখা থেকে তুলে ধরলাম "……সুকান্তর পছন্দকে তারিফ না করে পারলাম না। কে একজন বলেছিল স্ত্রীলোক যদি বুদ্ধিমতী না হয় তাহলে তার সমস্ত সৌন্দর্যই ব্যর্থ। সুকান্তর প্রেমিকা শুধু যে সুন্দরী তাই নয় তার মধ্যে এমন একটা সংযত রুচি স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি আছে যা সুকান্তর শিল্পী মনকে আকৃষ্ট করবে এটাই স্বাভাবিক।"

সুকান্তর মনের বিশেষ এই অনুভূতির কথা খোকনকে কিন্তু আগে কোন দিনই বলে নি। আমাদের মত তার কাছেও এটা গোপন করেই রেখেছিল। ১৯৪৪/৪৫সের এক দুর্যোগময় সন্ধ্যায় হঠাৎ কবি তার মনের কথা প্রকাশ করে ফেলেছিল খোকনের কাছে। নীচের ক'টি কথায় খোকন তার লেখা শেষ করেছে "...মাঝে মাঝে আজও ভাবি সেদিনের সে দুর্যোগভরা সন্ধ্যার কথা—ভাবি প্রকৃতির সেই উদ্দামতার কথা। প্রথমে উঠেছিল ঝড় ধুলো উড়িয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে এক প্রকাণ্ড আলোড়ন তুলে। তারপর সুরু হল বৃষ্টি আর বিদ্যুতের মাতামাতি। মনে মনে ভাবি এই দুর্যোগময় পরিবেশই কি কবিকে প্রভাবিত করেছিল তার হৃদয়দুয়ার উন্মোচন করতে।"

শুনেছি চিকিৎসকরা তাঁদের নিজের চিকিৎসা নিজে করেন না। আমার বাবা ছিলেন চিকিৎসক। তাঁকে দেখেছি নিজের বা তাঁর বাড়ীর কারো কঠিন অসুখে তিনি তাঁর চিকিৎসক বন্ধুদের ডাকতেন। তাই যদিও সুকান্ত তার মানসীর মনের খবর জানবার জন্য অপরের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতো কিন্তু অন্য মেয়েদের মনের কথা সে সহজেই বুঝতে পারতো। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দুএকজনের হৃদয়াবেগের কিছু ঘটনা ঘটেছিল। তারা সবাই সুকান্তর কাছে তাদের মনের কথা খুলে বলতো এবং সেই সব মেয়েদের কার্যকলাপ বা হেঁয়ালীভরা কথাবার্তার ব্যাখ্যা চাইতো তার কাছে। সেও পরম উৎসাহে এই সব নিয়ে আলোচনা করতো, সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করতো এবং কার্যকলাপের কারণ বুঝিয়ে বলতো। এসময়ে দেখতাম সুকান্তর মনোবিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা। এই সব মেয়েদের মনের কথা অতি সহজেই বুঝতে পারতো এবং বন্ধুদের যথোচিত পরামর্শ দিত। কেউ কোন প্রেমিকার চিঠি পেলে তা নিয়ে সুকান্তর কাছে হাজির হওয়ার যেন একটা রেওয়াজ ছিল। সেও সেই চিঠিখানা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তো এবং বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে ঐ চিঠির পর্যালোচনা এবং ব্যাখ্যা করতো। পত্রলেখিকা কি বলতে চায়, কোন কথা ঐ চিঠিতে প্রচ্ছন্ন আছে তা সুকান্ত যেন টেনে বার করে আনতো। তার আরেকটি বিচিত্র অভ্যাস ছিল এই যে সে মানুষের হাতের লেখার সাহায্যে মনকে বোঝবার এবং চেনবার চেষ্টা করতো। এসব

ব্যাপারে আমাদের খুব আগ্রহ ছিল এবং মনে আছ শ্যামবাজারের পাঁচমাথার গোল দ্বীপটি যার উপরে পরবর্তীকালে নেতাজীর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি। সুকান্তর কথামত এবং তার নির্দেশ মতো আমাদের প্রেমিক বন্ধু বান্ধবরা তাদের মনের মানুষকে চিঠি পত্র লিখতো। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সুকান্তর মনোবিশ্লেষণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কবি এবং সাহিত্যিকদের মনোবিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু এত অল্প বয়সে সুকান্ত কি করে যে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল তা ভাবলে অবাক লাগে।

কিন্তু প্রেম যাদের কাছে অবসরের বিলাস অথবা নিছক খেলা তাদের প্রতি তার কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না বরঞ্চ তাদের প্রতি সে তীব্র ঘৃণাই পোষণ করতো।

২৮

বাংলাভাষায় বানান সম্বন্ধে সুকান্তর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ইদানীং কালে দেখা যায় যে বাংলাশব্দের বানান পদ্ধতিতে একেক জন একেক রকম পথ অনুসরণ করে। যেমন "হ'ল" কথাটিকে কেউ লেখে "হলো"—কেউ লেখে "হল" আবার কেউবা লেখে "হোলো"। এরকম বিভিন্ন শব্দের বানান বিভিন্ন লোকের হাতে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের বানান পদ্ধতি মেনে নিয়েছিল এবং সে মনে করতো প্রত্যেকেরই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। একই শব্দের বিভিন্ন বানান তার কাছে দৃষ্টিকটু মনে হত। সে বহুবারই এ সম্বন্ধে তার মতামত প্রকাশ করেছে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪০/৪১ সালে "বানান বিভ্রাট" নামে তার একটি লেখা কোন এক হাতের লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এত অল্প বয়সেই বানান সম্বন্ধে সুকান্তর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

যে সব শব্দের নির্দিষ্ট বানান আছে তা লিখতে গিয়ে যদি কেউ বানান ভুল করতো—সুকান্ত তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতো না। হয় সে সেই

ভুল বানানটিকে গোল করে চিহ্নিত করে লেখকের চোখের সামনে তুলে ধরতো—অথবা সেই বানানটিকে শুদ্ধ করে এবং বেশ বড়ো করে লিখে তার তলায় একটি দাগ টেনে লেখকের কাছে পাঠাত। সে বুঝতে পারতো না যে মানুষ সাধারণ চলতি কথারও বানান কি করে ভুল করে! সুকান্তকে চিঠি লেখার সময় আমরা বানান সম্বন্ধে খুবই সজাগ দৃষ্টি রাখতাম এবং কোন শব্দের বানান সম্বন্ধে সংশয় জাগলে সেই শব্দকে আমরা এড়িয়ে যেতাম—অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। রমা একবার চিঠিতে খুশি কথাটিকে ভুল করে খুশী লিখেছিল সুকান্ত তার উত্তরে একটি চিঠিতে খুশীকে সংশোধন করে বড় আকারে 'খুশি' লিখে একটি বাক্যে প্রয়োগ করেছিল। বলা বাহুল্য যে ঠিক বানানটির প্রতি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণই তার মূল লক্ষ্য ছিল। সুকান্তর অন্য বন্ধু বান্ধবদেরও হয়তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

শুধু লেখায় নয়—কথা বলার সময়ও কোন শব্দের ভুল উচ্চারণ সুকান্তর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। অনেকেই কথা বলার সময় ভুল উচ্চারণ করে থাকে। কেউ কেউ কথায় কথায় স্ স্ করে—কেউবা 'র' বদলে 'ড়' ব্যবহার করে আবার কেউবা কথায় কথায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে। এরা শশীকে 'সসী', ঘরকে 'ঘড়' এবং সাপুড়েকে 'সাঁপুড়ে' বলে থাকে। এই ধরনের ভুল উচ্চারণ কবির কানে গেলে সে সেই ভুল শব্দগুলো নিয়ে নানা রকম বাক্য রচনা করে ঐ শব্দগুলোর উপর জোর দিত। ..লেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের শ্লেষকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ হলেও মেয়েরা এতে ভারি মনোকষ্ট পেত।

অকারণ বাহাদুরী নেওয়া বা চালিয়াতী করা তার কাছে অসহ্য ছিল। সমাজের সর্বস্তরেই এ ধরনের কিছু চরিত্র আছে যারা তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নানারকম মিথ্যা ঘটনার কথা বলে বাহাদুরী নেয়। এদের সম্বন্ধে সুকান্তর মনোভাব ছিল ভারি কঠোর। একটা কথা আবার বলছি যে—ন্যায় অন্যায়ের প্রতি সুকান্তর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করি। আমাদের অতি পরিচিত দুটি কিশোরী শুধু নিছক বাহাদুরী নেবার জন্য

সুকান্তকে নিভৃতে ডেকে দুজনে দুটি সিগারেট ধরায়—সঙ্গে তাদের সিগারেটের একটি পুরো প্যাকেট। সুকান্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি চেয়ে নেয়। কঠিন কণ্ঠে সেই আত্মীয় কিশোরী দুটিকে তিরস্কার করে বলে যেন তারা আর কখনও এমন অন্যায় কাজ না করে। তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়। এই মেয়েদুটির মধ্যে একজন আমার কাছে এই ঘটনাটির কথা প্রকাশ করে বলে যে তারা তখন মাঝে মাঝে প্রায়ই সিগারেট খেত এবং মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতো এই ভেবে যে তারা আধুনিকতার চূড়ান্ত করছে। সুকান্তর এই শাসনে কাজ হয় এবং তারা এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করে।

সুকান্তর কাছাকাছি আসবার অথবা তার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ যাদের হয়েছে তারা নিশ্চয়ই সুকান্তর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির পরিচয় পেয়েছেন। সরল, সুরসিক এবং দরদভরা হৃদয় নিয়ে সে সবার সঙ্গে মেলামেশা করতো বটে—কখন কখন তাকে নিতান্ত নরম প্রকৃতির মানুষ বলেও মনে হত কিন্তু প্রয়োজনে তার বলিষ্ঠ মনের পরিচয়ও পাওয়া যেত।

২৯

কবিকে ব্যবসায়ী হিসাবেও অনেকে দেখেছেন। সারস্বত লাইব্রেরী নামে পুস্তক বিক্রয় এবং প্রকাশন সংস্থাটির সত্বাধিকারী ছিলেন কবির পিতা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। বলা যায় এই পরিবারে পুস্তক ব্যবসার প্রতি মনোযোগ অনেকদিনের। আমার পিসেমশাই কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ আমার মেসোমশাই নিবারণচন্দ্রের অগ্রজ ছিলেন। তিনি 'হরিহর লাইব্রেরী' নামক পুস্তক বিক্রয় এবং প্রকাশন সংস্থাটির মালিক ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি সংস্কৃত এবং কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন রকম পূজার প্রণালী সম্বলিত পুস্তক 'পুরোহিত দর্পণ' এদের অন্যতম। সুকান্তর বৈমাত্রের ভাই শ্রীমনমোহন ভট্টাচার্য 'সাহিত্য মন্দির' নামে একটি পুস্তক প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী ছিলেন।

এই পারিবারিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে পুস্তক ব্যবসায়ের প্রতি সুকান্তর

আকর্ষণ দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ১৯৪৫ সালে প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই সুকান্তকে জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হতে দেখা যায়। পিতাকে সাহায্য করবার জন্য পরীক্ষার পরের অবসরটুকু সে কাজে লাগাতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য পরিবারেব প্রতি বিশেষ করে তার ছোট ছোট ভাইয়েরা যেমন মুকুল, অশোক আর অমিয় তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শারদীয়া পূজার সময় এদের পোশাক পরিচ্ছদ কেনার দায়িত্ব সে নিজে হাতে নিত—কতকটা মেসোমশাইয়ের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং কিছুটা নিজের পছন্দমত পোশাক কেনার জন্য। কেনাকাটার এধবণের দায়িত্ব সুশীলদাও সুকান্তকে প্রায়ই দিত। পরবর্তীকালে নিজের প্রকাশিত লেখার পারিশ্রমিক হিসাবে যা সামান্য পয়সা কড়ি সে পেত তা থেকে ছোট ভাইয়েদের হাতে কিছু পয়সাও দিত তাদের ইচ্ছামত খরচ করার জন্য।

কখনও কখনও নিজ পরিবারের সুবিধা অসুবিধার প্রতিও তার দৃষ্টি পড়তো। মাসীমা মারা যাওয়ার পরে বাড়ার রান্নাবান্নার ভার মাইনে করা লোকের হাতেই ছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই তারা মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতো! এ ছাড়া অন্যান্য কাজ কর্মের জন্য ঠিকা ঝি ছিল। ১৯৪৪ সালে জুন মাসে সুশীলদার বিয়ে হয় এবং তখনই এদের সংসারে একটা স্বাভাবিকতা আসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঠিকা ঝি হঠাৎ উধাও হয়ে যেত— তখনই দেখা যেত বিশৃঙ্খলা। ঝি-চাকর খোঁজার ব্যাপারে বাড়ার অভিভাবকরাই যে শুধু প্রয়াসী হতেন এমন নয়—সুকান্ত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে ঝি চাকর খুঁজে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাত। এটাও আমাদের কাছে একটা ঠাট্টার বিষয় ছিল কারণ সে যে সংসারের কোন কাজে লাগতে পারে এটা আমাদের কাছে ধারণার অতীত ছিল। তাই সে যখন ঝি না থাকায় বাড়ীতে কি কি অসুবিধায় সৃষ্টি হয়েছে সে নিয়ে আলোচনা করতো তখন ঘেল্লু নানারকম রঙ্গ রসিকতায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। তার মূল অভিযোগ—সুকান্ত বাড়ীতে থাকে কতক্ষণ যে এই সব অসুবিধা তার চোখে পড়বে। আমাদের বৌদি অমলা দেবী এসব কথার প্রতিবাদ করে বলতো যে সুকান্ত সংসারের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হলেও নাকি আমাদের আপত্তি

না হলেও আপত্তি। সুকান্তর মৃত্যুর বছর খানেক আগে ৩রা জুলাই ১৯৪৬ সালে সে অরুণকে লিখেছে "......আমাদের ঝি চলে গেছে। আসার সময় তুই যে ঝি দিবি বলেছিলি তাকে সঙ্গে করে আনা চাই-ই"। আমার এসব কথা বিশেষ করে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে সে তার বহির্মুখী জীবনে মাঝে মাঝে নিজ পরিবারের একজন হিসাবে নিজেকে পতিষ্ঠিত করতে চাইত।

সম্ভবত এই একই উদ্দেশ্যে সে কিছুদিন নিয়মিত সারস্বত লাইব্রেরীতে বসতে শুরু করে। নতুন উদ্যমে দোকানটিকে যতদূর সম্ভব সংস্কার করে অন্যান্য পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ের পুস্তক এনে আলমারী সাজালো। মেসোমশাই এবং বাড়ীর অন্যান্য সবাই যে এব্যাপারে প্রীত হলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবিকে এই ভূমিকায় খুব অল্প লোকই দেখেছে। কাব্য প্রতিভা এবং বৈষয়িক বুদ্ধি মানুষের চরিত্রের দুটি বিভিন্ন ধারা তাই এদের সহাবস্থান স্বাভাবিক নয়। কিছু কালের মধ্যেই কবিকে ব্যবসার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হল। প্রধানত কয়েকটি কারণে—একদিকে পার্টির প্রতি কর্তব্য নিষ্ঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠন, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ, কিশোর-বাহিনীর পরিচালনা, স্বাধীনতা পত্রিকায় কিশোর সভার পরিচালন দায়িত্ব এবং সর্বোপরি এর ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দেওয়ার তাগিদে নিয়মিত শ্যামবাজারে আগমন। তাই সময়াভাবে নিয়মিত দোকানে যাওয়া কমাতে হল। তার ওপর এই সময় থেকেই ওর শরীরটা বিশেষ খারাপ হতে শুরু করেছিল।

কবির যে বিষয়বুদ্ধির অভাব থাকবে তা অনুমান করতে আশা করি কারোরই অসুবিধা হবে না। যে সমস্ত পুস্তক নগদ মূল্যে কেনা হয়েছে বা অপর পুস্তক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধারে আনা হয়েছে সেগুলি বিনা দ্বিধায় অপরের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে সে পরিচিত এবং অল্প পরিচিত মহলে ধারে বিক্রয় করে দিয়েছে। অথবা একটু পরে দাম পাঠিয়ে দেবে এই প্রতিশ্রুতিতে অনেক পুস্তক করেছে হাতছাড়া। ইতিপূর্বে সুকান্ত নিজের সম্পাদনায় কিশোর-বাহিনী প্রকাশিত অপরাজেয় নামক নাট্য সংকলনটি বিক্রী করে কিশোর বাহিনী সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এরও বেশ কয়েকটি হাতছাড়া হয়ে যায় বিনামূল্যে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সুকান্তর একজন নিকট

আত্মীয় পুস্তক ব্যবসায়ীর কথা যার সঙ্গে তার পরম প্রীতির সম্পর্ক ছিল—সে বেশ কয়েকখানি অপরাজেয় নিয়ে গেল তার দোকান মারফৎ বিক্রীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখান থেকে এই বইগুলির মূল্য বাবদ কিছুই পাওয়া গেল না এবং কবিও তার স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচবশে এ ব্যাপারে বিশেষ তাগাদা দিতে পারলো না। এঁকে অবশ্য সুকান্ত কখনও ক্ষমা করে নি এবং তার শেষ জীবনে এই প্রীতির সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল।

প্রসঙ্গত সুকান্তর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। যারা সুকান্তর চিঠিগুলি মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন যে সে নিজের আর্থিক অনটনের কথা কখন কখন প্রকাশ করেছে। আমি বলবো এই অভাব তার নিজের সৃষ্টি কারণ সে তার নিজের প্রয়োজনের কথা কখনও কারো কাছে প্রকাশ করতো না এমনকি তার পোশাক পরিচ্ছদের অভাবের কথা বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে প্রকাশ করে নি। এসম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব ধারণা ছিল হয়তো বা কিছুটা অভিমানও ছিল। নিজের প্রয়োজনের কথা অপরকে জানানো যেন পরম অগৌরব অসম্মানের ব্যাপার। আমরা যখন গুরুজনের কাছে আবদার করতাম তখন সে সেই বয়সেই স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা পোষণ করতো। অবশ্য তার কিছু কিছু লেখা তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে এবং কিছু কিছু পারিশ্রমিকও পাচ্ছে।

৩০

১৯৩৯ সালের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪০ সালের শেষ দিকে কলকাতাকে নিষ্প্রদীপ (Black-out) করা হল। এই নিষ্প্রদীপ অবস্থা সম্ভবত ১৯-৪ সালের শেষদিক পর্যন্ত ছিল। শহরবাসীর তখন এ এক নতুন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বাড়ীর আলোগুলোকে ঠুলি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত যাতে ঘরের আলো রাস্তায় গিয়ে না পড়ে। তেমনি রাস্তার আলোগুলোকেও এমন ভাবে ঠুলি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত যাতে আকাশ থেকে শহরের অস্তিত্ব বুঝতে পারা না যায়।

এ সবই বিমান আক্রমণের সতর্কতার জন্য। যদি কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করত তবে তার জন্য ছিল শাস্তির ব্যবস্থা। এই নিষ্প্রদীপ অবস্থা নিয়ে বীরেন ভদ্রেব একখানা নাটক বেশ কয়েকদিন মিনার্ভাতে অভিনীত হয়েছিল এবং আমরা দল বেঁধে দেখতে গিয়েছিলাম। সুকান্তও আমাদের সঙ্গে ছিল। রাস্তাগুলো থাকত তখন গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন এবং মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপের মহড়াও দেওয়া হত। রাস্তার গাড়ীগুলোর প্রধান আলোর ওপরের আধখানা কোনো রঙ দিয়ে ঢাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তেমনই চাকাগুলোকে সাদা রঙের দাগ দিয়ে দেওয়া হত এবং গাড়ীর দুপাশ ঘিরে নীচের দিকে শেষপ্রান্তে একটা সাদা চওড়া রেখা টানা হত। আমাদের ছোটদের মহলেও তখন এই নিষ্প্রদীপ অবস্থা নিয়ে নানা মজার গল্প চলত। একবাব আমি সাইকেল করে সোজা শ্যামনগব চলে যাই। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার নেমে আসে। তখন আলো না থাকায় আমি সাইকেলটা নিয়ে হেঁটে যেতে আরম্ভ করি। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপব দিয়ে চলেছি একলা একলা সাইকেল টেনে টেনে, হঠাৎ আমায় কয়েকজন পুলিশের লোক ধরল। জানতে চাইল আলো ছাড়া কেন আমি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছি। সাইকেল চালাচ্ছি না এ অজুহাতে তাদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। এই গল্প সুকান্তকে বলতে ও খুব একচোট হাসল আর মন্তব্য করল যে অন্ধকারে কাজ করে করে পুলিশগুলোর চোখ বেড়ালের চোঁখের মত শক্তি সংগ্রহ করেছে। তা নাহলে আমি তাদের দেখতে পেলুম না, তারা আমাকে কি করে দেখলো। সুতবাং তার মতে ব্ল্যাক-আউটের এইটিই একটা ভাল দিক।

সন্ধ্যের পব শহরে লোকজন অল্পই চলাফেরা করত। কিন্তু সুকান্ত তার স্বাভাবিক নিয়মেই এই অন্ধকারের মধ্যে সারা শহর চৌকি দিয়ে ফিরত। ওর কাছে শুনেছি দু-একবার অন্ধকারে চলন্ত ষাঁড়ের সঙ্গে ওর মৃদু সংঘর্ষ হয়েছে।

ব্ল্যাক-আউট নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার অবসরে আমি তখন বেকার। তাই বাড়ীর আলোগুলো যাতে রাস্তায় না পড়ে এ দেখার গুরু দায়িত্ব আমি নিজেই নিজের

কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম এবং এতে করে মেয়েমহলের সঙ্গে আমার প্রায়ই সংঘর্ষ হত।

সুকান্ত আর ঘেলু কৃত্রিম আশংকা প্রকাশ করে বলত যদি নিয়ম ভঙ্গের জন্য কোন শাস্তি হয় তখন বাড়ীর গুরুজনেরা আমাকেই জেলে পাঠিয়ে দেবে কারণ আমিই একমাত্র বেকার। তাই শাস্তি যদি কাউকে নিতে হয় আমিই না হয় কদিন নিয়ে এলাম ; বিশেষ করে ১৯৪২-এর আন্দোলনে আমি যখন একবার শ্রীঘর ঘুরে এসেছি। তাছাড়া আমারই ত উচিত বড়দের বাঁচিয়ে শাস্তিটা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া।

যাই হোক, এই নিষ্প্রদীপ অবস্থাটা সুকান্তর কাছে একেবারে অসহ্য ছিল। ১৯৪৪ সালের ২০শে নভেম্বর সুকান্ত কাশী থেকে একটা চিঠি লিখেছিল '.........কাশী শহর হিসেবে খুব বড় সন্দেহ নেই বিশেষ করে আজকের দিনে আলো ঝলমল শহর হিসেবে। অর্থাৎ এখানে ব্ল্যাক-আউট নেই।' ব্ল্যাক-আউট ছিলনা বলেই কাশীকে সুকান্তর আলো ঝলমল মনে হয়েছে। আসলে এই দম বন্ধকরা অন্ধকার অবস্থাটা কদিনই বা মানুষের ভাল লাগে।

সুকান্তর দাদা সুশীলদার বিয়ে হয় ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি। তখনও কলকাতায় নিষ্প্রদীপ অবস্থা। তাই সুকান্ত নববধূর উদ্দেশ্যে যে কবিতাটি লিখেছিল, তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তার বাড়ীর তৎকালীন ছন্নছাড়া অবস্থা এবং শহরের নিষ্প্রদীপ অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য লক্ষ করা যায় :

> 'এ শহর নিষ্প্রদীপ, নিষ্প্রদীপ আমা[illegible] র ঘর,
> জমেছে উদাস ধুলো অনাদৃত বৎসর বৎসর।
> এখানে কখনো কেউ পায়নিকো বসন্তের হাওয়া
> তাই তো এখানে ব্যর্থ সহৃদয় চাওয়া আর পাওয়া।

নিষ্প্রদীপ অবস্থার প্রথম দিকটা অর্থাৎ প্রথম দু-একটা বছর শুধুই অন্ধকারের অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এর সঙ্গে যোগ দিল মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক চিরে সাইরেনের প্রচণ্ড চীৎকার। যারা বর্তমানে রোজ পরীক্ষামূলক সাইরেন শোনে তারা এই ভয়াবহ সাইরেনের কান্না অনুমান করতে পারবে না। একদিকে হিটলার যেমন প্রচণ্ড বিক্রমে এগড়ে চলেছে পশ্চিম রণাঙ্গণে, অপর দিকে জাপান তেমনই অপ্রতিহত

গতিতে যুদ্ধজয় করে চলেছে পূর্বরণাঙ্গনে। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। জাপান প্রায় দেশের দোর গোড়ায়। বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা এই সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিল। আমরা কাগজে পড়লাম প্রথম যেদিন রেঙ্গুনে জাপানী বোমারু বিমানের আবির্ভাব হয় তখন নাকি কৌতূহল-বশত শহরবাসীরা বাড়ীর অলিন্দে, জানলায় এবং ছাদে ওঠায় প্রাণহানির সংখ্যা হয়েছিল অত্যন্ত বেশী।

কয়েক বার বিমান আক্রমণ হয়ে গেল কলকাতার ওপরে। সে এক উত্তেজনাময় অনুভূতি। বাড়ীর আলো নিবিয়ে আমরা সব জড়ো হতাম পূর্বনির্দিষ্ট একতলার ঘরের কোন গৃহকোণে। পার্কে এবং খোলা মাঠে, ময়দানে অগণিত স্লিট ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিল যাতে হঠাৎ বিমান আক্রমণ হলে লোকেরা মাটির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তেমনি বহু বাড়ীর সামনে পাঁচ-ছ ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। এগুলোর নাম "ব্যাফল ওয়াল"। এর আড়ালেও আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীতে বাড়ীতে জানলার কাঁচের ওপরে কাপড়ের টুকরো সেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল যাতে করে কাঁচ ছিটকে লোককে আঘাত না করে। প্রতি বাড়ীতেই বিমান আক্রমণের জন্য মোটামুটি একটা বিশেষ আশ্রয় নির্দিষ্ট করা ছিল। আমরাও তেমনই আমাদের আশ্রয়স্থলে গিয়ে জড়ো হতাম। দুরুদুরু কম্পিত বক্ষে বাইরে আমরা শুনেছি বোমাপড়ার আওয়াজ।

বিমান আক্রমণের সঙ্কেত নিয়ে সাইরেন যখন ওঁয়াও ওঁয়াও করে উঁচু-নীচু ঢেউ খেলানো সুরে বেজে উঠত তখন বাড়ীর লোকের চোখ মুখের চেহারা যেত পাল্টে আর বিমান আক্রমণ মুক্তির সঙ্কেতধ্বনি যেন রৌদ্রদগ্ধ ভূমিকে করত জলসিঞ্চিত। আমাদের অনেকের বুক ঠেলে তখন বেরিয়ে আসত এক একটা মুক্তির দীর্ঘশ্বাস। হয়ত মনের সঙ্গোপনে অনেকেই চিন্তা করত যাক এবারের মত বেঁচে গেলাম। সুকান্ত তার একখানা চিঠিতে এ সম্বন্ধে ভারী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে: "......দৈবক্রমে এখনো বেঁচে আছি, তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি। "......... বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয় তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য

ভেদ করে কৃতিত্ব দেখাবো তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহুপূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে। যাক্, এ সম্বন্ধে আর নতুন করে বিলাপ করবো না, যেহেতু গতবছর এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতা যথেষ্টই ছিল·········এখন ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশংকা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশগ্রহণ করেছিল, এখন তো বর্ধমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে।·········প্রথমদিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয় দিন হাতিবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এই দিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থ দিন ডালহৌসী অঞ্চলে—(এই দিন তিনঘণ্টা আক্রমণ চলে আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চমদিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনও অজ্ঞাত। ১ম, ৩য় আর পঞ্চমদিন কেটেছে কৌতূহলী আনন্দের মধ্য দিয়ে। ২য় দিন বালিগঞ্জে মামার বাড়ীতে মামার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটেছে। চতুর্থ দিন সদ্য স্থানান্তরিত দাদা-বৌদির সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই কেটেছে সবচেয়ে ভয়ানকভাবে ·········(রাত্রি) ৯-১০ মিনিট এ". সময় সেদিনকার সবচেয়ে বড ঘটনা ঘটলো, বৌদি সহসা বলে উঠলেন, বোধহয় সাইরেন বাজছে; রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাদা তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নীচে নিয়ে গেলেন এবং উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি হৈ-চৈ করে বাড়ী মাৎ করে দিলেন। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু স্তব্ধ। আর সুরু হয়ে গেল দাদার 'হায়' 'হায়,' বৌদির থেকে থেকে সভয় আর্তনাদ, আর আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মূহ্যমানতায় নৈরাশ্যে বিঁধে বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পেছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত

কলকাতা একযোগে কান পেতেছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহে মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘণ্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণ তেমন কিছু হয় নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।”

(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

সুকান্ত কিন্তু এই বোমাবর্ষণের আশংকার মধ্যেও সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াত তার নিজেব কাজে আবার কখনও বা নিছক আড্ডা দেবাব প্রেবণায়। গুরুজনেরা সময়ে সময়ে ওর অনুপস্থিতিতে আশংকা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন সবাই যখন সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোনোটা বাদ দেবার চেষ্টা করে, তখন সুকান্তর এমন কি কাজ থাকতে পারে যাতে স্বেচ্ছায় বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। ও কিন্তু মনে হত যেন কলকাতার এই ভীতিময় অবস্থাটাকেই উপভোগ কবত। যুদ্ধের শুরুতেই কিছু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল প্রাণের আশংকায়। আমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব মহলেও অনেকেই কলকাতা ছেড়ে গ্রামের দিকে বা আত্মরক্ষার তাগিদে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিহার, উড়িষ্যা বা উত্তর প্রদেশে আবার কেউ কেউ বা আরও দূরে চলে গিয়েছিল। আমার মেজমাসিমা এবং তার পবিবারেব অন্যান্যরা মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ঐখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বছরখানেকের মধ্যেই। আমাদের পাড়াও প্রায় সম্পূর্ণ খালি হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা পাশাপাশি দুটি বাড়ীতে কিছু লোক ছিলাম। এর কারণ যাবার আমাদের নির্দিষ্ট কোন জায়গাও ছিল না আর শুনেছিলাম বাইরে বিহারের ছোট ছোট শহরে মধুপুর দেওঘর যশিদি ইত্যাদি স্থানে অভূতপূর্ব ভীড হয়েছে এবং ফলে জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। সত্যমিথ্যা জানি না শুনেছি কফির পাতাও নাকি তখন সের দরে বিক্রি হত। আর হয়ত আমাদের গুরুজনেরা বিপদের আশংকা এবং আসল বিপদের তফাৎটা বুঝে দেখার চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়ের কলকাতার চেহারার সুন্দর একটা রূপ সুকান্তর একটা চিঠিতে পাওয়া যায়। "......প্রথমে দিচ্ছি কলকাতার বর্ণনা—কলকাতা এখন আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত, নাগরিকরা পলায়নতৎপর। নাগরিকরা যে পলায়ন-তৎপর তার প্রধান দৃষ্টান্ত তোমার মা—তবু এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কত দ্রুত সবাই করছে প্রস্থান আর শহরটি হচ্ছে নির্জন। তবে এই নির্জনতা হবে উপভোগ্য—কারণ এর জনাকীর্ণতায় আমরা অভ্যস্ত, সুতরাং এর নব্য পরিচয়ে আমরা একটা অচেনা কিছু দেখার সৌভাগ্যে সার্থক হবো। .....আজকাল রাত একটায় যদি কলকাতা ভ্রমণ কর তাহলে তো তোমার ভয়ঙ্কর সাহস আছে বলতে হবে। শুধু চোর গুণ্ডার নয়, কলকাতার পথে এখন রীতিমতো ভূতের ভয়ও করা যেতে পারে। সন্ধ্যার পরে কলকাতায় দেখা যায় গ্রাম্য বিষণ্ণতা। সেই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্যজীবন। আর বিবাহের পূর্বে বিবাহোন্মুখ বধূর মত কলকাতার দেখা দিয়েছে প্রতীক্ষা—অন্য দেশেরা বিবাহিত সখীর মত দেখবে ঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি।......"

(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

এই সময় সুকান্তর অন্যান্য ভাইরাও কলকাতার বাইরে চলে গেল বিমান আক্রমণ আর যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচবার জন্য। সুকান্ত লিখেছে—'আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ। আমারও যাবার কথা ছিল কিন্তু আমি গেলুম না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে এক ভীতিসংকুল রোমাঞ্চকর পরম মুহূর্তের সন্ধানে......।"

(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

যারা বাইরে গিয়েছিল নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে তারা ফিরে আসতে শুরু করল এবং এরা ফিরে আসার কিছুদিন পরেই বিমান আক্রমণ শুরু হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যারা কলকাতা ছেড়ে যায় নি তাদের অন্তত অকারণ ভোগান্তি, অর্থ নষ্ট আর মানসিক অবসাদে পড়তে হয় নি।

দমকল বাহিনীর মত একটা সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এ সময়ে গড়া

হয়েছিল যার নাম Air Raid Precaution সংক্ষেপে A. R. P.। এদের কাজ ছিল বিমান আক্রমণের পূর্বে আর পরে জনসাধারণকে সাহায্য করা। Radio-তে তখন ঘন ঘন প্রচার হত 'গুজবে কান দেবেন না।' কলকাতার অবস্থাটা তখন থমথমে হয়ে গিয়েছিল। সবার মন যেন একটা শঙ্কা এবং অনিশ্চয়তায় ভরা।

যদিও যুদ্ধ চলছিল পশ্চিমে এবং দূর প্রাচ্যে, কিন্তু তার ঢেউ এসে লাগছিল আমাদের দেশের পূর্ব প্রান্তে বিশেষ করে কলকাতায়।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরো কটি অপরিচিত জিনিসের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় হল। এরা হচ্ছে ব্ল্যাক-মার্কেট, কন্‌ট্রোল এবং পারমিট। পারমিট লাভের আশায় মুনাফার লোভে ব্যবসায়ী সমাজের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মনে হয় তখন থেকেই হাতে খড়ি হল। এর আগে সম্ভবত এ সব ব্যাপার আমাদের দেশে অজানা ছিল। কলকাতা যখন ফাঁকা হয়ে গেছলো বিমান আক্রমণের আশংকায় ১৯৪১ সালের শেষ প্রান্তে, তখন পাছে খালিবাড়ী মিলিটারী বা A. R. P. এর হাতে যায় কলকাতার বাড়ীওয়ালা সমাজ তাই বাড়া খালি রাখতে ভয় পেত। বহুক্ষেত্রে ভাড়া কমিয়ে দিয়েও ভাড়াটিয়াকে রাখবার চেষ্টা চলতো। ১৯৪৩ সালের শেষ প্রান্তে সারা কলকাতা জলচ্ছ্বাসের মত জনতার প্লাবনে ডুবে গেল। একদিকে যেমন জিনিসপত্রের অভাব দেখা গেল অন্যদিকে সমস্ত শহরকে কন্‌ট্রোল আর পারমিট আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো।

১৯৪৩ সালে বাঙলা দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার স্মৃতি হয়ত এখনও অনেকের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে লোক কলকাতা শহরে এসে ভীড় জমাল আশ্রয় আর খাদ্যের সন্ধানে। উদ্বাস্তু সমস্যা তখন কলকাতার লোকের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল, কারণ দেশবিভাগ তখনও অনেক দূরে। তাই যা বলছিলাম ১৯৪৩-এর শেষভাগে শহর কলকাতা জলোচ্ছ্বাসের মত জনতার প্লাবনে ডুবে গেল। একদিকে সর্বহারা গ্রামবাসী অপরদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে আসা আমেরিকার সাদা-কালো সৈনিকে দেশ ভরে গেল। ৪৩-এর এই মন্বন্তর সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

হাস্য-সঙ্গীত শিল্পী যশোদাদুলাল মণ্ডলের রেকর্ড করা একটি হাসির গান* নীচে স্মৃতি থেকে তুলে দিলাম। এ সময়ের কলকাতার সার্থক বর্ণনা পাওয়া যাবে এই গানে।

Calcutta 1943 October
ARP, military পথে পথে ভিখিরি
Accident and crowd
Control, permit, black out
সব জিনিসের বাড়লো দর
খানিকটা নীল আর খানিকটা ছাই
চলে ARP
খাঁকি হ্যাট-প্যান্ট-কোট নেকটাই
ছোটে মিলিটারী
লাখে লাখে লোক জমেছে কলিকাতায়
ভিখিরিরা নোংরা করে রাস্তা চলা দায়।
একটি পয়সা দাওগো বাবু যখন তারা বলে
বাবুরা দেয় মুখ ঝামটা
পঁক পঁক পঁক মোটর গাড়ী যখন জোরে চলে
কত লোকই হোল ব্যাঙ চ্যাপটা।
চারিদিকে সব যেন—ঐ গেল ঐ ধর—ঐ গেল ঐ ধর।
চাল, ডাল, তেল, আটা-ময়দা
Control হয়েছে
বাড়ীর বউরা রান্না ছেড়ে
Line দিয়েছে
Control, চলতে ফিরতে কথা কইতে
Control সব তাতেই Control
শ্বশুর বাড়ী যাওয়া Control কর ভাই
ঘন ঘন যেতে হলে Permit Cardটি চাই
বাহিরে black-out ভিতরে black in

Black market চলছে তবু রোজ
মেলে না কয়লা কেরোসিন ॥
অন্ধকারে ধাক্কা লাগে
Buffle-wall-এর গায়
ভিতর থেকে কারা দুজন ছুটে বাহির যায় ।
চুপি চুপি নিলাম পিছু
দেখি একটি নারী ও একটি নর
স্বামী-স্ত্রী কিংবা আর কিছু
ভাবটি ভয়ঙ্কর ।

A. R. P.-র uniform ছিল Blue gin-এ তৈরী। দু'-একবার কাচার পরে নীল খানিকটা উঠে গিয়ে কোন কোন জায়গায় রঙ হালকা হয়ে পড়তো—ছাই রঙ যেন বেরিয়ে পড়ত। তাই গায়ক এখানে বলেছেন 'খানিকটা নীল আর খানিকটা ছাই চলে ARP'—বাস্তবিক এ দৃশ্য তখন কলকাতায় নিত্য দেখা যেত ।

এ গানের রেকর্ডখানা আমার এখনও আছে। সুকান্ত এ গানটা আমাদের বাড়ী বহুবার শুনেছে আমাদের সঙ্গে এবং রসগ্রহণ করেছে। এটা সম্ভবত ১৯৪৪ সালের কথা ।

১৯৪৪ সালে আমার চাকুরী এবং শচীনদা ও সুশীলদার বিয়ে হয়েছিল।

৩১

কলকাতায় বোমা বর্ষণের কিছু আগে—১৯৪২ সালে আবার দেশ জুড়ে শুরু হল গান্ধীজীর 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। যদিও এ আন্দোলন ছিল অহিংস কিন্তু অতি দ্রুত এ আন্দোলন হিংসায় রূপান্তরিত হল। সারা দেশ জুড়ে শুরু হল একদিকে ট্রাম-বাস, ট্রেন ইত্যাদির বহ্ন্যুৎসব অপর ক্ষেত্রে, দিকে দিকে থানা আর Railway Station অবরোধ। প্রথমে পুলিশ এবং পরে মিলিটারী নামান হল শান্তিরক্ষার জন্য এবং নিয়মশৃঙ্খলা ফেরাবার তাগিদে। ইংরেজের তখন বড় বিপদ ।

কবির অবশ্য এ আন্দোলনে সমর্থন ছিল না। কারণ পৃথিবীর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন আক্রান্ত। ইংরেজ এবং তার বন্ধু সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হোক এটা তখনকার ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি চান নি। তাই তাঁরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। এ এক বিতর্কিত অধ্যায়।

সুকান্তর মনেও প্রথমে বুঝি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু নিজের সঙ্গে সে এরই মাঝে বোঝাপড়া করে নিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। ফ্যাসিস্ট শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে এ মূল সত্য তার নিজের কাছে ধরা পড়তে দেরী হয় নি। তখন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ডাক দিয়েছে জাপানকে রুখতে হবে। সুকান্তও তাই ডাক দিয়েছে—

কর জাপানের আজ গতি রুদ্ধ।
শুরু কর প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ॥

জাপানের মানবতা-বিরোধী ফ্যাসিস্ট-চেহারা আর সকলের কাছে না হোক কবির কাছে খুব স্পষ্ট ছিল। তাই সে নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল এ সময়ে। জাপান যখন চট্টগ্রামে বোমা ফেলেছে বা আরো এগিয়ে আসছে তখন সুকান্ত ফ্যাসিস্ট বিরোধী অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল। শুনেছি গণনাট্য সংঘকে প্রচারমূলক নাটকও লিখে দিয়েছিল বেশ কয়েকটি—উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে জাপানের আসল রূপ তুলে ধরা।

এ সময়ে এ কাজটি কিন্তু খুব সহজ ছিল না। কারণ দুশ'বছরের ইংরেজের শাসনে দেশবাসী তখন মুক্তি-পাগল। বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠী বাংলাকে ইংরেজ তাড়াবার শক্তি দিয়েছে। ইংরেজের এই বিপদের সুযোগ নিতে হবে এটাও সবার ইচ্ছা। জাপান ভারতকে মুক্ত করবে কি আবার পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধবে এ সম্বন্ধে মানুষের সংশয় থাকলেও একটা পরিবর্তনের জন্য সবাই অধীর হয়ে উঠেছিল। যে কোন উপায়ে দেশের স্বাধীনতা—এই ছিল সাধারণের পণ। তখন সর্বোপরি দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ছেড়ে বাইরে গেছেন স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এবং তৈরী করেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ।

তাই কম্যুনিস্ট পার্টির এই কাজ অতি কঠিন ছিল। মানুষকে বোঝান ছিল

প্রায় অসাধ্য সাধন আর তার চেয়ে সমস্যা—এ পথে বিপদ ছিল, ভয় ছিল শারীরিক নিগ্রহের।

পরপর কয়েকটি রাজনৈতিক নির্যাতনের ঘটনায় সুকান্তর কবি হৃদয় পীড়িত হলে প্রতিবাদে সুকান্ত লিখল নীচের 'ছুরি' কবিতাটি :

বিগত শেষ-সংশয় ; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,
শঙ্কাকুল শিল্পীপ্রাণ, শঙ্কাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।
হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত,
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা ত' নয় ভ্রান্ত।
বিদেশী-চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ-বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।
শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য।
ভুলেছে যারা সভ্য-পথ, সম্মুখীন যুদ্ধ,
তাদের আজ মিলিত মুঠি করুক শ্বাসরুদ্ধ,
শহীদ-খুন আগুন জ্বালে, শপথ অক্ষুণ্ণ :
এদেশ অতি শীঘ্র হবে বিদেশী-চর শূন্য।
বাঁচাবো দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধ চোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।
বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী,
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী।

কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে জনপ্রিয়তা হারাল। সাধারণ মানুষ যারা সব জিনিস তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে না, বরং প্রচারে হয় বিভ্রান্ত, তারা হল নিতান্ত ক্ষুব্ধ। কোনমতেই এরা কম্যুনিস্টদের মতবাদ আর আন্দোলন সমর্থন করতে পারলো না।

এর প্রভাব কবির ওপরেও যে পড়ল না এমন নয়। কবি যেন একটি বিশেষ দলের এবং মতবাদের মুখপাত্র। এর ফলে সে সময় সুকান্তর কাব্যের

প্রচার যেন একটা গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সর্বস্তরে স্বীকৃতি পেতে তখনও একটু দেরী ছিল।

অবশ্য এর আরও কারণ আছে। প্রথমত সুকান্তর কতটুকু লেখাই বা তার মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ; আর দ্বিতীয়ত সুকান্তর অকাল মৃত্যু মানুষকে তার প্রতি আগ্রহশীল করে তুলেছে। তাই জনপ্রিয়তার চরম শিখরে ওঠবার জন্য কবির মত কবিতাগুলোকেও তার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এটাও যেন আমাদের দেশের সাধারণ নিয়ম। বারবার এটা প্রমাণিত হয়েছে।

অনেক অশ্রুপাত, অনেক রক্তপাত আর অনেক মৃত্যু, সঙ্গে সঙ্গে বহু সম্পত্তির ধ্বংস কিন্তু এত করেও ১৯৪২ সালের মুক্তি আন্দোলন কার্যত ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু ইংরেজকে জানান দিয়ে গেল—সাবধান, দেশবাসী মুক্তির সাধনায় দৃঢ়-সংকল্প, এতে কোন খাদ নেই, নেই হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ।

৩২

এরই পরে বাঙলাদেশ পড়লো চরম বিপদের মুখে, দেখা দিল পঞ্চাশের মন্বন্তর! খাদ্যাভাবে বহুলোক মারা পড়লো গ্রামে। শহরেও এসে জড়ো হল বহু লোক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এক মণ সাধারণ চালের দর ছিল ৪/৫ টাকা। দ্রুত-গতিতে তা বাড়তে বাড়তে এক সময়ে ৪০/৫০ টাকায় উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দামও বেড়ে গেল বহুগুণ। এ দাম বাড়ার নিষ্ঠুর খেলার অভিজ্ঞতা দেশের লোকের ছিল না। শহরে বহু দরিদ্র পরিবারে এলো চরম বিপর্যয়। এই সময় আর একটা নতুন জিনিসের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় হোল, Ration। এর আগে থেকেই ভেজাল, Control, Permit, black out আর black market মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছিল। ঘৃণায় সমস্ত অন্তর যেন তাদের সংকুচিত হয়ে যেত এই ভিক্ষাবৃত্তিতে। এগুলো থেকে মুক্তির জন্য মানুষ মরীয়া হয়ে উঠেছিল।

সকাল থেকেই দেখা যেত সারিবদ্ধ হয়ে লোকেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে

কোথাও কয়লা, কোথাও কেরোসিন, কোথাও বা চাল, চিনি এইসব দেওয়া হচ্ছে। ছোটদের পড়াশুনার দফারফা। একই মানুষ কতগুলো লাইনে দাঁড়াতে পারে। তাই ছোটরা এবং বাড়ীর বউরাও অংশ নিতে শুরু করলো এই Line, Line খেলায়। এ যেন এক দুঃস্বপ্ন যার স্মৃতি আজও আমাদের চঞ্চল করে তোলে।

আবার শহরে তখন দলে দলে ছিন্নমূল গ্রাম্য-কৃষকের এবং দরিদ্রের ভীড় —খাদ্য চায়, বাঁচতে চায় তারা। এত খাদ্য কোথা থেকে আসবে, কেই বা দেবে? শহরের মানুষ তখন আত্মরক্ষার তাগিদে ব্যস্ত। তাই খাদ্য না পেয়ে এরা শুধু একটু ভাতের মাড় বা ফ্যান চাইতে শুরু করলো। ভাত নয় ফ্যান। পাড়ায়, পাড়ায় যে সব যুববাহিনী বা সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা Club ছিল, তারা সক্রিয় হল। বাড়ী বাড়ী ফ্যান সংগ্রহ করে জড় করে এই ছিন্নমূল অসহায় মানুষগুলোকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলো। ফ্যানের সঙ্গে যদিও কখনও দু'এক দানা ভাত কেউ পেয়েছে, পরমতৃপ্তিভরে তা মুখে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্যত্র কিন্তু এ দুর্ভিক্ষের ছায়ামাত্র পড়ে নি। বিশেষ চেষ্টাও হয় নি বাংলা দেশকে এই চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার। বহুলোকের অভিযোগ এ দুর্ভিক্ষ মনুষ্যসৃষ্ট। ব্যবসায়ী সমাজ তখন রক্তের স্বাদ—অতিরিক্ত মুনাফার স্বাদ পেয়েছে। তাই চাল চলে গেল অন্তরালে। বেশী দাম দিলেই পাওয়া যাবে যত চাই, অজস্র, অঢেল…। কিন্তু তবু মেনে নিতে হবে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। দেশে খাদ্যাভাব। খাদ্যের এই লুকোচুরি খেলা আজও কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি—মানুষের গা সওয়া হয়েছে মাত্র। সেই ৪/৫ টাকার চালের মণ ২০০ টাকায় উঠতেও আমরা দেখলাম। মুনাফা শিকার এমনই জিনিস—যত পায়, তত চায়, আরও আরও।

যদিও যুদ্ধ আর তার ফলাফলে সুকান্ত খুবই উদ্বিগ্ন আর পীড়িত বোধ করত, ফ্যাসিস্ট জাপানের অপ্রতিহত অগ্রগতিতে তার মনের সুখ এবং শান্তি চলে যাচ্ছিল—এবং তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, কিন্তু তার জীবনকে ভীষণ-ভাবে নাড়া দিয়ে গেল এই মন্বন্তর। একদিকে যেমন খাদ্যাভাবে মানুষের অসহায় ক্রন্দন তাকে ব্যথিত করে তুললো, অন্যদিকে মানুষের এই চরম

অবমাননায় সে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো কেমন করে কিভাবে এর থেকে সে এই ছিন্নমূল মানুষকে মুক্ত করবে, শোনাবে নতুন আশার বাণী।

অনেকেরই ছেলে, মেয়ে, বউ হারিয়ে শহরেব নরকে গিয়ে জড় হল, ভীড বাড়লো। নতুন স্লোগান এল শহরের কুখ্যাত অঞ্চলগুলোতে।

সুকান্ত চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। সমাজ সেবায় ঝাঁপিয়ে পডলো। কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গঠিত জনরক্ষা সমিতির একজন হয়ে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলো কি করে এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সাহায্য করবে। তাই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এই মানুষগুলোর মাঝে এসে কাজে নেমে পডলো। একদিকে যেমন নিরন্নের জন্য চেষ্টা করল অন্ন বিতরণের, তেমনই পাড়াব ছেলেদের এবং সংগঠনের সাহচর্যে বিপদগ্রস্ত শহরেব মানুষের জন্য চেষ্টা চললো কেমন করে তারা চাল, চিনি, কেরোসিন, কয়লা এ সবের যোগান পাবে। এতে তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। শরীরে না কুলালেও মনের জোরে তার এই অমানুষিক পরিশ্রম করা সম্ভব হল।

চাষা-সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে সুকান্ত যেন তাদের মূক মুখের ভাষা বুঝতে পারলো—অনুভব করতে পারলো তাদের অপমান, অসম্মান ও অন্তরের বেদনা। যারা সারা দেশকে জোগায় অন্ন, তারা শহরে এসে যেন দেখলো শহরের মানুষের হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা এবং চরম আত্মকেন্দ্রিকতা। এ অবহেলা এ বেদনা সুকান্তকে ব্যথিত করে তুলল।

এখান থেকেই সুকান্তর কবিতাগুলি যেন বাঁক নিল। কিছুটা ভাব-প্রবণতা এবং কিছুটা বাস্তবতা এই রকম একটা ধারায় সুকান্তর কবিতাগুলো যেন লেখা হচ্ছিল এত দিন। কিন্তু এবার সুকান্ত পেল নতুন পথের সন্ধান। মনে এলো দৃঢ়তা আর ভাষা হল স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ। এই সময়ে সুকান্ত তার জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছে। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচকরাও এক বাক্যে কবির রচনা 'বোধন' কবিতাকে স্বীকার করেছেন এ যুগের মহাকাব্য বলে।

সুকান্ত সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে, সতর্ক করেছে মালিক, মুনাফাখোর আর মজুতদারদের—

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হোল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ী,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।

আধুনিক কবিতা আমি বিশেষ পছন্দ করতুম না, কিন্তু এই সময়ে মনে আছে একদিন সুকান্ত আমায় নিজে মুখে পড়ে শুনিয়েছিল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বগত' কবিতাটি। 'গ্রাম উঠে গিয়েছে সহরে' কথাকটি আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে। সুকান্ত তখন শুধু এই মন্বন্তর নিয়ে এতখানি চিন্তিত এবং পীড়িত যে, সে সব সময়ে তার লেখায় এ ছাড়া যেন আর কোন কথা ছিল না। একটা গল্প লিখেছিল সে এ সময়ে। এক চাষী পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা ছিল মূল বিষয়বস্তু। এটাও আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল ওর নারকেলডাঙা মেন রোডের সেই ঘরে বসে। এ গল্পটা আমার এখনও মনে আছে; কিন্তু কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানি না।

সুকান্ত হতে চেয়েছিল জনগণের কবি। কাজে আর আচরণে সে জনতার মাঝে মিশে যেতে চেয়েছিল। চেয়েছিল সর্বহারাদের নিবিড় সান্নিধ্যে আসতে।

বাংলা দেশের ওপর দিয়ে মন্বন্তরের যে ঝড় বয়ে গেছলো তার প্রভাব বাংলার তৎকালীন সব সাহিত্যিক এবং কবির ওপরেও সুনিবিড় ছায়া ফেলেছিল, আলোড়ন এনেছিল তাঁদের মনে। তাই এ সময়ে তাঁদের বহুরচনা প্রকাশিত হয়েছিল দেশের এই আকালের ওপরে। "ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ" একটা কবিতা সংকলন প্রকাশের উদ্যোগী হয়ে কবি সুকান্তর ওপর সেটার সম্পাদনার ভার দেয়। নাম ছিল আকাল। মনে রাখতে হবে তখন সুকান্তর বয়স ১৬/১৭ বছর হবে। বয়সে

নবীন হলেও অভিজ্ঞতায় এবং রচনার বলিষ্ঠতায় সে এক প্রধান কবি। সুকান্ত এর ভূমিকায় অনেক কথার সঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলে ধরেছিল। তার নিজের মনের অন্তস্থলে যে কথা, যে বাসনা বারবার আলোড়ন তুলেছে সেই কথাই যেন উচ্চারিত হোল জনগণের কবির কণ্ঠে: 'বাংলা দেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব-অনাহার, পীড়া পীড়ন আর মৃত্যু-মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেদের মনে করেন দুর্গতজনের মুখপাত্র? তাঁদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত ?"

আর কেউ করুক বা না করুক সুকান্ত কিন্তু এগিয়ে গেছে এবং জনগণের কবি হিসাবে সমাদর পেয়েছে। পেয়েছে মহাকাব্য রচনার স্বীকৃতি।

তাই মন্বন্তরের পরে কৃষক-সমাজকে আবার আহ্বান দিয়েছে, গ্রামমুখো করতে চেয়েছে কবি। ফেলে আসা ঘরবাড়ী আর ফসলের ক্ষেতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আর একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছে সুকান্ত "শুধু প্রাণধারণের শুধু দিন যাপনের গ্লানি নয়"—নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে হবে, সঙ্গে থ করে দেশপ্রেমের মূল মন্ত্র আর কঠিন প্রতিরোধের প্রত্যাঘাতেব শপথ।

ছিন্নমূল নরনারীর এই সান্নিধ্য সুকান্তকে শুধু নতুন অভিজ্ঞতায় এবং বেদনায় সিঞ্চিত করে নি—কবির মনে এই নিরন্নেরা স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তাই পরবর্তী জীবনেও এইসব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখের ভাষা সুকান্তব কবিতায় স্থান করে নিয়েছে; যুদ্ধ, বন্যা, ঝড, মন্বন্তর, পরাধীনতা —আর মানবতার মৃত্যু—এ যেন এক দুঃস্বপ্ন যার থেকে মুক্তি চাইলেও মুক্তি পাওয়া যায় না বা যাবে না। তা ছাড়া এতো এক অভিজ্ঞতার নতুন ফসল। এর মূল্য বা স্বীকৃতি না দিয়ে কবির পালাবার পথ কোথায়।

অকারণ মৃত্যু আর পরাধীনতা, এই যুদ্ধ আর মন্বন্তর সবে মিলে কবি সুকান্তর মনকে কঠিন পীড়নে পীড়িত করে তুলেছিল অহর্নিশি। তাই তার রচনায় এদের না ভুলে থেকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াই কবির পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' সে ঘোষণা করেছিল:

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।'

রবীন্দ্রনাথ যেমন দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে সকলের সাথে অন্নপানে সমাজের উঁচু এবং নিচু অর্থাৎ এক কথায় জাতিভেদ প্রথার অবসান ঘটবে বলে অনুমান করেছিলেন, কবি সুকান্তও তেমনই দুর্ভিক্ষের অবস্থাটাকে সকলের, বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের মিলনের পটভূমি হিসাবে দেখেছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ এবং বালিষ্ঠ দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ জনতার কবি এর মধ্যে একটা বাড়তি জিনিসের সন্ধান পেয়েছিল সে হল মুক্তির সন্ধান। মানুষকে তাই শিক্ষা দিয়েছিল, কবি 'ঐতিহাসিক' কবিতায় লিখেছিল :

'একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।
মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে : কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার।

লাইনে দাঁড়ানো আয়ত্ত করেছে যারা,
সোভিয়েট, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স
রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি
সব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।
এখনো এই লাইনে অনেকে প্রতীক্ষমান,
প্রার্থী অনেক ; কিন্তু পরিমিত মুক্তি।
হয়ত এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পাবে—
একথা ঘোষণা করে দ ও তোমাদের দেশময় প্রতিবেশীর কাছে।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।
আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরা হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরী।'

৩৩

যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৫-এর শুরুতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তিকথার বিবরণ খবরের কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকলো। জনসাধারণ তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্বময় স্বাধীনতা প্রচেষ্টার গৌরবময় কথা জানতে পারলো। এর আগেই জাপানের বেতারযন্ত্র থেকে সুভাষচন্দ্র বসু দেশবাসীকে তৈরী থাকবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন তিনি নিজে আসছেন সসৈন্যে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে। কিন্তু জনসাধারণ তখন ঠিকমত বিশ্বাস করে নি মনে, বিশেষ যেন সংশয় ছিল। এটাকে বিদেশী রাষ্ট্রের এক প্রচার হিসেবেই সন্দেহ করেছে। নতুন খবরে সারা দেশে আলোড়ন উঠলো ; যে সব ভাড়াটে সৈনিক বিদেশী শাসকের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে বন্দী হয়েছিল শত্রুসেনার হাতে তারাই আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে রাতারাতি সারা দেশের সামনে বীর আর স্বাধীনতার মুক্তিসংগ্রামী বলে চিহ্নিত হল। এখানে তারা

তখন আর সাধারণ সৈনিক নয়, দেশমুক্তির অগ্রদূত হিসেবেই স্বীকৃত হল। এর প্রভাব ভারতের সৈন্যবাহিনীর ওপরও পড়লো। ফলে পরবর্তীকালে নৌ-বিদ্রোহের গৌরবময় ঘটনার সৃষ্টি হল এবং দেশের স্বাধীনতা হল ত্বরান্বিত। আমাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় সুকান্তও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কথা স্বীকার করেছিল। আমার ধারণা কম্যুনিস্ট পার্টির এ মুক্তি সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিতে আদর্শগত বাধা ছিল। নচেৎ তাদের যুদ্ধ-চলাকালীন আন্দোলন হয়ত ভুল বলে প্রতিপন্ন হতে পারত। কিন্তু যারা যুদ্ধকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকাতে সংশয় প্রকাশ করেছে বিশেষ করে কম্যুনিস্ট পার্টিকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছে, তাদের জন্য একনিষ্ঠ কম্যুনিস্ট সুকান্তর জবাব ছিল নীচের কবিতায় :

দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানলাম।
জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যা সত্যের টুঁটি চেপে,

* * *

যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,

* * *

কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততোদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।

কিন্তু তাই বলে ১৯৪৫-এর রসিদ আলী দিবসের লড়াইয়ে সুকান্ত পিছিয়ে ছিল না বরং সক্রিয়ভাবেই এতে যোগ দিয়েছিল। আরও একটা ব্যাপারে

সুকান্ত এই আন্দোলনের সামিল হতে চেয়েছিল তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজনে। কারণ শাসক সব সময়েই চেয়েছে এই দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ। এ লড়াই-এর ফলও হয়েছিল মারাত্মক। গত যুদ্ধের প্রত্যেক রণাঙ্গন থেকে পিছু হটা ইংরেজ এ লড়াই থেকেও সসম্মানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। মুক্ত হলেন রসিদ আলী। জয় ঘোষিত হল জনগণের, খুশী হল আমার বন্ধু সুকান্ত। আমাদের লেখা উপন্যাসেও এই ঘটনাকে সুকান্ত নিয়ে এসেছিল, কারণ আগেই কথা ছিল চলতি ঘটনা আমাদের উপন্যাসে স্থান পাবে।

যাই হোক, সুকান্ত এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু না লিখলেও স্বাধীনতাই যে তার কাম্য, এটাই চরম সত্য—

> 'ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
> আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশভূমি,'

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়লো। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলকাতায় তখন ঘনঘন বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে, সম্ভবত এই রসিদ আলী দিবস উপলক্ষেই যখন কলকাতায় স্বাভাবিক জীবন স্তব্ধ হয়ে গেছে আন্দোলনের তীব্রতায় তখন একখানা সাইকেল জোগাড় করে নিয়ে বড় রাস্তা, যেখানে নিয়মিত গুলি চলছে সেপথ বাঁচিয়ে অলিগলি দিয়ে দিন দুই অফিসে হাজির হয়েছিলাম। প্রথম দিনে অফিসে উপস্থিতির সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে, অফিসের কর্তৃপক্ষ আমাদের একদিনের বাড়তি মাইনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে দিয়েছিল অর্ধদিবসের মাইনে। আমাদের কাছে এ প্রাপ্তি ছিল আন্তরিকতার পুরস্কার। কিন্তু সুকান্তকে যখন এই গল্প করলাম ও তখন বললো কর্তৃপক্ষ ঘুস দিয়ে কাজকারবার চালু রাখতে চাইছে। কথাটা তখন আমার ভাল লাগে নি। বর্তমানে যেন মনে হয় কথাটার গুরুত্ব কিছুটা বুঝেছি।

১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে আমরা একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করি। মূল পরিকল্পনা আমার তবে এ ব্যাপারে সুকান্তর আগ্রহ এবং উৎসাহ অনেক-খানি ছিল। প্রথমে আমরা তিনজন—সুকান্ত, আমি আর খোকন শুরু করেছিলাম। পরে অরুণাচল বসু এসে যোগ দিয়েছিল।

এ রকম স্থির হয়েছিল যে, যার যখন লেখবার পালা, সে তার অংশ লিখে রাখবে এবং প্রতি শনিবারে আমাদের পালা করে বৈঠক হবে সে বারের লেখকের বাড়ী। তার বাড়ীতে বাকী দুজন শনিবার সন্ধ্যায় জড়ো হবে। তার লেখার অংশ সে পড়ে শোনাবে এবং কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত করবে। তারপরে উপন্যাসের অংশ পড়া হলে, জলযোগ সেরে সেই অঞ্চলে একটু বেড়ান হবে। এর পরে পরবর্তী বারের লেখক খাতাখানা নিয়ে চলে যাবে, পরের শনিবার আবার বাকী দুজন তার বাড়ী হাজির হবে। এই রকম চলবে পালা করে। আমি একটু ভোজনবিলাসী বলেই জলযোগের আয়োজন। এ আসরের প্রথম নাম দেওয়া হয়েছিল শনিবারের বৈঠক। কিন্তু এ রকমের নাম আরো থাকায়—সুকান্ত নাম পরিবর্তন করে দিল—ত্রিভুজের আসর। এর কিছুদিন পরে অরুণাচল বসু এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, তখন সুকান্ত আসরের নতুন নামকরণ করে চতুর্ভুজের বৈঠক।

ব্যাপারটা মন্দ চলছিল না। সুকান্ত থাকত নারকেলডাঙায়, আমি বাগবাজারে, খোকন বালীগঞ্জে আর অরুণ বেলেঘাটায়। তাই বেড়াবার বৈচিত্র্য ছিল ঠিকই। কারণ যে শনিবারে যার বাড়ী বাকী তিনজন হাজির হব সে তিন জনের সে অঞ্চলে বেড়ান হবে।

উপন্যাসের ব্যাপারে এরকম স্থির হয়েছিল যে, লেখার ব্যাপারে সবার থাকবে অবাধ স্বাধীনতা—কি নতুন চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি ঘটনার চমকসৃষ্টিতে, তবে একটা কথা, বিনা প্রয়োজনে যেন সমস্যার সৃষ্টি না করা হয়। সমসাময়িক ঘটনাগুলো উপন্যাসে আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে।

লেখা শুরু হল, সুকান্তই শুরু করল। যতদূর মনে পড়ে এই ভাবে ও শুরু করেছিল—"সবে বসন্তের শুরু। বস্তির কৃষ্ণচূড়া গাছগুলিতে আগুনের পরশ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ললিতা তার ছাগলকে খোঁটা মুক্ত করতে এসে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির নতুন অঙ্গসজ্জা লক্ষ করে।"

সুকান্তর সৃষ্ট নায়ক ছিল সনাতন, কলেজের প্রথম-বার্ষিক ছাত্র, আর নায়িকা অল্পশিক্ষিতা ললিতা—দুজনেরই বাস বস্তিতে। সনাতনের বাবা কাজ করেন কারখানায়। সন্ধ্যা বেলা যথারীতি দেশী মদ্যপান করে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে ঠেঙান। এই ভাবেই চলছিল।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং চমক সৃষ্টিতে উন্মাদনায় আমরা একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম আর উপন্যাসখানা বিনা বাধায় অনুকূল বায়ে এগিয়ে চলছিল দ্রুত গতিতে।

এ ব্যাপারে সুকান্তর নিষ্ঠা ছিল সবার ওপরে। ও চাইত সবাই যেন ঠিক মত কাজ এগিয়ে নিয়ে চলে। এর আগে আমরা কেউ এ ধরনের লেখায় অভ্যস্ত নই। তাই আমাদের কিছুটা সংকোচ আসত। 'কষ্ট ভরসা পেতুম কবির কাছে—"এখন তোরা লিখে চল। সময়মত দেখেশুনে মেজেঘসে একটা ছক দেওয়া যাবে।"

গোলমাল দেখা দিল অরুণকে নিয়ে। কারণ তার মধ্যে দেখা গেল একাগ্রতার অভাব, সময়মত বৈঠকে হাজির হয় না। নিজের লেখা শেষ না করে ফেলে রেখে দেয়। এমনি সব কারণে বারবার বাধা পড়তে থাকে। শেষে একদিন সুকান্তকে বললুম—যদি অরুণের এ ব্যাপারে আগ্রহ না থাকে তবে ওকে বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ও এককথায় অরুণকে সোজা নাকচ করে দেয়। আমাকে চিঠিতে জানায় যে আমার বাসনা অনুসারে ও অরুণকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে। পরে অবশ্য অরুণের অনুরোধে এবং তার রীতিনীতি মেনে চলার প্রতিশ্রুতিতে তাকে আবার দলে নেওয়া হয়। এক সময়ে 'ঘেলু'কেও লেখার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর এর মধ্যে যোগ দেয় নি। সুকান্তর কয়েকটি চিঠির অংশ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমাদের চতুর্ভুজের বৈঠকের এবং উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

"আমাদের উপন্যাসটা চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল এবং সেজন্যে আমাদের তিন জনের অভিশাপ যদি কেউ পায় তো সে অরুণাচল বসুই পাবে। সে যদি জোর করে ত্রিভুজের মধ্যে মাথা না গলাতো তা হলে এমনটি হত না। তোর বদলে ......কে লিখতে দেওয়া হয়েছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তিন সপ্তাহ আগে তাকে খাতা দেওয়ার পর আর্জো সে কিছুই লেখে নি এবং বোধ হয় খাতাও ফেরৎ দেয় নি ভূপেনকে। তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে আমায় পাগল করে রেখেছিল, দেখা হলে কৈফিয়ৎ দিল: আমার আশ্রয় নেই তাই লিখতে পারি নি, গৃহহীন আমি Advance অফিসেই রাত্তির কাটাই......" (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

"....আজ দুপুরে আমাদের উপন্যাসখানা শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিলুম—তোর অংশটুকুর ওরা খুব প্রশংসা করল, আমি এখনও হাত দিই নি, এর পরের পরিচ্ছেদ লিখছে ঘেলু (রমেন) ...." (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

"তাছাড়া শনিবার তোর বাড়ীতে 'চতুর্ভুজ' বৈঠকের কথা ছিল। সেটা আমার বাড়ীতেই হবে। আমি নিরুপায়। ভূপেনকে সেই অনুরোধ জানিয়েই আজ চিঠি দেব। আশা করছি, তুই আমার অবস্থাটা বুঝবি।" (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

সুকান্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ ব্যবস্থাটা হয়েছিল।

একবার অরুণের বেলেঘাটা মেন রোডের বাড়ীতে আমাদের চতুর্ভুজের আসর বসেছে, এমন সময়ে এসে হাজির সুকান্তর কিছু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব। তারা আমাদের উপন্যাসের কথা শুনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করল, কারণ সুকান্তর লেখাও এর মধ্যে রয়েছে। শেষে স্থির হল সুকান্ত পড়ে শোনাবে গোড়া থেকে যাতে তারা আমাদের উপন্যাস সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারে। সেদিন চমকিত বিস্ময়ে দেখলাম সুকান্তকে নবরূপে। ও যে এত ভালো পাঠক তা এতদিন আমাদের কাছে অজানা ছিল। গোড়া থেকে সে পড়ে গেলো উপন্যাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ। কখনও উচ্চ গ্রামে কখনও বা মৃদুসুরে। কথোপকথনগুলো যথারীতি বাচনিক ভঙ্গিতে। চরিত্রগুলো আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে গেল। সুকান্তের লেখা বরাবরই সুন্দর হচ্ছিল, কিন্তু ওর পাঠের গুণে

আমাদের লেখা পরিচ্ছেদগুলোও আমাদের কাছে নতুন রূপে হাজির হলো। মনে হলো মন্দ লিখি নি তো! এই শ্রোতাদের মধ্যে অরুণাচলের মাতা সরলা দেবীও ছিলেন। সবাই প্রশংসা করলেন এবং সুকান্তকে বললেন তাড়াতাড়ি লেখার কাজ সেরে যেন এটাকে প্রকাশ করা হয়।

উপন্যাসখানা শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালের শুরুতে। প্রায় তিনখানা বড় মোটা ফুলস্কেপ মাপের খাতা শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময় শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বেলেঘাটায় বা নারকেলডাঙায় যাওয়া তখন হয়ে উঠলো বিপদজনক। তাই যোগাযোগের অভাবে বেশ কিছুকাল লেখা আমাদের বন্ধ হল। সুকান্ত দুঃখ করে আমায় লিখল—'আমাদের উপন্যাসখানা দাঙ্গায় নিহত হল। তোরা নিশ্চয়ই এত খোকা নস যে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল ডিঙিয়ে বেলেঘাটায় বা নারকেলডাঙায় আসবি উপন্যাস চালাবার তাগিদে।" কথাটা সত্য। আমরা ওদিকে যেতে মনে মনে ভয় পেতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুকান্ত অকুতোভয়ে রাতবেরাতে ঘোরাফেরা করতে লাগলো কলকাতার পশ্চিম, দাক্ষণ আর উত্তর প্রান্তে।

আমি অবশ্য সান্ত্বনা দিয়েছিলাম সুকান্তকে—ভয় নেই কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক হলেই আবার আমরা লেখা চালিয়ে যাব।

কিন্তু এরপরে উপন্যাসের অগ্রগতি বিশেষ হয় নি, কারণ এর পরের ইতিহাস বড়ই করুণ এবং উদ্বেগের। সুকান্ত ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। আর পেছতে লাগলো আমাদের পরবর্তী বৈঠকের তারিখ। এর ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য কাজ আরও খানিকটা এগুলো। কিন্তু তার পরেই সুকান্ত হয়ে পড়ল একেবারে শয্যাশায়ী—ফলে লেখার গতি হলো স্তব্ধ। তারপর একদিন সে চলে গেল। উপন্যাসখানা রইল অসমাপ্ত।

যখন উপন্যাসখানা নিয়মিত লেখা হচ্ছিল তখন আমরা মাঝে মাঝে এর বিভিন্ন চরিত্রগুলি নিয়ে নানারকম আলোচনা করতাম। কখনও প্রাধান্য পেত ললিতা, সনাতন অথবা খলনায়ক বিজয়। আবার কখনও বা আমরা ললিতার ছাগলটিকে নিয়েও কৌতুককর আলোচনা করতাম। এ যেন আমাদের একটা বিলাস হয়ে দেখা দিয়েছিল। মাঝে মাঝে আমরা কল্পনা করতাম এবং একের কল্পনা অপরের কাছে প্রকাশ করতাম যে আমাদের

উপন্যাসখানা চিত্ররূপ দিলে কেমন হয়। তখন অসিতবরণ চিত্রজগতে উঠতি নায়ক। তাই তাকেই নায়ক সনাতনের ভূমিকায় মানাবে ভাল, সুকান্তর এই প্রস্তাব আমরা এক বাক্যে মেনে নিয়েছিলাম। নায়িকার ব্যাপারে আমরা কিছুতেই যেন একমত হতে পারছিলাম না। আমরা আমাদের পছন্দের ব্যাপারে আপোষহীন ছিলাম। আজ ভাবলে অবাক লাগে, আমরা কত সময়ে নিষ্ফল অথচ উত্তেজক আলোচনায় সময় নষ্ট করেছি। যেন সত্যই আমরা এ উপন্যাস শেষ করে ফেলেছি এবং তার চিত্ররূপ দেওয়ার আয়োজনে মেতেছি। আর আশ্চর্য কবি সুকান্ত এ-সব আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহভরে এবং উৎসাহসহকারে যোগ দিত।

সুকান্তর মৃত্যুর পরে আমরা আলোচনা করে স্থির করলাম যে, ঐ উপন্যাসখানা শেষ পরিচ্ছেদের আগের অংশে শেষ করে দিলে খুব বেমানান হয় না। অগত্যা সেই রকম ব্যবস্থা হলো। অরুণাচল বসু সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করায় তিনিও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে খাতাগুলি দেখতে চাইলেন। বললেন তিনি দেখেশুনে দরকার মত পরিবর্তন করে ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ সুকান্তর গদ্য লেখার প্রতি সবারই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

অরুণ যখন এই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলো, আমি পরম আগ্রহে শেষ তিনখানা খাতা ওর হাতে তুলে দিলাম। প্রথম খাতাখানা কাকে যে পড়তে দিয়েছিলাম তা আর মনে করতে পারলাম না। তাই প্রথম খাতার পরিচ্ছেদগুলোর জন্য একটা পূর্বানুবর্তী লিখে দিলাম মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কাজের সুবিধার জন্য।

ইতিমধ্যে দেশের স্বাধীনতা এসেছে এবং দেশ হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত।

কিছুকাল বাদে অরুণ এসে আমায় জানাল দুঃখের সংবাদ। দেশের বাড়ীতে পূর্ববঙ্গে সে গিয়েছিল। নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গায় ও পালিয়ে এসেছে এখানে। সঙ্গে ছিল উপন্যাসের খাতাগুলো, সেগুলো তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছিল। তাই চিরতরে হারিয়ে গেল আমাদের উপন্যাসখানা— সুকান্তর পরম আগ্রহের বস্তু, একটা সুন্দর প্রচেষ্টা—কবি এবং তার অসাহিত্যিক বন্ধুদের সমবেত সাহিত্য সাধনা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আগের একটা দুঃখের কথা। সুকান্তর মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় নতেদা আমার কাছে এসে জানতে চাইলো সুকান্তর কোন রচনা বা চিঠিপত্র আমার কাছে আছে কিনা কারণ তার কবিবন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখতে চান।

আমি বার করে দিলাম সুকান্তর লেখা অমূল্য, অসংখ্য পত্ররাজি। যদিও কলকাতায় আমরা থাকতাম, তবু ওকে আমি প্রতিনিয়ত চিঠি লিখতাম। কারণ তার জবাবে আমি উপহার পেতাম ওর অনবদ্য ভাষায় লেখা চিঠি-গুলো। এ যেন খুঁচিয়ে ওর সাহিত্য প্রতিভাকে উস্‌কে দেওয়া—পান্থপাদপ গাছের গোড়ায় খোঁচা দিলে যেমন মরুতে মেলে তৃষ্ণার জল আমার এ প্রচেষ্টাও অনেকটা সেই রকম। তাই যত না চিঠি ওকে লিখেছি ওর কাছে চিঠি পেয়েছি তার বহুগুণ। তাই পোস্ট কার্ডে লেখা চিঠিগুলো ফেলে রেখে নতেদা নিয়ে গেল বাকি সমস্ত চিঠি-পত্র; সুকান্তর লেখা সুন্দর সাহিত্যরাজি।

যতদূর মনে পড়ে কবির মৃত্যুর পরের রবিবার স্বাধীনতা কাগজের প্রথম পাতায় মৃত্যুশয্যায় সুকান্তর একখানা ছবি ছাপা হলো আর তার তলায় দেখলাম ছাপা হয়েছে সুকান্তর আমাকে লেখা কবিতার চিঠি 'দেওয়ালি'।

সংকোচবশে বহুকাল নতেদার কাছে এ সব চিঠিপত্রের কথা বলতে পারি নি। লজ্জা হয়েছে, নতেদা কি মনে করবে কারণ সুকান্তর রচনাব প্রতি আমার চেয়ে তার আগ্রহ কোন অংশে কম নয় বরং অনেক বেশী। তাই নতেদা চিঠিগুলোর সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে। যাই হোক, প্রায় বছর-খানেক বাদে লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে তাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবায় জবাব পেলাম—ওগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে তা ঠিক তার মনে পড়ছে না।

হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল। প্রথমে গেল উপন্যাসখানা তারপরে গেল সুকান্তব লেখা সুন্দর পত্র-সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ। মনে মনে ধিক্কার দিলাম নিজেকে। বুঝলাম, সুকান্তর উপন্যাস রচনার সঙ্গে বাংলা-দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর পরিচয় আর হলো না। দুর্ভাগ্য আমার, দুর্ভাগ্য কবির। দুর্ভাগ্য বাংলা সাহিত্যের।

এরপরে হারিয়ে গেল বিদুরের ক্ষুদ-কুড়ো সুকান্তর পোস্ট কার্ডের

চিঠিগুলো। সুকান্তর কবিতার বইগুলো প্রকাশিত হতে লাগলো একের পর এক, আর কবির জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলল দ্রুতগতিতে।

অনুসন্ধানী দল বেড়িয়ে পড়ল সুকান্তর সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহে। কোথায় থাকতেন এই কবি, কে তার আছে। বন্ধুবান্ধবই বা কোথায়? কখনও কোন Club বা সংগঠন, কখনও সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্যিক বা অন্যান্যরা। সবার আগ্রহ, জানতে হবে বেশী করে, জানতে হবে কবির কথা তার ব্যক্তিগত জীবন কথা, তার চিঠি-পত্র, তার অপ্রকাশিত রচনাবলী। এঁদেরই প্রেরণায় বা আগ্রহে—পোস্ট কার্ডগুলি বিলিয়ে দিলাম প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তারা এগুলো দেখেশুনে পড়ে, প্রকাশ করে অথবা এর থেকে নোট নিয়ে আবার ফেরৎ দিয়ে যাবে যথা সময়ে"।

এগুলোও তাই স্বাভাবিক নিয়মে হারিয়ে গেল। রয়ে গেল মাত্র দু'একটি যা ব্যক্তিগত কথার জন্যে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ধন্যবাদ। আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার দেশের তরফ থেকে। ধন্যবাদ জানাই সুকান্তর অনুজ প্রশান্ত ভট্টাচার্য আর মেজবৌদি রাণী দেবীকে। খোঁজ পাওয়া গেল আমাকে লেখা সুকান্তর কয়েকখানা চিঠির। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল মেজবৌদিকে লেখা সুকান্তর আরও কয়েকখানা হারিয়ে যাওয়া চিঠি। এ সব পাওয়া গেল আমার পিসীমার বাড়ীর একটা পুরানো ভাঙাবাক্সের মধ্যে। কেউ হয়ত রেখে দিয়েছিল, পরে ভুলে গেছে। আমি বিস্ময়ে উল্লসিত, আনন্দে বিহ্বল।

বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। আমাদের উপন্যাসের হারিয়ে যাওয়া প্রথম খাতাখানাও ওরা সেখান থেকে উদ্ধার করেছে। আনন্দে অধীর হলাম। মনে পড়ল মেজবৌদিকে উপন্যাসের প্রথম খাতাখানা পড়তে দিয়েছিলাম। আবার পড়তে শুরু করলাম উপন্যাসখানার প্রথম পাতা খুলে—সুকান্তর পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট হাতের লেখার অক্ষরগুলো যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দিল আমার চোখের সামনে—হারিয়ে যাওয়া কত না স্মৃতি আমাকে উদ্বেল করে তুললো কারণ সুকান্তর মৃত্যুর পরে তখন বার-তেরো বছর কেটে গেছে। লেখা শুরু করেছে সুকান্ত—"সবে বসন্তের শুরু। বস্তীর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলিতে আগুনের পরশ......"

বহুদিন থেকেই মনে মনে বাসনা সুকান্তর জীবনকথা আমি লিখবো। সেই লেখায় থাকবে আর সব কিছুর সঙ্গে সুকান্তর লেখা উপন্যাসের পরিচ্ছদগুলো। তাই অশোক আর বিভাস যখন আমায় আমাদের হারিয়ে যাওয়া উপন্যাসের খাতাখানা ফেরৎ দিল, তখন আমি যত্ন করে বাড়ীতে রেখে দিলাম। কাজে লাগাব, সময়মত কাজে লাগাব।

কিন্তু সময়মতঃ কাজে লাগান হল কোথায়? বাড়ী বদলের হিড়িকে খাতাখানা আবার হারিয়ে গেল। কখন যে অসাবধান হয়েছিলাম, তা আর আজ মনে পড়ে না। এবারে আর কেউ নয়, আমি—আমিই দায়ী এ অসাবধানতার জন্য। এর আগে আমি অরুণাচলকে, নতেদাকে দোষী করে মনে মনে আত্মবঞ্চনা করেছিলাম—এ তারই ফল। এ খাতাখানাও একবারমাত্র আমায় দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে গেল কোন অজানায় তা জানি না। কিন্তু সারাজীবনের জন্য আমার মনে থাকলো পুত্রশোকের মত গভীর ক্ষত।

আমার চেয়ে বিভাস আর অশোক কম দুঃখিত নয়। ওরা আপশোষ করে, যদি যত্ন করে ওরা নিজেদের কাছে রাখতে পারতো তবে এমন একটা দুঃখ সইতে হত না।

মন্দের ভাল সুকান্তর আমাকে লেখা অন্তত দু'একটা চিঠি ত' আছে।

৩৫

মহাযুদ্ধের অবসানে দেশের সাধারণ নির্বাচনে বৃটেনে চার্চিল এবং তার রক্ষণশীল দল পরাজিত হলো। শ্রমিকদলের এটলি জিতলেন, এলেন সদলে মন্ত্রীসভায়। তিনি এসেই শুরু করলেন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার চেষ্টা। সে চেষ্টা যে এমন মারাত্মক হবে, এবং তার রান্না, দেশের স্বাধীনতার ব্যঞ্জন যে এমন তিক্ত, কসায়, কটু অখাদ্য হবে তা অবশ্য বুঝি নি তখন। সারা দেশ জুড়ে তখন ঘন ঘন বৈঠক, শলাপরামর্শ স্বাধীনতার আগের অস্থিরতা।

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান" ধ্বনি হয়ত আজও

কারু কারুর মনে উজ্জ্বল স্মৃতিরূপে জাগরিত রয়েছে। এ ধ্বনি তুলেছিলেন কায়েদে আজম জিন্না—তাঁর মুসলীমদের জন্য ভারতের বুকে স্বতন্ত্র বাসস্থান চাই। প্রথম দিকে লোকে এ চাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। অবাস্তব পরিকল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও প্রথম প্রথম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি বিশেষ আমোল পায় নি।

বাংলাদেশে তখন মুসলীম লীগের শাসন চলছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার করার জন্য Direct action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হিসাবে নির্দিষ্ট হল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট আর স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট হল মুসলীম লীগ শাসিত বাংলাদেশ। যে কোন কারণেই হোক এই দিনটাকে সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল বাংলা সরকারের তরফ থেকে।

সন্ধ্যার পূর্বে শুরু হয়ে গেল সেই অপ্রত্যাশিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কার বিরুদ্ধে এই লড়াই? জানি না। কিন্তু শুরু হয়ে গেল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। এত বড় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেশে এর আগে আর কখনও হয়েছে কিনা কেউ বলতে পারলো না। মুসলমান পাড়ায় হিন্দুদের খুন করা হোল, পুড়িয়ে দেওয়া হলো তাদের বাড়ীঘর, লুটপাঠ হলো দোকানপাট, নষ্ট করা হল মেয়েদের সম্ভ্রম। তেমনই আবার হিন্দু পাড়ায় ঘটলো ঠিক একই জিনিস। একজনকে ধরে বহুর পাড়ন এবং হত্যার লালায় এই দুই সম্প্রদায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। শুধু রক্তপাত আর খুন। পীড়িতের অত্যাচারিতের হাহাকারে আকাশ বাতাস মুখরিত। মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষ নেমেছে আদিম প্রবৃত্তিতে। রক্তের নেশায় পাগল। কে বাধা দেবে আর কে বোঝাবে এ রক্তপাত নিরর্থক, কারুর কোন মঙ্গল এতে হবে না। হতে পারে না। যে দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করেছে গত কয়েকশ' বছর, রাতারাতি তারা কেমন করে একে অপরের এত বড় শত্রু হয়ে গেল আমার মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এই প্রশ্ন পাক খেতে লাগলো। জবাব খুঁজে পেলাম না। এখন যেমন যে কোন অছিলায় একদল লোক বীরের মত (?) একজনকে বা দু-জনকে পিটিয়ে মারছে এবং অবস্থাটা কতকটা সহ্য হয়ে গেছে আমাদের ১৯৪৬ সালের উত্তর দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু

এরকম একটা হানাহানি আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। মানুষের মন তখন ছিল অনেক নরম আর সংবেদনশীল, একে অপরের দুঃখ ব্যথায় সমব্যথী ছিল। তাই '৪৬ সালের দাঙ্গা এক অতি বড় দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে অনেকের মনে আজও বেঁচে আছে।

দশ দিন একটানা এই নারকীয় হিংসার প্রেতনৃত্য চলেছিল সারা কলকাতা জুড়ে। দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল ট্রামবাস, ট্রেন—শহর জীবনের ধমনীতে রক্ত চলাচল। শুধু চলেছিলো নাটকীয় তাণ্ডব, খুন-খারাবি হত্যা, ধ্বংস লুটপাট আর বহ্ন্যুৎসবের বিশাল আয়োজন। আজও ভাবলে অবাক লাগে মানুষ কোথা থেকে পেলো এই পৈশাচিক হিংসাপ্রবৃত্তি আর আক্রোশ। কাল যার সঙ্গে কথা বলেছে, গল্প করেছে টুকরো টুকরো রসিকতায় একে অপরের চক্ষু আর হৃদয় নাচিয়েছে, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কি করে তারই বুকে মারতে পারলে ছুরি। করতে পারল তার জীবনের সর্বস্ব অপহরণ।

সারা কলকাতার এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের বিশেষ কোন যোগাযোগ হল না এই দশদিন। আমাদের মত নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ছিল না টেলিফোনের ছড়াছড়ি তাই এক অংশের লোক অপর অংশের খবর জানতে পারলো না। কোথায় কে রইল, বাঁচল কি মরল তাও রইল অজানা। সকলেই শুধু হিসাব করছে, হিন্দুরা ভাবছে মুসলমান পাড়ায় তাদের আত্মীয় স্বজন কে আছে, অপরদিকে মুসলমানের ও তেমান চিন্তা করছে হিন্দু পাড়ায় তাদের কে আছে।

সুকান্তর এবং তার অন্যান্য ভাইদের বাস নারকেলডাঙা মেন রোডের সেই বাড়ীতে যার পূর্বদিকে ফুলবাগানে বিরাট মুসলমান বস্তি আর পশ্চিমদিকে রাজাবাজারেও তাই। তাই সুকান্তর খবরের জন্য আমরা ছিলাম উদ্বিগ্ন। আমরা অবশ্য হিন্দু পাড়ার যেন দুর্গের মধ্যেই বাস করছিলাম। তাই আমাদের সম্বন্ধে নারকেলডাঙার লোকদের চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল না।

এই হানাহানি, দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যেও দু'একটি আশার আলোক বা সুস্থ ঘটনার নজির পাওয়া গেল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের বিপদগ্রস্ত পরিবারকে গোপনে আশ্রয়

দান করেছিলেন কেউ কেউ। তাঁরা মত্ত হয়ে যান নি এই খুনের নেশায়, মনুষ্যত্ববোধ তখনও তাঁদের মধ্যে ছিল পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। নিজচক্ষে খুনের ঘটনা দেখার পাপ অবশ্য আমাকে করতে হয় নি, কারণ পাড়া ছেড়ে বেরোবার কথাও তখন কেউ কদিন ভাবতে পারে নি।

পাড়ায় পাডায় প্রতিরোধ-বাহিনী গডে উঠেছিল যাতে যুবকেরাই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। দিনটা কোনমতে কাটলেও রাত্রের স্মৃতিগুলো আজও স্পষ্ট রয়েছে। দেখতাম দূরে আগুনের লেলিহান শিখা, আর মাঝে মাঝে একদিকে 'আল্লাহো আকবর' অপরদিকে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি।

অনেক নিষ্ঠুরতার কাহিনী কানে আসছিল। গুজবে সারাদেশ ভবে গিয়েছিল, কাগজে কিছু কিছু খবর বেরোত যাতে প্রতিহিংসাব আগুন আরার জ্বলে উঠতো। প্রথমে পুলিশ চেষ্টা করছিল শান্তি ফিরিয়ে আনবার এবং দাঙ্গা দমন করবাব। কিন্তু পুলিশের মধ্যেও উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তখন যেন শূন্যেব কোঠায় নেমে গেছে, তাই বিশেষ কাজ হলো না। শেষে আসলো মিলিটারী এবং তার সঙ্গে কার্ফিউ, মিলিটারীর ভারী বুটের আওয়াজ আর মার্শাল ল। আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল এই নিরর্থক হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গা কিন্তু তার জের হিসাবে রেখে গেল দুষ্ট ক্ষতের মত প্রতিহিংসাপরায়ণতা সারা দেশের এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপরে। কাবণ এর পরেই শুরু হল সমস্ত দেশ জুড়ে কখনও পূবে, কখনও উত্তর-পশ্চিমে একের পর এক দাঙ্গা। একটার জের কাটতে না কাটতেই আর একটার শুরু। কলকাতার দাঙ্গাও ঘুসঘুসে জ্বরের মত চলতে লাগলো। রোগ বড কঠিন, নিরাময় হওয়া শক্ত।

যাই হোক, দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার দিন পনের বাদে সুকান্তর সঙ্গে আবার দেখা হল, আমি অবশ্য যাই নি। ওই এসেছিল আমাদের সন্ধানে। কারণ ওর আছে দুর্জয় সাহস, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় মন। তাছাড়া মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তাই বিপজ্জনক এলাকাগুলো পারাপার করতে ও ভয় পেত না।

কলকাতার এই ঘটনার জের হিসাবে বা প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে শুরু

হয়ে গেল নোয়াখালির সেই প্রচণ্ড দাঙ্গা। সেই ভয়াবহ ঘটনা দেশের রাজনীতিবিদদের এবং অন্যান্য বহুলোকের মনকে আলোড়িত করেছিল। যে স্বাধীনতা আসছিল তার স্বাদ কেমন হবে, তার যেন একটা মোটামুটি আভাস তখন বাংলাদেশের মানুষেরা যারা জন্মাবধি স্বাধীনতার লড়াই করে, তারা অনুভব করতে পারছিল। গান্ধীজী ছুটে গেলেন নোয়াখালি, শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় এবং মানুষকে এই হানাহানির নিরর্থকতা বোঝাতে।

একটা মারাত্মক মনোভাব শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মনকে আচ্ছন্ন করে তুললো। তারা যেন এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে দেশবিভাগ মনের অতি সঙ্গোপনে মেনে নিয়েছিল, বাইরে প্রকাশ করবার মত সৎসাহস তখনও অবশ্য সঞ্চয় করে উঠতে পারে নি। যারা অতি সাবধানী এবং পলায়নকুশলী তারা ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় আসতে আরম্ভ করলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই। তাই পাকিস্তানের প্রতিমা-গড়া হয়ে গেল, বাকি শুধু তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

যতদূর মনে পড়ে অমৃতবাজার পত্রিকা এই ব্যাপারে একটা জনমত যাচাইয়ের পরিকল্পনা করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় হিন্দু সমাজকে হ্যাঁ কি না বলতে ডাক দিয়েছিল। শিক্ষিত হিন্দুদের মনের গোপন কথা দিনের আলোয় টেনে বার করেছিল, উৎসাহ দিয়েছিল চেঁচিয়ে ভাববার এবং মনে হয় যেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিও দেওয়া হয়েছিল! যতদূর মনে আছে এই জনমতও পাকিস্তান সৃষ্টির অনুকূলে বাংলাদেশ বিভাগের স্বপক্ষেই গিয়েছিল। এ সবের একটা কারণ সেই বিখ্যাত Direct action এবং তার পরবর্তীকালের ঘটনাবলী।

এই দাঙ্গার কিছু কাল আগে সম্ভবত ২৯শে জুলাই, ১৯৪৬ কলকাতা শহরে পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্মীদের সমর্থনে একটা সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। এই ধর্মঘট খুবই সফল হয়েছিল, এতে কোন জোরাজুরি, বাধা বা পিকেটিং-এর দরকার হয় নি। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা যা সমস্ত প্রগতিবাদী মনকে নাড়া দিয়েছিল, কারণ হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে এই ধর্মঘট সফল করেছিল। এমন স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট এদেশে এর আগে কেউ কখনও প্রত্যক্ষ

করে নি। তাই কবি সুকান্ত তার বিভিন্ন কবিতায় বারবার এই ২৯শে জুলাই-এর উল্লেখ করেছে।

যে কবি জনগণের কবি, যার কাজ কারবার জনগণকে নিয়েই এ প্রবল হানাহানি আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার মন কতখানি ব্যথাতুর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একটার পর একটা আঘাত সুকান্তর তরুণ মনকে প্রচণ্ডভাবে নিষ্পেষিত করতে লাগলো। প্রথমে যুদ্ধ তারপর ঝড়, বন্যাও মন্বন্তর এবং সবশেষে এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে কবির হৃদয় যেন দলিত মথিত হয়ে হাহাকার করে উঠলো। যে কবি দুর্ভিক্ষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্রত খুঁজে পেয়েছিল, রসিদ আলী দিবসে মুসলমানের সঙ্গে বাঁধ দিয়ে লড়াইয়ে যে নিজের জীবনকে করেছিল সার্থক তার কাছে এ দাঙ্গা অসহ্য হয়ে দেখা দেবে, তাতে আর সন্দেহ কি? চলচ্চিত্রের মত একটার পর একটা ঘটনা সুকান্তর চোখের সামনে যেন ফুটে উঠতে লাগলো। পূর্বে এ ধরনের অভিজ্ঞতা আর কোন কবির হয়েছে কিনা জানি না, এই তরুণ কবি কিন্তু এই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়লো। এই সময়ের রচনাগুলোতে তার আন্তরিক বেদনা, অসহায় অবস্থা এবং মানসিক চাঞ্চল্য দেখা যায়। এখানে এই প্রসঙ্গে আমি "সেপ্টেম্বর ১৯৪৬" কবিতাটির আমি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

> কলকাতায় শান্তি নেই।
> রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
> প্রতিটি সন্ধ্যায়।
> হৃৎস্পন্দনধ্বনি দ্রুত হয়:
> মূর্ছিত শহর
> এখন গ্রামের মতো
> সন্ধ্যা হলে জনহীন নগরের পথ;
> স্তম্ভিত আলোকস্তম্ভ—
> আলো দেয় নিতান্ত সভয়ে।
> কোথায় দোকানপাট?

কই সেই জনতার স্রোত ?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা
আজ আর তোলে নাকো
জনতরণীর পাল
শহরের পথে ।
ট্রাম নেই, বাস নেই—
সাহসী পথিকহীন
এ শহর আতঙ্ক ছড়ায় ।
সারি সারি বাড়ী সব
মনে হয় কবরের মত
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে প'ড়ে আছে
চুপ ক'রে সভয়ে নির্জনে ।
মাঝে মাঝে শব্দ হয় !
মিলিটারী লরীর গর্জন
পথ বেয়ে ছুটে যায় বিদ্যুতের মতো
সদন্ত আক্রোশে ।
কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে ;
হয়তো অনেক রাত্রে
পথচারী কুকুরের দল
মানুষের দেখাদেখি
স্বজাতিকে দেখে
আস্ফালন, আক্রমণ করে ।
রুদ্ধশ্বাস এ শহর
ছটফট করে সারা রাত—
কখন সকাল হবে ?
জীয়নকাঠির স্পর্শ
পাওয়া যাবে উজ্জ্বল রোদ্দুরে ?

সন্ধ্যা থেকে প্রত্যুষের দীর্ঘকাল
প্রহরে প্রহরে
সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়
ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ :
এর চেয়ে ছুরি কি নিষ্ঠুর ?
বাদুড়ের মতো কালো অন্ধকার
ভর ক'রে গুজবের ডানা
উৎকর্ণ কানের কাছে
সারা রাত ঘুরপাক খায় ।
স্তব্ধতা কাঁপিয়ে দিয়ে
কখনো বা গৃহস্থের দ্বারে
উদ্ধত, অটল আর সুগম্ভীর
শব্দ ওঠে কঠিন বুটের ।

শহর মূর্ছিত হয়ে পড়ে ।

জুলাই ! জুলাই । আবার আসুক ফিরে
আজকের কোলকাতার এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা ।

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াবে সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মত মুছে যাক ইতিহাসে ॥

এই কবিতাটির দুটি বৈশিষ্ট্য হয়ত অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যাবে না। যেমন 'পথচারী কুকুরেরা মানুষের দেখাদেখি স্বজাতিকে দেখে আস্ফালন, আক্রমণ করে'—কবির অন্তরের ব্যথা কি এখানে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

মানুষের বিচার-বুদ্ধিবোধের অভাব তাকে কি ব্যাকুল করে তোলে নি। আর তাই কবির ইঙ্গিত 'মানুষ কুকুরের পর্যায়ে নেমে গেছে'। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে কবি এই দুঃস্বপ্নের কথা ভুলে যেতে চায়, মানুষের এ অবস্থা ত স্বাভাবিক নয়, তাই অক্টোবরকে জুলাই হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। আগস্ট সেপ্টেম্বরের এ কুহেলিকা এই জঘন্য পাপ ধুয়ে মুছে যাক, শুধু বেঁচে থাক ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই।

সুকান্তর জীবনকথা লিখতে গিয়ে বারবার ঘুরে ঘুরে একটা কথাই মনে হয়। বাংলাদেশের এত কবি এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে সুকান্তর মত বৈচিত্র্যময় জীবন আর কার ছিল। নানা বিচিত্র ঘটনার ঘনঘটাই বা কার জীবনে এমন ভীড় করে এসেছে। অতীতের কবিব জীবনগুলো ছিল অনেকটা গতানুগতিক, তাদের জীবনে গতি ছিল কম ; তাই যতি, ধ্বনি আর ছন্দের কারবারেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। বাইরের জগতে তাকাবার মত, দেখবার বোঝাবার বা অনুভব করবার কি বা ছিল তাদের! এত ঘটনার সমারোহ কোথায় পাবে তারা। সুকান্তর পূর্ববর্তী কবিদের লেখা তাই ধীরে ধীরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিণতির পথে এসেছে, পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘজীবন পেয়েছেন, যার জন্য লেখার অবকাশও পেয়েছেন প্রচুর।

সুকান্তকে অনেকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলে থাকেন। কেউ কেউ বলেন সুকান্ত হল এই যুগেরই একটা সৃষ্টি। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে তৈরী করেছে। সুকান্ত জন্মেই দেখে "ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি"। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখার আর বিরাম নেই। একটা ঘটনাকে ভালো করে বুঝতে না বুঝতেই আর একটা এসে হাজির হচ্ছে। অক্ষর পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বই পড়ার মত ঘরের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবলী। প্রথমেই সুকান্তকে দেখতে হয় পারিবারিক মৃত্যুর মিছিল : প্রথমে ঠাকুরমা থেকে শুরু করে একে একে তার পরমপ্রিয় রাণীদি, দুই শিশু ভাইঝি, সুকান্তর বড় ভালবাসা আর প্রীতির জন বড়দা গোপাল-চন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সর্বোপরি তার মা। একে একে সবাই বিদায় নেয় ইহলোক থেকে অল্পদিনের ব্যবধানে। স্নেহ-বঞ্চিত সুকান্ত ঘর ছাড়ে।

বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ে বিশ্বনাগরিকত্বের সন্ধানে। বাইরে বেরিয়ে প্রথম আঘাত কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার তাগিদে দু'একবার অবশ্য বাড়ীমুখো হয়েছিল সুকান্ত কিন্তু ফল ব্যর্থতা।

বাইরের জগতেই বা মুক্তি কোথায়। অগ্নিযুগের প্রভাব পড়ে তার মনে। এর পরে শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ, তার সঙ্গে Black out, Black market, Control, Permit এবং মানুষেব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লুকোচুরি খেলা।

রাজনৈতিক অস্থিরতা আগেই ছিল। '৪২ এর আন্দোলনে আরও জোরদার হয়ে বসে দেশের বুকে। দেশের মুক্তি আন্দোলন সম্বন্ধে রাজনৈতিক মতবাদ দ্বিধা-বিভক্ত। মাথা ঠিক রেখে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এর পরেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা। আন্দোলনেব তীব্রতা বৃদ্ধি, বহু প্রাণহানি। পরে একে একে ঝড়, বন্যা, মন্বন্তর স্থায়ী গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে দিয়ে যায় কবির জীবনে। এর পরেই আত্মঘাতী দাঙ্গা সারা দেশ জুড়ে বারে বারে আঘাত হানে।

তাই ঘটনার দ্রুত আগমনে এবং পট পরিবর্তনে কবি যেন অস্থির হয়ে ওঠে। তার অভিজ্ঞতার ঘরে জমা পড়ে অনেক তথ্য, জ্ঞান আর অনুভূতি। রৌদ্রদগ্ধ বালির ওপরে হাঁটার মত কবির অস্থিরতা প্রকাশ পায় তার প্রতি কবিতায়। আজ যে কবিতা নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, দেখা যাবে পরদিনের কবিতা আরো বৈচিত্র্যে, নতুন রসে আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এই কারণেই সম্ভবত ওর কবিতাগুলো এত জনপ্রিয়। নিত্য নতুন চিন্তার খোরাক ভাষার এবং ছন্দের অভিনবত্বের যোগান দেওয়া বড় সহজ কথা নয়।

'রাত্রির গভীর বৃন্ত' হতে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল'—

এর ব্যাখ্যা ভালো বুঝে ওঠার আগেই পাওয়া গেল চমক,

> "নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার
> মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার
> তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
> মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।"

চমকের পরে আরো চমক আরো বিস্ময়, অভিজ্ঞতায় রসসমৃদ্ধ আরো বাস্তববাদ :

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি ॥"

শুরু হয়েছিল সাধারণ সুখদুঃখ নিয়ে সুললিত ছন্দ আর মিলে কবিতা রচনা —জন্মের উষালগ্নে। নিমেষেই সূর্যের দীপ্তি। ছন্দ আর মিল নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পর মুহূর্তেই একেবারে ঘনিয়ে আসে বিদায় বেলার সুর, বেজে ওঠে কবির বিদায় নেবার আগে—লিখে যায় অনবদ্য গদ্য কবিতগুলো—কথা, ভাব, ভাষার দখলের চমৎকারিত্ব স্বীকৃতির দাবি জানায়। কিন্তু স্বীকৃতি পেল কি পেল না দেখবার অবকাশ কোথায়—তার আগেও বিদায় নিতে হলো তাকে। এ যেন এক টাইফুন—নিমেষে এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে যাওয়া। ঝড় থাকলে তবে বোঝা যাবে টাইফুনের আগমনের ফলাফল। এত ক্ষুদ্র জীবন হলে কি হবে, সুকান্ত কিন্তু প্রবল আলোড়ন তুলেছে সবার মনে। তার স্বল্পজীবন দীর্ঘস্থায়ী আসন করে নিয়েছে বিদগ্ধ-সমাজে। এইটাই তার লেখার চরম সার্থকতা।

আত্মঘাতী দাঙ্গার কথা বলছিলাম। এই মুহুর্মুহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তিতে কবি হতাশ বোধ করে এবং সব কিছুই তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। তখন সুকান্ত 'বেড এইড কিওর হোম'-এ থেকে চিকিৎসিত হচ্ছিল। এটা ১৯৪৬ সালের শেষদিকের কথা। আমি ওর রোগশয্যায় থাকাকালীন অবস্থায় কিঞ্চিৎ সহানুভূতি আর শুভেচ্ছা জানানোর তাগিদে সেই বছরের একটা দেওয়ালীর শুভেচ্ছাবাণী'র অভিনন্দন, যাকে বলে Greetings Card পাঠিয়েছিলাম। তার জবাবে ও আমাকে 'দেওয়ালী' নামে সুন্দর কবিতাটি পাঠিয়ে ছিল। জানি না আমার আগে কোনো সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এমন সুন্দর অভিনন্দনবার্তা পেয়েছেন কিনা। এই কবিতাটি আমার জীবনের পরম সম্পদ। কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে আত্মঘাতী দাঙ্গার স্মৃতি কবিকে রোগশয্যার মধ্যেও আনমনা করে রেখেছে। এই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি তার ওপর এতখানি মোহবিস্তার করেছে যে এই শুভেচ্ছাবাণীর মধ্যেও তার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ছায়া পড়েছে :

ভূপেন,

তোর সেই ইংরাজীতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা
পেয়েছি, তবুও আমি নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,
আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী ;
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা ;
তবু তোর রঙচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।
যদিও সর্বদা তোর শুভ আমি চাই মনে মনে,
তবুও নতুন ক'রে আজ চাই তোর শান্তিসুখ,
মনের আঁধারে তোর শত শত প্রদীপ জ্বলুক,
এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে,
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ, নেই রোশনাই—
শুধু মাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই॥'

কবির যদিও মনে মনে আশা ছিল 'এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?' কিন্তু এ দুর্যোগ কাটে নি, বরং বাংলাদেশের ওপর দিয়ে নানা রকম ঝড়ঝঞ্ঝা অশান্তির বন্যা বয়ে গেল একের পর এক এর পরবর্তী বৎসরগুলোতে।

এর আট-ন' মাস বাদেই স্বাধীনতানামক সেই দিল্লীর লাড্ডু আমাদের আয়ত্তে এসে গেল। তবে পূর্বে পশ্চিমে কিছু চাপা, অর্থাৎ পাকিস্তান নামতে ঘুণ ধরেছে, তাই কিছুটা অঙ্গহানি হয়েছে এই দিল্লীর লাড্ডুর। দেশবিভাগের কথা বলছি। এতকাল লাড্ডু না খেয়ে আমরা পস্তেছিলাম। আর এখন এ লাড্ডু খেয়েও আমরা পস্তালাম। স্বাধীনতা পাবার স্বপ্ন এবং

স্বাধীনতার পরবর্তী বৎসরগুলোর রঙীন কল্পনার চিত্র কোন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আমাদের জন্য শুধু হতাশা, অনুশোচনা, মনোকষ্ট আর দীনতা।

দেশবিভাগের ফল ফললো অচিরেই। পূর্ব বাংলা থেকে লাখে লাখে ছিন্নমূল নরনারা আবার ভীড় করলো এই শহরে এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তাদের অতি সুন্দর এক নতুন উপাধি মিললো— রিফিউজি যাব চমৎকার বাংলাও সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে গেল 'উদ্বাস্তু'। আর একদফা বাংলাদেশ দেখলো মানুষের লাঞ্ছনা, অপমৃত্যু আর স্বার্থপরতা। এদের নিয়ে রাজনৈতিক দলবাজীর খেলা শুরু হল; সংখ্যায় যে এরা অনেক, এদের ভোটগুলো হাতাতে পারলেও অন্তত হামাগুড়ি দিয়েও সেই পরম লোভনীয় মন্ত্রীত্বের কাহ বরাবর পৌঁছানোব সম্ভাবনা থাকবে। ভারতের নানাস্থান থেকে এল গালভবা বাণী আব প্রতিশ্রুতি। কাজে অবশ্য ফক্কা। পশ্চিমবঙ্গের যে সব জমিতে এতকাল চাষবাস বা বসতি ছিল না, সেগুলো বেশী দামে বিক্রি হতে লাগলো, এই নতুন আসা মানুষদের কাছে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তিব পরবর্তী বৎসরগুলো বাংলাদেশ দেখলো নানারকম রাজনৈতিক সার্কাস। বিভিন্ন মতবাদের ধাক্কায় মানুষের মাথার চিন্তাগুলো জটপাকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। সুকান্তর প্রিয় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি হল দ্বিধাবিভক্ত। নজরুল হয়েছেন রুদ্ধবাক। আমার মনে হয় এ আমাদের সৌভাগ্য যে সুকান্তকে এই সব বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখবার বা বোঝবার কষ্ট সইতে হয় নি; কেন না তার আগেই সে বিদায় নিয়েছে এই পৃথিবী থেকে। এইসব আঘাত তার কাছে কত নিবিড় করে লাগত তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। যুদ্ধ, মন্বন্তর আর দাঙ্গা সুকান্তকে যথেষ্ট ব্যথিত আর চিন্তিত করে তুলেছিল, তাই ভালই হল, এই সব বেদনাময় ব্যাপার ঘটলো তার অবর্তমানে। অবশ্য নতুন অভিজ্ঞতায় রসসিঞ্চিত কবির কলমে যে আগুন ছুটতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩৬

সবচেয়ে দুঃখের কথা সুকান্তর রচিত কোন বইয়েরই প্রকাশ সুকান্ত দেখে যেতে পারে নি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে তার

কাছে পৌঁছেছিল 'ছাড়পত্রে'র ছাপা ফর্মাগুলো। আমি আর বিমল শেষ যেদিন তার কাছে পৌঁছলাম তখন সে এগুলো আমাদের দেখিয়েছিল। তার বেশী আর কিছুই সে জানলো না। তার মৃত্যুর পর 'ঘুম নেই' 'পূর্বাভাস' 'অভিযান' 'মিঠেকড়া' 'হরতাল' এইভাবে একের পর এক বই প্রকাশিত হতে থাকলো। প্রকাশনার ভার নিল তারই ভাইরা এবং প্রকাশক তারই পিতার সংস্থা 'সারস্বত লাইব্রেরী'। সে জানে না আমাদের অনুরোধে তার লেখা 'গীতিগুচ্ছ'ও এইভাবে প্রকাশিত হল। আর সবশেষে প্রকাশিত হল 'সুকান্ত-সমগ্র'—তার সমস্ত রচনার একটি সংস্করণ। এগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুকান্তর জনপ্রিয়তাও বেড়ে চললো অতি দ্রুত। জনগণের কবি জনগণের মনে পেল স্থায়ী আসন। এখন আর কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুখপাত্র সুকান্ত নয়, সে সারা দেশের সর্বহারাদের মুখপাত্র। সুকান্ত বর্তমানকালের সার্থকতম কবি। সুকান্ত বাংলাদেশের তরুণতম কবি যার অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত জীবন সম্পূর্ণ এবং বিস্তৃত হলে কি হতে পারত এই কল্পনা মানুষকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। মৃত্যুর আগে সুকান্তকে কজন জানত। কিন্তু এখন সুকান্ত বাংলাদেশের একটি অতিপ্রিয় নাম। এসব সে কিছুই জানলো না, জানতে পারলো না। সে জানলো না তার ভাই অশোক 'কবি সুকান্ত' নামে তার একটি সুন্দর জীবনী লিখেছে। সে জানলো না আমার মত অসাহিত্যিককেও শেষ পর্যন্ত কলম ধরতে হয়েছে তার অনুরাগীদের তাগিদে। তারা জানতে চায় আরও বেশী করে শুনতে চায় তাদের প্রিয়কবি সুকান্তর জীবন কথা।

সুকান্তর জীবৎকালে তার কবিতা বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বইয়ের প্রকাশ তার মৃত্যুর পরেই হল। সুকান্ত জীবিত থাকলে হয়ত আরও অনেক বেশী বেশী কবিতা এবং গদ্যরচনা দেশবাসী পেত। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা নিজের লেখার প্রতি বা সেগুলো জমিয়ে রাখার প্রতি তার যেন একটা চিরকাল কুঁড়েমি ছিল। এ ব্যাপারে সে ভারি অগোছাল আর বেহিসাবী। তাই আরও বহুলেখা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে পড়ে রয়েছে বলেই আমার অনুমান। যেমন আমার কাছে ছিল কয়েকটি

কবিতা 'সুচিকিৎসা', 'ভবিষ্যতে' আর 'আজিকার দিন কেটে যায়'। এগুলো আমি প্রকাশ করেছিলাম ১৩৫৪ সালের শারদীয়া বসুমতীতে আমার লেখা 'সুকান্ত-প্রসঙ্গ' রচনায়। এ ছাড়াও আর একটি কবিতা সুকান্ত আমাকে দিয়েছিল তার জীবিত অবস্থায়—রবীন্দ্রনাথের ওপরে একটা সুন্দর রচনা। তখন ও ৩৪নং হরমোহন ঘোষ লেনের কাঠের বাড়ীতে থাকে। সেখানে এখন একটি নতুন পাকা বাড়ী তৈরী হয়েছে। এই বাড়ীটিকে আমরা কাঠের বাড়ী বলতাম কারণ এটি ছিল পূর্ববঙ্গের ধরনের কাঠ ও টিনের বাড়ী। আর ওপরে একটি কাঠের বিরাট মাচা ছিল। সুকান্তর এই সময়ের বসবাস এবং সাহিত্য-রচনা চলত এই মাচার ওপরে নিরিবিলিতে সবার দৃষ্টির অগোচরে। এই মাচার তিনদিকে জানলাও ছিল। এরই একটি দক্ষিণমুখী জানলার সামনে একটা জলচৌকিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেবিল করে বসে চলত সুকান্তর প্রথম জীবনের সাহিত্য-রচনা। এটা সম্ভবত ১৯৪০ সালের কথা। আমি গেছলাম সুকান্তর কাছে বেড়াতে। সুকান্ত আমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাল। তখন সুকান্তর বয়স পনেরো-ষোল হবে। আমি কবিতাটির খুবই প্রশংসা করলাম এবং ও সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি আমায় দান করলো। তাই বলছি এরকম দান করা ছিল তার স্বভাব। বহু কবিতা বহুজনকেই নিঃস্বার্থ ভাবে দিয়ে দিয়েছে। কবির নিজের কথায়ই বলি "……লেখা আমি সঞ্চয় করি না কখনও, যেহেতু লেখবার জন্যে আমিই যখন যথেষ্ট……"(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)।

কবি সুকান্তর আরেকটি স্বভাব ছিল—খাতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আলগা কাগজে কবিতা লিখে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া, পরে আর তার খোঁজও করত না। কারণ প্রথমদিকে বহু কবিতাই ও সাধারণ কাগজের পৃষ্ঠায় লিখত এবং সেটা টেবিল থেকে উড়ে চলে যেত এবং এভাবে বহু কবিতা হারিয়েও গেছে। একবার আমি নিজেই ওই মাচার ওপরে একটা কবিতা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম যাতে একটা একঘেয়ে নীরস গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের বর্ণনা ছিল। এখন মাত্র তার দুটি পঙ্‌ক্তি মনে করিতে পারি :

'এই নির্জন দুপুরে
হাঁক দেয় কুকুরে।'

সুকান্তর আরও একটা জিনিস অজানা রয়ে গেল, তা হচ্ছে বাংলাদেশের বড় বড় সমালোচকরা সুকান্তর লেখাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন পরম গৌরবের আসনে।

সুকান্তর অমরত্বের লোভ ছিল না, অন্তত মাইকেলের মত 'আমার জীবনী লিখিস'—এই ধরনের কথা তার মুখ থেকে কোনদিন শুনি নি। তবে তার জীবনী ভারতের সীমানা ডিঙিয়ে সুদূর ফ্রান্স এবং আমেরিকায় লেখা হবে এ খবর সুকান্ত পেয়েছিল এবং আমাকে লেখা দু'একটি চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লাগে তার মনে কি মৃত্যু উঁকি দিয়ে গেছলো? মৃত্যুর বয়স ত কবির হয় নি। কোন প্রবীণ কবি যদি নিজের মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখে সেটা এত অস্বাভাবিক মনে হয় না। অবাক বিস্ময়ে ভাবি বাংলাদেশের তরুণতম কবি বিদায় নেবার আগে 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতাটি লিখলো কেন! নীচে কবিতাটি পুরোপুরি তুলে দিলাম—

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শঙ্কারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।
পরিচয়ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের,
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ!

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পৃষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর॥

বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি সুকান্তর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা বহুদিনের। আসলে যে দেশপ্রেমিক, দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি তার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসাই স্বাভাবিক। আর দেশপ্রেম যদি খাঁটি হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাই জীবনের প্রথম দিক থেকে যে বিপ্লবীদের প্রতি সুকান্তর

শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল অপরিসীম, জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তার কিন্তু এতটুকু হেরফের হয় নি। সুকান্ত যখন ১৯৪৬ সালে রেড-এইড-কিওর হোমে চিকিৎসিত হচ্ছে তখনকার দু'একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাকে লেখা দু'একটা চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, যাতে দেখা যাবে বিপ্লবীদের প্রতি সুকান্তর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল।

"......তবে কাল আমার জীবনে সবথেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন, 'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি'। অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনদিনই নিজেকে মনে করি নি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয় নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বরের এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।"

(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

"......আমি তোকে ডেকেছিলাম শুধুমাত্র তোর সান্নিধ্য পেতে নয়, সদ্যমুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। শিশুর মত সরল ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচয় তোর পক্ষে আনন্দের হত। আমার সঙ্গে তো এঁর রীতিমত বন্ধুত্বই হয়ে গেছে। বাস্তবিক এই সব বীরদের প্রায় প্রত্যেকেই শিশুর মত হাসিখুশি, সরল, আমোদপ্রিয়। এছাড়াও বিখ্যাত শ্রমিক এবং কৃষক নেতারা এখানে এখন অসুস্থ অবস্থায় জড়ো হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও তোর আলাপ করিয়ে দেবার লোভ আমার ছিল........।" (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

মনে হয় দেশমুক্তির আন্দোলনের আহ্বান তার মনে অনেক আগেই এসে গিয়েছিল। ঘর ছেড়েছিল সুকান্ত আগেই। বাড়ীর থেকে ছিল না

পিছু টান, তাই রাজনৈতিক আন্দোলনে নাম লেখাতে সুকান্তর দেরী হল না। পুরোপুরি কম্যুনিস্ট বনবার আগে তাকে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে সাধারণের ভাল করবার একটা সাধু প্রচেষ্টায়।

সুকান্ত আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদেব পড়াবার জন্যে বিনা মাইনের স্কুল খুলে ছিল ঐ কাঠের বাড়ীর বারান্দায়। উদ্দেশ্য গরীবের ছেলেরা যাদের বাড়ীতে মাস্টার রাখবার সঙ্গতি নেই, তাদেব স্কুলের পড়া তৈরী করিয়ে দেওয়া।

ছেলেবেলা থেকেই স্থানীয় পাঠাগার গড়ার দিকে সুকান্তর নজর ছিল। বৈমাত্রেয় দাদা মনমোহন ভট্টাচার্যের বই-এর কারবার ছিল, তাই সেখান থেকে কিছু বই সে জোগাড করেছিল বিনামূল্যে। এছাড়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত পরিজন এদের কাছ থেকে বহু পুস্তক চেয়েচিন্তে সংগ্রহ করেছিল সুকান্ত। নিজের বাড়ীর বইগুলো এনে জড়ো করেছিল ঐ একই কারণে। অনেকটা এমনি ভাবেই পাড়ার আরো কিছু বন্ধুর সাহায্যে বেলে-ঘাটার বর্তমান 'স্টুডেন্টস লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে শুনেছি।

মানুষের বিপদে আপদে, অসুখে বিসুখে সুকান্তকে এবং তার কিছু বন্ধুবান্ধবকে দেখা গেছে জনসেবার ইচ্ছায় এবং অভ্যাসে। অথচ তার স্বাভাবিক সংকোচ এবং মুখচোরা ভাবের সঙ্গে এই ধরনের কাজগুলো যেন ঠিক খাপ খায় না। কারণ, যারা মুখচোরা বা লাজুক তারা সাধারণত জনতার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু সুকান্তর চরিত্রে ছিল এইরকম পরস্পর বিরোধী দোষগুণের সমাবেশ।

সুকান্তর ছাত্রজীবন শুরু অন্যান্য আর পাঁচজনের মত পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে। বেলেঘাটারই কমলা বিদ্যামন্দির নামে এক প্রাথমিক বিদ্যালযে সুকান্ত পড়াশুনো শুরু করে। পরবর্তীকালে সুকান্ত বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলে ভর্তি হয়। এইসব স্কুল-জীবনেও তাকে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়। যেমন হাতে-লেখা পত্রিকা, বা স্কুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। একবার ও 'ধ্রুব' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। হাতে-লেখা পত্রিকায় সুকান্তর আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। সে সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবকে লেখায় উৎসাহিত করত এবং বহুলোকের লেখার সংস্কার করে

একটা সুন্দর রূপ দিত। এতে তার পরিচিত-পরিজনেরা লেখায় উৎসাহ পেত। আমার ক্ষেত্রেও একথাটা অত্যন্ত সত্য।

সুকান্ত মার মৃত্যুর পরে স্নেহহীন পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিল। তাই যেন মনে হয় অপরের দুঃখ দারিদ্র্যে এবং বিশেষ করে স্নেহ ভালবাসাবঞ্চিত জীবন তাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করত। তাদের সান্নিধ্যে এসে সুকান্ত হয়ত নিজের শিশুকালের স্মৃতি রোমন্থন করত। এবং হয়ত নিজের সংবেদনশীল মন নিয়ে, সহানুভূতি নিয়ে অপরকে বোঝবার করত চেষ্টা এবং মনে মনে তাদের সমবেদনায় অংশগ্রহণ করতে চাইতো। আশ পাশের প্রাত্যহিক চেনাজানা ধরাবাধা জীবনকে কাটিয়ে উঠে সে যেন ছন্নছাড়া দুনিয়াকে অনুভব করতে চাইতো। এইসব কারণেই মনে হয় সমাজসেবা তথা রাজনৈতিক জীবন তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।

স্কুল জীবনে স্বভাবতই ছাত্র আন্দোলনে তাকে মুখ্য ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। সুকান্তর অগ্রজ সুশীলদা ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইসূত্রে তখনকার দু'একজন ছাত্রনেতা ওদের বেলেঘাটার বাড়ীতে আসতেন। সেইসূত্রে মনে হয় সুকান্ত এদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এদের সঙ্গে কথায় বার্তায়, আলোচনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল। তখনকার রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে সে ঐ অল্পবয়সে নিজের সঠিক ভূমিকা বুঝে নেওয়া খুবই কষ্টকর সন্দেহ নেই। তবে আমার অনুমান এটার শুরু ১৯৪১ এর আগে নয়। তখনও আমরা স্কুলের নীচু শ্রেণীর ছাত্র। সম্ভবত সেই কারণেই আমরা স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানতাম কিনা, আমার এখনও সন্দেহ আছে। তাই এই অবস্থায় মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তার ব্যাখ্যা বুঝে নিয়ে ঠিক পথে এগোনো পরম বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। যাই হোক, সুকান্তর রাজনৈতিক জীবন এইভাবেই শুরু হয়েছিল।

বিশ্বব্যাপী এই ভীষণ প্রলয়কারী বিশ্বযুদ্ধে যখন পৃথিবীর একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারের নাৎসী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল বিনা প্ররোচনায় এবং হঠাৎ আর সর্বোপরি দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনাক্রমণ

চুক্তি বজায় থাকা সত্ত্বেও তখন সুকান্ত তার নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ হল এবং কাজে নেমে পড়লো লেখায় এবং জনমতগঠনে, পারস্পরিক আলোচনা এবং কর্মের মাধ্যমে। এই যুদ্ধকে তখনই 'জনযুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি। 'জনযুদ্ধ' নামে তারা একটা সাপ্তাহিক প্রচার পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল। এর পূর্বে একটি পরিচ্ছেদে আমি '৪২ এর আন্দোলনের কথা লিখেছি। তাই এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধুমাত্র সুকান্তর রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। এই সময়ে কম্যুনিস্ট কর্মী সংখ্যা ছিল কম। একদিকে যেমন জনমত বিশেষ তৈরী হয় নি, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তখনও খুঁজে পায় নি তাদের রাজনৈতিক জীবনে সঠিক চলার পথ, তখন এই অল্প কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে এই বিরাট জনমণ্ডলীকে মার্কসবাদী চিন্তাধারার আওতায় আনা বড়ো সহজ কাজ ছিল না। তাই এইসব কর্মীদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হত। জনমত গঠনের জন্য পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ঘরোয়া সভা, আলোচনা বৈঠক, বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে পরবর্তী কর্মের তালিকা প্রস্তুত, এছাড়া তার সঙ্গে কিছু সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হতো। সুকান্তও তার তরুণমনের প্রচণ্ড আবেগে এই নতুন খুঁজে পাওয়া কাজে মনোনিবেশ করেছিল একান্ত আগ্রহে। তাই একাই একশ লোকের কাজ করবার বাসনা নিয়ে সুকান্ত দিনরাত পরিশ্রম করত, চরকির মত ঘুরে বেড়াত এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে। একই আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে জনমতগঠনের প্রয়াস যেমন একদিকে চলছিল অপ্রতিহত গতিতে, অন্যদিকে তেমনি ছিল নানা রকমের সুদৃশ্য পোস্টার লাগানোর কাজ, যাতে এই যুদ্ধের আসল রূপ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পিছনে দাঁড়াবার প্রয়োজনের ব্যাখ্যা দেওয়া হত। এগুলো দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটাও যেন ওরই কাজ। ঘরে ফিরে কলম ধরার উদ্দেশ্য একই জনজাগরণ।

বহু পোস্টার সুকান্ত নিজহাতে লিখেছে। হাতের লেখা সুন্দর ছিল, তাছাড়া আঁকবার হাতও একেবারে অপটু ছিল না। সুকান্তর বাড়ীর কাছাকাছি পুরোন একটা ভাঙা বাড়ীতে ছিল 'জনরক্ষা সমিতির' অফিস। এইখানেই কম্যুনিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্মীরা এবং পার্টির প্রতি দরদী মানুষেরা আসত,

আলাপ-আলোচনা চলত, দেওয়া হত কাজের নির্দেশ। তারপর তারা বেরিয়ে পড়ত বিভিন্ন দিকে—উদ্দেশ্য, মানুষকে সচেতন করে তোলা, যুদ্ধের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সাধারণকে জড়ো করা। এই সময়ে A. R. P. নামে যে সংগঠন ছিল তা প্রতিরক্ষামূলক কাজে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতো। এদের সঙ্গে সুকান্ত এবং তার দলবলেরাও যোগ দিয়েছিল একই উদ্দেশ্যে বেশী মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং তাদের নানারকম সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত করা।

রাজনৈতিক পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য বেচতে হত এই কর্মীদের। এখানেও সুকান্ত পিছিয়ে ছিল না। সমস্ত কর্মেই তার উদাম ছিল সবার উপরে, নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম আর ছিল আন্তরিকতা। তাই অতি দ্রুত সে একজন সৎ, পরিশ্রমী এবং একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে চিহ্নিত হল পার্টির ওপর মহলে। পাড়ার গণ্ডী ডিঙিয়ে সুকান্তকে বেরিয়ে পড়তে হলো পার্টির কাজে। সুকান্ত সারা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে শুরু করলো। না ছিল তার নাওয়া-খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়, না ছিল নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা বা পারিবারিক বন্ধন। যা ছিল তা হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম।

'৪২-এর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সুকান্তর কাজ যেন বহুগুণ হয়ে দেখা দিল। জনমত রাজনৈতিক মতবাদে দ্বিধাবিভক্ত। সাধারণ মানুষ তখন মুক্তির নেশায় পাগল, এমনি অবস্থায় সুকান্ত এবং তার পার্টির মতবাদকে এই দুরন্ত তরঙ্গ সংকুলে এগিয়ে নিয়ে চলা বড কঠিন। লাঞ্ছনা, বিদ্রূপ, গালাগালি এসবই ছিল সহজপ্রাপ্য। তবু, দিনরাত সুকান্ত তখন পরিশ্রম করে চলেছে। ভোরবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত বিরামহীন কাজ, এ কাজের শেষ কোথায় ও নিজেও হয়ত জানতো না। এমন কঠিন পরিশ্রম করে সে অর্জন করল পার্টির সদস্যপদ এবং স্বভাবতই সেই ছিল সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

এমনি করেই জনতার কবি জনতার সেবায় জনতার মুক্তির কামনায় এবং জনতার কুশলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল দুরন্ত আবেগে। নিজের বিশ্রাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের অভাব-অভিযোগ, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, শিক্ষা-দীক্ষা সবই যেন তলিয়ে গেল, ভেসে গেল জনসাধারণের ভাল করার দুরন্ত তাগিদে।

কম্যুনিস্ট পার্টি একটি দৈনিক পত্রিকা বার করছিল—নাম 'স্বাধীনতা'। প্রথমে এই কাগজ কোন ছাপাখানা থেকে ছাপানো হত। তারপর পার্টি ডাক দিয়েছিল সাধারণ মানুষকে, শ্রমিক-কৃষক এবং সমাজের অন্যান্য অবহেলিত অংশকে অর্থ সাহায্যের জন্য। কারণ 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব মেসিন চাই, চাই নিজস্ব সংগঠন, যাতে জনতার বাণী, অভাব-অভিযোগ বেশী করে ঠাঁই পায় এই পত্রিকায়। এ ডাক সফল হয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্য এল তার নিজস্ব মেসিন।

এই স্বাধীনতা পত্রিকার সঙ্গে সুকান্তর যোগাযোগ স্থাপিত হল প্রায় শুরু থেকেই। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা বিক্রীর অভিজ্ঞতা আগেই ছিল, স্বাধীনতা পত্রিকাও সুকান্ত নিজ হাতে বিক্রী করেছে, পৌঁছে দিয়েছে পার্টি দরদীদের বাড়ী বাড়ী। সংগ্রহ করেছে খবরাখবর পত্রিকার জন্য। এসব হলো সাধারণ কর্মীর কথা। কিন্তু সুকান্তর সঙ্গে 'স্বাধীনতা'র সম্পর্ক নিবিড়তর হয়ে গেলো এই পত্রিকায় 'কিশোর-সভা' বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গে। সুকান্তর ওপর ভার পড়েছিল এই বিশেষ বিভাগটি প্রকাশ ও পরিচালনার গুরু দায়িত্বের। একদিকে যেমন নিজ রচনার সম্ভার দিয়ে সাজানো হতো এই বিভাগকে তেমনই অপরদিকে অন্যান্য অগ্রজ সাহিত্যিক এবং বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হতো ছোটদের জন্য লেখা নানারকম গল্প, কবিতা এবং আলোচনা। শুধু কিশোর-সভা নয়, সুকান্ত কিশোর-বাহিনী নামে একটি সংগঠনও এই সময় গড়ে তুলেছিল। একটু পেছনে ফিরলেই দেখা যাবে যে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা ইত্যাদি নানারকম প্রলয়কারী ঘটনায় শিশু ও কিশোর মন তখন সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয়ে আসছিল। চাল, চিনি, কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে এবং অনেকে অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে বা শহরতলী অঞ্চল থেকে চাল এনে বেচাকেনা করে একটা দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে উঠছিল। এদের শিশুমনকে বোঝা, তাদের কোমল সত্তা এবং প্রবৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা, তাদের নিরাশা ভরা দিনগুলোর মাঝে আশ্বাস এবং সুস্থ চিন্তাধারায় স্পন্দন জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি ছিল অবহিত। তাই এই কিশোর-বাহিনীর সৃষ্টি। সংগঠক হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্ব এবং নিয়মনিষ্ঠার চিহ্ন সুকান্ত রেখে গেছে এই

কিশোর-বাহিনীর মধ্যে। এই কিশোর-বাহিনীর সভ্যদের পারস্পরিক প্রথম দেখার এবং বিদায়ের সম্ভাষণটি ছিল বড় সুন্দর। হাত মুঠো করে কনুই পর্যন্ত মুড়ে একে অপরকে 'লাল সেলাম' এবং অপরে তার প্রত্যুত্তর দিত একই ভঙ্গীতে ওই কথার মাধ্যমে। এই কিশোর-বাহিনীর আদর্শ কি ছিল আর কি চেয়েছিল কবি এদের কাছে? সুকান্ত এদের অনুপ্রাণিত করেছিল নানা সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনসেবা আর স্বাধীনতা ছিল এদের লক্ষ্য, চরিত্রগঠনের দিকে সুকান্তর নজর ছিল শুরু থেকেই। এই সম্বন্ধে কিশোর-বাহিনীর কোন সদস্যকে লেখা সুকান্তর একখানা চিঠি তুলে দিচ্ছি। চিঠিখানা থেকেই সুকান্তর লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা চিত্র পাওয়া যায়:

"প্রিয় বন্ধু,

'তোমরা কী ধরনের কাজ করবে জানতে চেয়েছ, তাই জানাচ্ছি, তোমরা প্রথমে নিজেদের লেখাপড়া ও আচার-ব্যবহার—চরিত্রের উন্নতির দিকে নজর দেবে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলার দিকেও নজর দেবে সেই সঙ্গে। তোমরা গরীব ও অসুস্থ ছেলেদের সবসময় সাহায্য এবং সেবা করার চেষ্টা করবে, নিজের পাড়ার বা গ্রামের উন্নতির জন্য প্রাণপণ খাটবে। আর এই সমস্ত কাজ দেখিয়ে অভিভাবকদের মন জয় করার চেষ্টা করবে।

কার্ড এখনও অনেক আছে। যে কখানা দরকার জানিও আর কার্ডপিছু এক আনা পাঠিয়ে দিও। সবসময় চিঠি পাঠাবে।

কিশোর-অভিনন্দন নিও

কর্মসচিব"

(সুকান্ত-সমগ্র: পত্রগুচ্ছ)

কিশোর-সভার কথা বলছিলাম। এই বিভাগে প্রকাশিত রচনাগুলো অন্যান্য পত্রিকার এই ধরনের বিভাগ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিল। তাই রচনাগুলো ছিল সাধারণত আদর্শমূলক এবং জ্ঞানভিত্তিক।

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে কিশোর-বাহিনীর একটি সংগঠন ছিল। সুকান্ত যেমন অন্যান্য কিশোর-সংগঠনগুলোতে হাজির হয়ে তাঁদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করত, তেমনই এই শ্যামপুকুর স্ট্রীটের কিশোর-বাহিনীর নানা অনুষ্ঠানে

সুকান্ত ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে এদের উৎসাহ দিত। কিশোর-বাহিনীর এই আসরটিতে রমা এবং তার আরো কিছু বন্ধু-বান্ধব যোগ দিয়েছিল। এটা মোটামুটি মেয়েদের আসর ছিল। এখানে একবার একটা অনুষ্ঠানের জন্য সুকান্ত 'অভিযান' নামে একটা নাটক লিখে দিয়েছিল। ও নিজেই ছিল এর পরিচালক। আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল যন্ত্র-সঙ্গীতের ভার আর সুরারোপ করেছিল ঘেলু। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

আমরা যখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্র তখন আনন্দবাজার পত্রিকা ছোটদের 'আনন্দ-মেলা' বিভাগটি প্রকাশ করে। এবং ছোটদের এটি একটি জনপ্রিয় আসর হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে এই ধরনের ছোটদের আসরের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আনন্দবাজার পত্রিকা। অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ধীরে ধীরে এই আদর্শকে অনুসরণ করে নিজেরা এক একটি ছোটদের আসর প্রকাশ করতে শুরু করে। এই আনন্দ-মেলার পরিচালকের নাম 'মৌমাছি'। মৌমাছির আসল নাম জানার জন্য আমার আর সুকান্তর এবং অন্যান্য ছোটদের (যেমন রমা, ঘেলু, খোকনমামা প্রমুখের) প্রবল আগ্রহ। এখনকার মত তখনও এটি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। আমার মত সুকান্তও ছিল এর নিয়মিত পাঠক। আমাদের কিশোর বয়সে এই আসরটি বড়ই প্রিয় ছিল আমাদের। সারা সপ্তাহভোর আমরা পরম আগ্রহভরে প্রকাশের দিনটির অপেক্ষায় থাকতাম। সোমবারটা যেন আমাদের চোখে নতুন করে দেখা দিত। আমরা নানারকম প্রশ্ন পাঠিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় থাকতাম এবং যতদূর মনে পড়ে সুকান্ত একদিন 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় গিয়ে 'মৌমাছি'কে দেখেও এসেছিল। কারণ আগেই বলেছি মৌমাছি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ছিল অসীম। যাই হোক, সুকান্ত কোথা থেকে যেন একদিন সংগ্রহ করে আনলো মৌমাছির আসল নাম—বিমলচন্দ্র ঘোষ।

ছোটদের জন্য সুকান্তর চিন্তাধারা একটা নির্দিষ্ট পথে চলতে শুরু করেছিল। যদিও সুকান্ত বয়সে নবীন, কিন্তু তার চিন্তাধারার পরিণতি অসাধারণ রূপ নিয়েছিল তার সেই নবীন বয়সেই। তার জীবনের আদর্শের

কথা, সাম্যবাদের কথা সে প্রতিনিয়তই মনের মধ্যে পোষণ করত। সে আলাপে ও কথায় তার বন্ধু-বান্ধব এবং অন্তরঙ্গমহলে এই কথাই বারবার বলত যে ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মনের মাঝে আনতে হবে নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শবোধ এবং শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতা, যাতে তারাই একদিন ধনিক শ্রেণীর শোষণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পায়। খাওয়া, থাকা, পরা আর শিক্ষার কোন অসুবিধায় তাদের তখন পড়তে হবে না। তারা হবে মুক্ত, স্বাধীন, উচ্ছল, প্রাণময় ছেলেদের দল।

রবীন্দ্রনাথের যেমন শিশুদের প্রতি ছিল আন্তরিক দরদ এবং ভালবাসা তেমনই সুকান্তরও এদের প্রতি ছিল পরম অনুরাগ। শিশুদের জন্য সুকান্তর ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে তার একটি লেখা থেকে।

সুকান্ত লিখেছিল: "এটা আজ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে খুবই লজ্জার কথা যে আজ পর্যন্ত কিশোরদের বা শিশুদের জন্য রচিত গল্প উপন্যাস বা কবিতাকে সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা হল না, যদিও শিশু-সাহিত্য নামক একটা রঙচঙে পদার্থ অধুনা বইয়ের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এই সমস্ত মুখরোচক অথচ কুপথ্য গল্প উপন্যাসই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়। ছোটদের কাছে নিষিদ্ধ অন্যান্য পদার্থের মত এই তথাকথিত শিশু-সাহিত্যরই চাহিদা বেশী এবং তারচেয়েও আশ্চর্যের কথা এই সমস্ত কিশোর মনের স্বাস্থ্যের পরিপন্থী অ্যাডভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ বই-এর সিরিজগুলি অভিভাবকরা ছোটদের হাতে তুলে দিতে এতটুকু শিউরে তো ওঠেনই না, এমন কি কোনরকম কুণ্ঠাও বোধ করেন না। এই সমস্ত অসম্ভব বিজাতীয় চিন্তার বিষ এবং কিশোর মনের কল্পনা-প্রবণতার সুযোগে উড়ু উড়ু ভাবের প্রশ্রয়দাতা। এই অযথা রোমাঞ্চকর উস্কানি শিশুমনের বলিষ্ঠতা ঘুচিয়ে তাকে দুর্বল করে এবং ছেলেবেলা থেকেই তাদের রুচিকে খর্ব করে রাখে। যার ফলে অনেক বড় বয়সেও মোহন সিরিজ ছাড়া অন্য কোন বই মনোহরণ করতে পারে না, অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকেই তাদের রুচি এতো নিচু সুরে বাঁধা হয়ে যায় যে, পরিণামে তা বাংলা-সাহিত্যকে আক্রমণ করে।

সাহিত্যিকদের এইদিকে দৃকপাত করবার সময় এসেছে। কিশোররা চায়

গল্প এবং খাঁটি গল্প হলে তার মধ্যে নীতিকথা থেকে বিজ্ঞানের কথা সব কিছুই প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু জ্ঞান অথবা নীতির কথা যেখানে গল্পকে ছাড়িয়ে যায়, সেখানে গল্প হিসাবে কিশোরদের কাছে তা ব্যর্থ হয়।"

উল্লেখযোগ্য যে সুকান্ত শিশুসাহিত্যে রচনার যে ধারার কথা বলেছেন বাংলাসাহিত্যের ক্লাসিক রচয়িতারা ঠিক সেই একই ধারায় শিশুসাহিত্য রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও দক্ষিণারঞ্জন—শিশুসাহিত্যের স্বর্ণ যুগের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে তাঁদের রচনায় 'বিজাতীয় চিন্তার বিষ' মিশ্রিত নেই বরং এক মহৎ কবির প্রাণ ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে মাঠ মাটি নদী খাল বন পাহাড় নিয়ে গড়া বাংলাদেশকে শিশুমনের বিস্ময়ের সামনে আশ্চর্য সৌন্দর্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

সুকান্ত বারবার বলেছে, ছোটদের জন্য রচনা ছোটদের যেন মনের কাছাকাছি যায়। অর্থাৎ প্রবন্ধের ভারিক্কী চালের বড়ো বড়ো গম্ভীর আওয়াজ তাদের সামনে মাস্টারি সুরে হাজির করলে তারা ভয় পায়। তাদের সঙ্গে সবসময়ই চাই গল্প-বলার অন্তরঙ্গতা। তাই সাহিত্যিকদের কাছে তার আবেদন: গলার সুর যেন কোমল খাদে নামানো থাকে; তাহলেই কিশোদের চিত্তজয় করা সহজ হবে। নীতিকথার চোখ রাঙানি তারা সহ্য করবে না।

উদাহরণ দিয়ে সুকান্ত বলেছে: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ে আমরা পড়েছি সদা সত্যকথা বলিবে, কিন্তু সত্যকথা সম্বন্ধে এ নীরস সত্য কথাটি কারো মনে কোন রেখাপাত করে কি? অথচ ভুবনের গল্প শুধু গল্প বলেই খানিকটা কার্যকরী হয়। সুতরাং আজকের দিনে শিশুদের জন্য কিছু লেখা যেমন সাহিত্যিকদের সাহিত্যকে বাঁচানোর জন্য নিজের গরজেই অবশ্য কর্তব্য, তেমনি গল্প বলার দিকটাও তাঁদের নজর দেওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, আজকের কিশোরেরা আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন, তাদের মুখে সর্বদা ঘুরছে মিলিটারী, এ-আর-পি, বোমা, কন্ট্রোল, র‍্যাশান ইত্যাদি। বুভুক্ষার অভিজ্ঞতাও তাদের হয়েছে, উপরন্তু তারা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, সুতরাং এই নতুন যুগের সচেতন কিশোরদের

জন্য সচেতন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাদের সাহিত্যের আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার। সেইজন্য তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে জাতি গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে সাহিত্যিকদের নতুন সাহিত্য রচনার নতুন ব্রত গ্রহণ করতে আমরা দাবি জানাচ্ছি।"

৩৭

'স্বাধীনতা' পত্রিকাটি ছিল সুকান্তর অত্যন্ত প্রিয়। মনপ্রাণ ঢেলে সে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। '৪২ সালের আন্দোলন সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির চিন্তাধারার এবং মতবাদের স্মৃতি তখনও অনেকের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাই এ কাজে সাফল্য ছিল কঠিন। ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যাচ্ছিল এবং 'স্বাধীনতা' কাগজটি স্থান করে নিচ্ছিল পার্টি দরদী এবং সভ্যদের গণ্ডী পেরিয়ে সাধারণের মনে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাই সুকান্ত—১৯৪৬ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর রেড-এইড কিওর হোম থেকে আমায় যে চিঠি লিখেছিল, তার শেষ অংশটুকু এখানে তুলে ধরছি যাতে বোঝা যায় এই 'স্বাধীনতা' পত্রিকাটি সুকান্তর কত প্রিয় ছিল।

'……মেজদার মুখে শুনলাম—তুই নাকি প্রত্যহ 'স্বাধীনতা' কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত 'স্বাধীনতা' রাখলে আরও খুশি হব………' (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

দৈনিক স্বাধীনতা ছাড়াও স্বাধীনতার যে সব বিশেষ সংস্করণ যেমন শারদীয়া বা অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশিত হত, তাতেও সুকান্ত বরাবর লেখা দিত।

সুকান্ত ছোটদের জন্য লেখার কথা, তার সদাব্যস্ত দিনগুলোর মাঝেও ভুলে থাকে নি। 'স্বাধীনতা'র বিশেষ সংখ্যা কিশোর-সভা আসরে তার লেখা যেমন প্রকাশিত হত, তেমনই অন্যান্য কিশোর পত্রিকাতেও সুকান্ত লেখা দিত। একবার একটা চিঠিতে সে কোন্ কোন্ পূজোসংখ্যায় লিখেছে জানতে চাওয়াতে, সুকান্ত জানিয়েছিল যে সে ছোটদের এবং বড়দের অনেকগুলো শারদীয়া সংখ্যা এবং সংকলনে লিখছে।

সুকান্তর চরিত্রের একটা রহস্যময় দিক ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে নিজের সম্বন্ধে কথা ও খুবই অল্প বলত। প্রথমত ও ছিল প্রচার-বিমুখ এবং ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে অসাধারণ উদাসীন। কিন্তু ওকে নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে ও যে কোথায় কি ভাবে কি কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখে অথবা কি কারণে করে এই অকারণ অমানুষিক পরিশ্রম এবং স্নানাহারের প্রতি অনিয়ম তা ও বিশেষ বলতে চাইত না। এমনকি ও যে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমেছে এবং সংগ্রহ করেছে পার্টির সদস্যপদ এসব খবর আমরা সংগ্রহ করেছিলাম অন্যান্য সূত্র থেকে। সে যখন কিশোর-বাহিনীর সভ্যদের পরামর্শ দিচ্ছে লেখাপড়া করবার, নিয়মনিষ্ঠ হবার এবং ভাল কাজ করে অভিভাবকদের খুশি করার, তখন কিন্তু নিজের ব্যাপারে সে করছে চরম অবহেলা এবং নিয়মশৃঙ্খলাহীনতার জন্য করছে অভিভাবকদের বিরক্তি উৎপাদন।

নিজের লেখা সম্বন্ধেও বেশী আলোচনা ও কারুর সঙ্গে করত না। তবে অন্তরঙ্গ মহলে মাঝে মাঝে কবিতা পড়ে শোনাত এবং ওর লেখার বেশী প্রশংসা করলে সংকোচ বোধ করত। নিজের লেখা যখন পরিণতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন যদি তার অল্পবয়সের কোন লেখা তুলে ধরা হত—তবে ওগুলোকে নেহাৎই ছেলে-মানুষী বলে আখ্যা দিত এবং টানাটানি কাড়াকাড়ি করে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করত। আমার অনুমান এ কারণেই সে তার অনেক পুরনো লেখা নিজহাতেই নষ্ট করে ফেলেছে।

যা বলছিলাম, সে সব সময়ই নিজেকে একটা রহস্যময় অনিয়মের আড়ালে ঢেকে রাখত, কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখত তার দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচী। না ছিল তার অমরত্বের লোভ, না ছিল তার আত্মপ্রচারের আগ্রহ। অপরের লেখাকে সে প্রাণ ভরে প্রশংসা করত, দিত অমূল্য সম্মান।

তার চারিধারে তবুও ধীরে ধীরে জড়ো হতে আরম্ভ করেছিলেন বাংলাদেশের অনেক কবি ও সাহিত্যিক তার সান্নিধ্য পাবার বাসনায়। একটা দুপুরের কথা আজও মনে আছে। সম্ভবত ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিক। ২০নং নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাড়ীতে গেছি। ও তখন একজনের সঙ্গে গল্প করছে বসে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল

তার, কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী। এঁর বারংবার পাড়াপীড়িতে সুকান্ত তার লেখা দু'একটি কবিতা যেমন, 'সিগারেট', 'একটি মোরগের কাহিনী' আর 'সিড়ি' এগুলি পড়ে শোনাল। এই স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

সুকান্ত সম্বন্ধে একটা প্রচার চালু আছে যে সে নাকি অসম্ভব দরিদ্র ছিল। খাওয়া-পরা ঠিকমত জুটতো না এবং এটাই তার অসুখ এবং অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

এতক্ষণ পর্যন্ত কবির যে চিত্র আমি এঁকেছি, তার যে পরিচয় দিয়েছি তাতে কোথাও দেখা যায় নি যে সে অর্থাভাবে খাওয়া-পরার কোন কষ্টভোগ করছে। বরং দেখা গেছে তার বিপরীত। সদাব্যস্ত এক তরুণ নানাকাজে নিজেকে আটকে রেখেছে। খাওয়াপরা, সাধারণ দুঃখদারিদ্র্য এসবের অনেক উর্ধ্বে সে।

সুকান্তর চিত্রগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। এই চিত্রগুলির মধ্যে কোথাও অপুষ্টি বা ক্ষুধায় কাতর ম্লান পাণ্ডুর মুখের ছাপ পড়ে নি। সুকান্তর ছেলেবেলা কেটেছে মামাবাড়ীতে প্রাচুর্যের মধ্যে। এ পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে ক্ষুধার তাড়না নয়, বাহুল্যের তাড়নাই বেশী। এখানে যা খুশি চাওয়া, পাওয়া এবং খাওয়ার সুযোগ ছিল অঢেল।

সুকান্তর বাবার এবং জ্যাঠামশায়ের একান্নবর্তী পরিবারের দারিদ্র্য নয়, প্রাচুর্যই ছিল নিত্যসঙ্গী। রোজই এখানে যগ্যিবাড়ীর রান্না হত। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ছাড়া দোকান কর্মচারী এবং বাইরের অন্যান্যরা মিলিয়ে অনেক বাড়তি পাত পড়ত দুবেলা। খাওয়া দাওয়া হৈ-হল্লোড় আর অনাবিল আনন্দের ক্ষেত্র ছিল আমার পিসীমার বাড়ী। আজও মনে আছে যখন আমাদের বাড়ীতে চায়ের পাটও শুরু হয় নি অর্থাৎ কেউই চা খেত না তখন পিসীমার বাড়ী গিয়ে আমরা চা, কফি এবং কোকোর স্বাদ গ্রহণ করেছি। আর শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, এখানে আনন্দ অনুষ্ঠানেরও ছিল বিচিত্র সমাবেশ। তাই শুধু পেটের ক্ষুধা নয় মনের ক্ষুধা মেটাবার সুযোগও ছিল এখানে যথেষ্ট। এই পরিবেশে সুকান্তর শিশুকাল কেটেছে, এটা মনে রাখা দরকার।

পরবর্তীকালে যখন এই পরিবার পৃথগন্ন হয়ে গেল, তখনও সুকান্তদের পরিবারের অর্থাৎ আমার মেজমাসীমার বাড়ী খাওয়া-দাওয়ার কোন অভাব দেখি নি কোনদিন। নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার পরেও অনেক বাড়তি খাবার বরং বিলিয়ে দেওয়া হত ঝি, চাকর, জমাদার, ঝাড়ুদার—এদের মধ্যে। গৃহিণীর অভাবে এখানেও ছিল বাহুল্যের ছড়াছড়ি।

'সারস্বত লাইব্রেরী' নামক পুস্তক প্রতিষ্ঠানের আয় ছাড়াও আমার সেজ মেসোমশাই নিবারণচন্দ্রের অন্য আয় ছিল। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত। যজমান মহলে তাঁর সম্মান, নামডাক এবং কাজ ছিল খুবই। পৌরোহিত্য সূত্রে কলকাতার বহু ধনী পরিবারে তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। এছাড়া সুশীলদার চাকুরী জীবন শুরু হয়েছে ১৯৪৩ সাল থেকে। তাই সুকান্ত দারিদ্র্যজনিত অপুষ্টির শিকার হয় নি কোনদিন।

সেজমাসিমার অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবারের নিয়মশৃঙ্খলা এবং সংসার পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। অযত্ন অনিয়ম আর অব্যবস্থা এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই পরিবারের নিত্যসঙ্গী। যার ফল মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছিল সুকান্তর ভাবপ্রবণ মনে। পরিবারের এই পরিবেশ তাকে করেছিল ঘরছাড়া। এ সব কথা আগেই বলা হয়েছে। এ কথাগুলিকে মনে রাখলে সুকান্তর ব্যাধির কারণ বুঝতে সুবিধা হবে।

হয়ত সুকান্তর কবিতাগুলিকেই এই ভুলের জন্য দায়ী করা হত। কারণ সাধারণ মানুষ কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আজও অজ্ঞ থাকায় সুকান্তর কবিতাগুলি যা দুঃখ-দারিদ্র্য অবহেলা ও বেদনাকে ভাষা দিয়েছে, সেগুলি কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতির প্রকাশ বলে অনেকে মনে করেছে এবং এই অনুমানই মানুষের মনে স্থায়ী বিশ্বাস রূপে দেখা দিয়েছে।

কবি জনগণের কবি, তাদের দুঃখ, বেদনা আর হতাশার কথার রূপ দেওয়া যে তারই কাজ। কিন্তু তার কবিতাগুলিকে যদি তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখদারিদ্র্যের অভাব-অপুষ্টির কারণজনিত অন্তরের অগ্নুদ্গীরণ বলে বিশ্বাস করা হয় তবে সে বিশ্বাস, সে সিদ্ধান্ত একান্তই ভ্রান্ত।

প্রথমদিকে সুকান্ত হয়েছিল দমবন্ধকরা এক পরিবেশের শিকার। বাড়ীর

আবহাওয়া কেমন ছিল, একথা আগে বলা হয়েছে। প্রথমদিকে সে যখন নানা সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখত, তখন তার নাওয়া-খাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বাইরের মাইনে করা লোক এসে রান্না করে দিয়ে যেত, কোনদিনই স্নেহ ভালবাসা মাখান হাতের পরিবেশন, সুকান্ত এখান থেকে পায় নি। নানা কাজের ফাঁকে, সূর্য যখন তার দৈনন্দিন আবর্তনের শেষপ্রান্তে ঝুলে পড়তো পশ্চিমদিকে অনেকখানি নীচে, তখন সুকান্ত ক্লান্ত পায়ে বাড়ী ফিরে কখনও স্নান করে কখনও বা স্নান না করেই তার উদ্দেশ্যে ঢেকে রাখা ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত এবং অন্য খাদ্য সামগ্রী কিছুটা গ্রহণ করত, কিছুটা বা ফেলে রেখে দিত। তার কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ার কেউই যেমন ছিল না, তেমনই নিয়মিত অনিয়ম চলায় ক্ষুধা নামক অনুভূতিটা যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছিল। অন্নগ্রহণটা শুধুমাত্র ক্ষুধার উপশমের জন্যই নয়, এটা শারীরিক প্রয়োজন এটাও তার মনে ছিল কিনা। এতো গেল দিনের কথা, রাত্রে সুকান্ত কখন যে বাড়ী ঢুকত তা বাড়ীর অনেকেই জানত না। একদিকে যেমন গুরুজনদের এড়িয়ে চলার স্পৃহা তাকে পেয়ে বসেছিল, অপরদিকে নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখায় রাতের গভীরতাও সে ভুলে যেত। তাই বাড়ীর খাবার কোনদিন বা খেত, কোনদিন বা হয়ত পড়েই থাকত। বাড়ীর লোকদের পক্ষেও কতকটা বা বিরক্তিতে, খানিকটা বা দেখার অভাবে ওর খাওয়া দাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কোন দরদীজনের স্পর্শ থাকলে, বিশেষ করে আমার সেজমাসিমা জীবিত থাকলে এ অবস্থাটা কখনই আসতে পারতো না।

বিকেলের জলখাবার? সে এক সমস্যা, কে সুকান্তর জন্য জলখাবার সাজিয়ে বসে আছে? আর সুকান্তর সময়ই বা কোথায় জলখাবারের নামে সময় নষ্ট করবার। তাই ক্ষিদের কোন অনুভূতি যদি জেগেও ওঠে কাকে বলবে সে; নিজের খাওয়ার কথা বলার মত লজ্জা আর কিছু আছে কি! নিজের প্রয়োজনের কথা, তা সে যত তুচ্ছই হোক তা অপরকে শোনান—সুকান্তর পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আর তা ছাড়া যদি কেউ ওকে খাবার কথা বলত সেটাও তো সুকান্তর কাছে পরম লজ্জা আর সংকোচের কথা।

একবার নতেদা কলেজ স্ট্রীটের ওয়াই. এম. সি. এ-তে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারছে। হঠাৎ সুকান্তকে পথ দিয়ে যেতে দেখে তাকে ডেকে জোর করে কিছু খাইয়ে দিয়েছিল। সুকান্ত স্বাভাবিক সংকোচবশে প্রথমে না, না করলেও পরে কিন্তু পরম তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। এতে বোঝা গেল সে যথেষ্ট ক্ষুধিত। এ স্মৃতি আজও নতেদার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সকালের জলখাবারও অনেক দিনই সুকান্তর খাওয়া হত না। কারণ ঘুম থেকে উঠেই তো তাকে বেরুতে হবে। সময় কোথায়, বাজে ব্যাপারে মন দেবার। তাই সকাল, দুপুর, বিকাল আর রাত্রি এই চারবার খাওয়ার ব্যাপারে সুকান্তর কোন নিয়ম নিষ্ঠার বালাই ছিল না। সে যে মুক্ত স্বাধীন তরুণ। এসব সাধারণ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসর কোথায় তার?

৩৮

নানা কাজে সুকান্তর অমানুষিক পরিশ্রম আর অসাধারণ উৎসাহের কথা এর আগেই বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে তার পায়ে হাঁটার কথা। মাইলের পর মাইল সে চলতে পারতো কারণে এবং অকারণে। এর আগেই বলেছি সে সারা সহরে চরকি দিয়ে ফিরতো। আমার অনুমান দশ-বারো মাইল রাস্তা চলা তার রোজকার কাজ ছিল। প্রয়োজন মত মাইল কয়েক বাড়িয়ে দেওয়াও কোন কষ্টের ছিল না তার কাছে। পথ চলা ছিল তার বিলাস। একবার বালীগঞ্জে গেছে সুকান্ত পায়ে হেঁটে। ফেরবার সময় খোকন মামাকে বললে একটু এগিয়ে দেওয়ার জন্য। খোকন জানে ওকে আবার ফিরতে হবে, তাই ও একটা সাইকেল নিয়ে এসেছিল। ল্যান্সডাউন বা শরৎ বোস রোড ধরে ওরা এগিয়ে চললো। খোকন দু-একবার সাইকেল চড়ার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সুকান্ত হাঁটাই পছন্দ করছিল। হাজরা লেন থেকে পথ চলে খোকন এলগিন রোড পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল। এখান থেকে সুকান্ত সোজা হাঁটা পথে বেলেঘাটায় ফিরে গেল। এটা ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি হবে।

স্নানের ব্যাপারেও সুকান্তর ছিল দারুণ অনিয়ম। আমরা গরম কালে

দু-তিন বার স্নান করি। কিন্তু সুকান্ত কোন কোন দিন সময়ের অভাবে দিনে একবারও স্নান করে নি। নিজের শরীরের প্রতি ওর ছিল দারুণ অবহেলা।

এই সঙ্গে আর একটা সমস্যা ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের পর থেকে সুকান্ত কখন কোথায় থাকে ঠিক ছিল না। সুবিধা মতো বৈমাত্রেয় বড ভাই সেজদার কাছে, কখনও বালীগঞ্জের খোকনের কাছে, কখনও আমাদের বাড়ী এবং কখনও বা আমার পিসীমা অর্থাৎ ওর জ্যেঠিমার বাড়ী থাকা শুরু করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সুকান্ত কোথায় থাকবে কখন কোথায় গিয়ে হাজির হবে একথা বোধহয় ও নিজেও জানতো না। কোনদিন হয়তো রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষ প্রান্তে সুকান্ত মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন নিয়ে হাজির হবে, পিসীমার বাড়ী বা আমাদের বাড়ী। তখন তার দ্বিপ্রাহরিক খাওয়া হয়েছে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই। কারণ সে সত্য গোপন করবে অম্লানবদনে, কারণ তার জন্য যেন বাড়ীতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। তার খাওয়া হয়েছে কিনা জানা কারুর সাধ্য ছিল না। কারণ তার বাড়ীর লোক মনে করে সে যখন বাড়ী ফেরে নি তখন নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গেছে এবং সেখানে খাওয়া দাওয়া করেছে। এইভাবে হয়তো দু-এক দিন তার খাওয়াই হয়ে উঠলো না। কিন্তু এ অনাহার কি দারিদ্র্যের কারণে ?

এমনি করে একদিকে স্নানাহারের অবহেলা আর অনিয়ম, অন্যদিকে মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটা আর পার্টির কাজে দিনরাত্রির অমানুষিক শারীরিক পরিশ্রম, তার সহ্য হচ্ছিল না। মনের শক্তি ছিল তার অসীম, ছিল দারুণ হৃদয়াবেগ আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর সর্বোপরি সে ছিল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী তাই প্রথম প্রথম শরীরের প্রতি এই অত্যাচার অনিয়ম আর অবহেলা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল।

১৯৪৪ সালের পূজোর সময় সুকান্ত আমার পিসীমার বাড়ীর লোকদের সঙ্গে কয়েকদিন বেনারসে বেড়াতে গিয়েছিল। এখানে গিয়ে ওর জীবনের প্রথম বড় অসুখ হলো। মালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে ওকে আক্রান্ত করে একেবারে কাহিল করে ফেললো। ভুগে সেরে ওঠার পর সে পথ্য করল, কিন্তু কয়েকদিন পর আবার জ্বরে পড়ল। এতে ও খুবই দুর্বল হয়ে

পড়ে। এই হল ওর অসুখের শুরু। ওর নিজের ভাষায় বলতে গিয়ে অরুণাচলকে লেখা একটা চিঠির অংশ তুলে ধরছি "......যে-ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব করে তুলেছে, আমি এখানে আসার পঞ্চমদিনে তারই কবলে পড়ে সম্প্রতি আরোগ্যলাভ করার পথে......ভাল লাগছে না: অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মত ম্লান লাগছে। আর শরীর এখন খুবই দুর্বল, কারণ এ কদিন সাঙ্ঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট করেই লিখতে হচ্ছে। আর লিখতে পারছি না।" (সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

দ্বিতীয় বার অসুখের সময় ও লিখলো :

"........শুনে বোধহয় দুঃখিত হবি যে, আমি আবার অসুখে পড়েছি ; তবে এবারে বোধহয় অল্পের ওপর দিয়ে যাবে।......কিন্তু বেলেঘাটায় ফিরে যেতে আশঙ্কা হচ্ছে। কেননা বেলেঘাটাই এখন ম্যালেরিয়া-সাম্রাজ্যের রাজধানী। আর আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হয়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি? বিশেষত আমি যখন ম্যালেরিয়া-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে আর রাজী নই।......এখন আবার জ্বর আসছে।" .(সুকান্ত-সমগ্র : পত্রগুচ্ছ)

মেজবৌদির সেবাগুণে, সুকান্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। মেজবৌদি সুকান্তকে অত্যন্ত ভালবাসত আর সেবাশুশ্রূষার ব্যাপারে সে অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠ ছিল, কলকাতায় ফিরে সুকান্ত শ্যামবাজারে তাদের কাছেই আরও কিছুদিন থাকলো এবং সেখান থেকেই সে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগলো। ১৯৪৫ সালটা ছিল তার পরীক্ষা দেবার বছর। দুর্ভাগ্য তার, অঙ্কে ফেল করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারলো না। যেহেতু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, সেই হেতু তাকে পরীক্ষা পাশ করতেই হবে। সমাজের বাধাধরা পথেই তাকে চলতে হবে। তার মন মুক্তি চাইলেও সামাজিক পরিবেশ তো তাকে ছাড়বে না। আর তা ছাড়া পরীক্ষার ফেলটা তো একটা সামাজিক লজ্জাও বটে। তাই সুকান্ত এ ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল। শরীর আর মনের উপর যুগপৎ আক্রমণে সে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লো।

প্রথমবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরই সুকান্ত টাইফয়েডে আক্রান্ত

হল। এবারও তার ভোগান্তি বেশ কিছুদিন চললো এবং তার মনের আর শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়লো খুবই। দুর্বলকে করে তুললো দুর্বলতর। এই অসুখের সময় পিসীমা, মেজবৌদির সেবাশুশ্রূষা ওকে রোগমুক্তিতে সাহায্য করল।

যাই হোক সুকান্ত আবার দ্বিতীয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হতে লাগলো। সুশীলদা বাড়ীতে একজন অঙ্কের শিক্ষক নিযুক্ত করলো সুকান্তকে অঙ্কে তালিম দেওয়ার জন্য।

এই সময়ে সকলে আশা করেছে সুকান্ত একদিকে যেমন বাড়ী বসে পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে, অপরদিকে তেমনি বাইরে বেরোনটা বন্ধ হলে তার দুর্বল শরীর পাবে কিছু বিশ্রাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিশ্রামের সুযোগ সুকান্তর আর পাওয়া হল না। কারণ ১৯৪৫ এর শেষপ্রান্তে কলকাতার বুকে তখন শুরু হয়ে গেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের বিচারের প্রহসনের প্রতিবাদে। সুকান্ত কি তখন ঘরে বসে থাকতে পারে! নিজের শরীরের কথা ভাববার তার অবকাশ কোথায়। হোক শরীর দুর্বল, না থাকুক প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, কিন্তু আছে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস। তাই সুকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়লো এই আন্দোলনের মধ্যে দুরন্ত আবেগে। আবার শুরু হল খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরার অনিয়ম। জনতার কবি জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বারবার। দেখা গেছে ১৯৪৫-৪৬ সালে কলকাতায় যতগুলি বড় বড় রাজনৈতিক আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে সুকান্ত জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

এই সব আন্দোলন যাতে ঠিক পথে চলে এবং জনতার কোনরকম অন্যায় আচরণ বা ভুলের ফলে যাতে আন্দোলনের ধারা বাঁকাপথ না ধরতে পারে, তার দিকে সুকান্তর কঠিন দৃষ্টি ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীশান্তিময় রায়ের লেখা 'রক্তকরবী' থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরছি :

" .....এরপর ১৯৪৪ সাল, যুদ্ধক্লান্ত বছর যখন গড়িয়ে পড়লো '৪৫ সালের শেষের দিকে তখন কলকাতার দিকে দিকে বিদ্রোহ।

ওই সময় ধর্মতলার এক বিশাল মিছিলের মধ্যে সুকান্ত আমার মুখোমুখি হলো। সেদিন সুকান্তর চোখে ছিল দীপ্তি, কিন্তু বড় ক্লান্ত মনে হলো তাকে। সুকান্তর মনের বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, চোখে মুখে তারই আভা।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল, মৌলালির বাঁক পেরিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালের দিকে ব্যাফেল ওয়ালের কালো ছায়ায় অনেক ভীড় জমেছিল। ঘন ঘন মিলিটারী ট্রাকের আনা-গোনা। এই সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়লো অদূরে শিয়ালদার কোণে এক অসহায় ফিরিঙ্গী মেয়েকে ঘিরে কিছু ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভকারীর জটলা। ইংরাজ সরকারের ওপর ওদের যা কিছু ক্ষোভ আর ক্রোধ সব যেন একা মেয়েটির ওপর অশুভ অপমান হয়ে ঝরে পড়তে চাইছে।

দেখে আমি চমকে উঠলাম। বেপরোয়াভাবে দৌড়ে গেলাম সেই ভীড়ের মধ্যে, মেয়েটিকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য।

চারিদিক থেকে আমার ওপর বর্ষিত হলো শ্লেষ-ব্যঙ্গ-কটুমন্তব্য, দালাল-দালাল, ব্রিটিশের দালাল, দেশের শত্রু—

কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারলো না। হাতে ছিল আমার একটি রিভলবার। সেদিকে তাকিয়ে তাদের নিশ্চুপ হতে হলো।

এই সময় আমার ঠিক পাশেই সুকান্তর সাহসী বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: শান্তিদা, আপনি দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি পার্টি অফিসে খবর দিচ্ছি।

কাছেই ছিল আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস। আমি মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর বিদ্যুৎজ্বলা চোখের দিকে তাকালাম। ওর চোখে মুখে সেদিন ওই ফিরিঙ্গী মেয়েটির অপমানকারী দুর্বৃত্তদের প্রতি যে ঘৃণা আমি দেখেছিলাম তা কোনদিনই ভুলবার নয়।

ইংরাজ হোক, তবু তো সে অসহায় মেয়ে। সুকান্ত সেই অপমানকারী দুর্বৃত্তদের জন্য থুথু নিক্ষেপ করেছিল সেদিন।

ওই অসহায় ব্রিটিশ মহিলাকে বাঁচাবার জন্য সুকান্তর সেদিনের সেই ব্যগ্রতাকে আমি তার চরিত্রের একটা দিক হিসাবেই এখানে চিহ্নিত করছি।”

সুকান্তর সজাগ দৃষ্টি ছিল, যারা আন্দোলনে আহত হয়েছে তাদের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা এবং তাদের আশাহত বুকে সাহস আর মনোবল

জাগিয়ে তোলা। সম্ভবতঃ রসিদ আলী দিবসের এক গণমিছিলে একজন আহতকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্ত আর আমি গিয়েছিলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা ছোট গলিতে একটা ছোট ঘরে প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্য। এখনও মনে আছে, দেখলাম শুশ্রূষাকারীরা সকলেই সুকান্তর পরিচিত, আমার সঙ্গে অবশ্য তাদের কোন পরিচয় ছিল না।

প্রতি আন্দোলনেই তার শরীরের ওপর দিয়ে গেছে প্রচণ্ড ধকল। আমরা এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি বারবার, বলেছি তার প্রয়োজনীয় বিশ্রামের কথা, বলেছি শরীরকে নষ্ট করে সংসারের কোন কাজই হয় না, হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এসব কথার কোন গুরুত্বই সে কোনদিন দেয় নি। আমরা বলেছি যে, সবাইকেই যদি সাধারণ কর্মীর মত সংগ্রামী জনতার পাশে দাঁড়াতে হয়, তাহলে কবি হিসাবে ওর ভূমিকা কি নগণ্য হয়ে যাবে না। তাকে বলেছি সে হচ্ছে লেখক, কবি, সাহিত্যিক—তার কাজ তার লেখার মাধ্যমে জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, সংগ্রামী জনতার সৃষ্টি করা। ব্যক্তিগতভাবে তার এই সশরীরে আন্দোলনের সামিল হওয়াটা আমার মনঃপূত ছিল না। তাই আমাদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক রাগারাগি, অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি চেয়েছি ওর বাইরে বেরোনোটা বন্ধ করতে, ওকে ঘরে আটকাতে যাতে ও প্রয়োজনীয় অবকাশ পায় অসুস্থ শরীরটাকে সুস্থ করবার। এই নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক রাগারাগি, অনেক মন কষাকষি হয়েছে। কিন্তু তবু তা সম্ভব হয় নি।

যা বলছিলাম, কলকাতায় যত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ছাত্র বিক্ষোভের আয়োজন হয়েছে তার প্রতিটিতে সুকান্ত ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিয়েছে। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট হয়েছিল। এখানেও সুকান্তকে দেখা গেছে সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে সহযোগিতা করতে। ১৯৪৫ আর ১৯৪৬ সালে বাঙলাদেশে বিশেষ করে কলকাতা শহরে যেন আন্দোলন আর ধর্মঘটের জোয়ার এসেছিল। এই ধর্মঘট বা বিদ্রোহের ক্রমবিকাশে দেখা গেছে ভারতের

নানাস্থানে পুলিশী ধর্মঘট এবং সর্বোপরি ভারতের নৌ-বিদ্রোহ। এ সমস্ত কাণ্ডকারখানার শুধু সাক্ষী হিসাবেই সুকান্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে নি, সে কলম ধরেছে, বুঝেছে এই অবাধ্যতার আর আন্দোলনের মাঝ দিয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে মুক্তির পথ, দেশের স্বাধীনতার পথ। সে লিখেছে :

মানবো না বাধা, মানবো না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি,
সাধ্য কার ?

এই আন্দোলন আর বিক্ষোভের বন্যায় অনেকের মনে পড়ে যায় অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তখনও কারাগারে অথবা আন্দামানে বন্দীজীবন যাপন করছেন। তাই তাঁদের মুক্তির জন্য সারা বাংলায় ছাত্রবিক্ষোভ আর রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার আসে। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ধাক্কায় বন্দীরা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন সাধারণের সামনে। সুকান্ত বরাবরই ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই বাংলার বিপ্লবীদের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার উত্তরা সিনেমা হলে। এখানে পড়া হয়েছিল সুকান্তর কবিতা 'মুক্ত বীরদের প্রতি'। এই কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়,
উদ্দাম জয়যাত্রার পথে জেনো ও কিছুই নয়।
তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।
আবার জ্বালাব বাতি,
হাজার সেলাম তাই নাও আজ, শেষযুদ্ধের সাথী॥

ছাত্রনেতা, ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সুকান্তর সঙ্গে এই সংস্থাটির সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে এবং একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে তাকে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে

দেখা যায়। 'সুকান্ত-স্মৃতি' রচনায় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য সুকান্তর এই সময়কার কাজকর্মের কিছু কথা লিখেছেন। এই লেখার কিছুটা অংশ—

"...তাছাড়া তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্কস্‌বাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেন্ট ও অপরদিকে গান, নাটক ও কবিতা-পাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র ফেডারেশনের গণনাট্য আন্দোলন গণনাট্য সংঘেরও পূর্বসূরী। পরবর্তীকালে গান, নাটক ও ছায়াছবির জগতে বাংলার যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাদের অনেকেই কোন না কোনভাবে গোড়ায় ছাত্র-ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অংশীদার ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সর্বশ্রী সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সুর ও ছন্দের কবিতা তখনকার আন্দোলনে প্রভূত উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়। এ পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতি মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নূতন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।"

৩৯

এর পরেই সুকান্ত কালাজ্বরে আক্রান্ত হল, ভুগলো বেশ কিছু দিন। এটা ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার কিছু পরের কথা। প্রথমে বাড়ীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল, কিন্তু রোগের সম্পূর্ণ বিনাশ হল না, উপশম হল না জ্বরের। আগেই বলেছি ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সুকান্তর ছিল প্রীতির সম্পর্ক। সুকান্তর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে এঁর সঙ্গে তার

পরিচয় এবং জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এরা দু'জনে পরমাত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল। তখন কম্যুনিস্ট পার্টির হাসপাতাল রেড-এইড কিওর হোম ছিল বউবাজার (বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) স্ট্রীটের একটি বাড়ীর দোতলায়। বাড়ীর অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে অন্নদাশঙ্কর একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে সুকান্তকে নিয়ে এই হাসপাতালে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। এই হাসপাতাল তখন সবে চালু হয়েছে তাই চিকিৎসা এবং পরিচালন ব্যবস্থার কিছু গলদ ছিল।

বারবার রোগে ভুগে ও বেশী পরিশ্রম করে সুকান্তর শরীর ভেঙে পড়েছিল। তার মনেও জেগে উঠেছিল হতাশা। তার পার্টির প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠার পরিবর্তে সে যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা যেন সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। এই সময়ে তার মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তার লেখা একটি চিঠিতে "......আমার খবর : শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময় (ভয় নেই, আঘাতটা প্রেমঘটিত নয়)। আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ। গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষভাবে স্বাস্থ্যহীন হবার পর আর বিশ্রাম পাই নি ভালমতো। একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও" ঘটে নি আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি ; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে উঠেই গত তিনমাস ধরে খাটছি। বুঝতে পারি নি স্বাস্থ্যের অযোগ্যতা। হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম। একটু দাঁড়াতে পেরেই গত দেড়মাস ধরে......জন্যে অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে ...কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা! আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের "ওষুধপথ্যিহীন" কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হই নি। আমার লেখক-সত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে। দুই

সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে ; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহে আর মনে আমি দুর্বল : একান্ত অসহায় আমি ? আমার প্রেম সম্পর্কে সম্প্রতি আমি উদাসীন। অর্থোপার্জন সম্পর্কেই কেবল আগ্রহশীল । কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের ; একখানাও জামা নেই, সে জন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।......"

মেজদার কথায় বলি—"সুকান্ত তখন স্বাধীনতার পাতায় 'কিশোর সভা' পরিচালনা শুরু করেছে। ওর বৌদিকে (মেজবৌদি) এসে সোল্লাসে জানালো, পার্টি-ওয়ার্কার হিসাবে মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে বলেছে। সেই ত্রিশ টাকা দিয়ে কত কি করবার কল্পনার ফানুষ ওড়াচ্ছে বাস্তববাদী সুকান্ত, কাজ করার মধ্যে খাওয়া এবং প্রয়োজনবোধে ট্রামে বাসে চড়ে সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর খরচও সেই পরিকল্পনার মধ্যে।

মাস শেষ হল। সুকান্ত মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলো। হতাশায় মুখ কালো করে বৌদিকে বললো,......দা বললেন তুমি তো ঘরের ছেলে, তোমাকে আর কি পয়সা দেবো। তাছাড়া জানো তো পার্টির অবস্থা। এই পাঁচ টাকা ট্রাম ভাড়া বরং নাও ।"

মেজদার লেখা 'সুকান্তর শেষজীবন' থেকে আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নীচে তুলে ধরছি। এর থেকে বোঝা যাবে যে সুকান্তর অকালমৃত্যুর জন্য ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির দায়িত্ব কিছু কম নয়। মনে আছে সুকান্তর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঘেলু মন্তব্য করেছিল—'অমানুষিক পরিশ্রম করে সুকান্ত যেমন অল্প বয়সে অর্জন করেছিল পার্টির সদস্যপদ, তেমনি অর্জন করেছিল অকালমৃত্যু।' যাই হোক, মেজদার কথায় বলি, "সুকান্ত প্রাণ দিয়ে খেটেছে। সে কি আদর্শের জন্য না পার্টির জন্য ? পার্টির জন্য হলে নেতৃস্থানায়রা, আর আদর্শের জন্য হলে সেই আদর্শের অগ্রজ ধারকেরা যদি একটু ভাবতেন, দেখতেন, চেষ্টা করতেন, জোর করে কিছু খাওয়াতেন বা ধমকে পাঠাতেন খেয়ে আসবার জন্য, তাহলে হয়তো সুকান্তর ক্ষয়রোগ নাও হতে পারতো।"

সুকান্তর মৃত্যুর ক'দিন বাদেই ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের হলে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন :

সুকান্তর বেলায় আমরা যে ত্রুটি, যে ভুল করেছি তা যেন আর কখনো না করি, এই হল আমাদের সুকান্তর মৃত্যুর শিক্ষা। সুকান্ত চুটিয়ে কাজ করেছে, আমরা খুশি হয়ে বাহবা দিয়েছি। কিন্তু ওর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতাম, সুকান্তর সারাদিন খাওয়া হয় নি। ও যে সারাদিন এত কাজ করেছে, কিছু খেয়েছে তো—ঐ প্রশ্নটুকুও আমাদের মনে উঁকি মারে নি। আমাদের এই দোষের জন্য ওকে আমরা হারালাম।

[স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি। বক্তব্য এই, ভাষা হয়ত এক নয়।]

সুকান্ত ফুলের মালাগাছি বিকোতে এসেছিল। সবাই পরখ করেছে, স্নেহ করবে কার এমন দায় পড়েছে।

সুকান্তর মৃত্যুর পরে সুকান্তদরদী কিছু আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের উদয় হয়েছে যারা সুকান্তর দুঃখে মায়াকান্নার আসর জমিয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে চলেছে হাজার রকম সত্যমিথ্যা। অথচ তার মৃত্যুর পূর্বে এঁদের কখনও দেখা যায় নি তার ধারে কাছে আসতে বা তার আশাহত বুকে আশার সঞ্চার করতে।

রেড-এইড কিওর হোমের এই আস্তানা সুকান্তর ভাল লাগছিল না; তাই পাঁচ-সাতদিন পরেই যখন খোকন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল, তখনই সে ওখান থেকে ছুটি নিয়ে ওর সঙ্গে বেলেঘাটার বাড়ীতে চলে এলো।

এর দু'একমাস বাদেই রেড-এইড-কিওর হোম নবপর্যায়ে তার কার্যক্রম শুরু করলো ১০নং রওডন স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে। চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি হল, উন্নত হল পরিচালন ব্যবস্থা। অসুস্থ কম্যুনিস্ট কর্মীদের বিশেষ এক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করলো। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির পরিচালনায় কম্যুনিস্ট সদস্য এবং পার্টি দরদীরা এই হাসপাতালে চিকিৎসা করতেন। সম্ভবত অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের উদ্যমেই সুকান্ত আবার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ১৯৪৬ সালের অক্টোবরের প্রথমদিকে। খুশি হলাম আমরা (আমি, ঘেলু, রমা, খোকন), ভাবলাম ভালই হল, সুকান্ত এবার নিয়মিত বিশ্রাম পাবে, সেবা, যত্ন আর আরামের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে আমাদের কাছে। আজ মনে পড়ে না, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মনে মনে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়েছিলাম কিনা।

সুকান্ত রেড-এইড-কিওর হোমে থাকবার সময় এই প্রতিষ্ঠানটির নাম শুনেছিলাম এবং পরে তার কথা ভুলেছি।

এই আশ্রয়ে এসে সুকান্তর দিন কিন্তু ভালই কাটছিল। বই ছিল, ছিল রেডিও। আর ছিল বহুপরিচিতের সান্নিধ্য। এখানে ওর সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলার নামকরা কয়েকজন বিপ্লবীর। এখান থেকে সুকান্ত আমাকে যে সব চিঠি লিখেছিল তা থেকে ওর দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম এবং মানসিক অবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায়। সুকান্ত যাদের পছন্দ করত এমন সব লোকজন, বিশেষ করে ছাত্র নেতা, কৃষক নেতা, বিপ্লবী এবং দেশের নানা স্তরের লোকের সান্নিধ্য ওকে ভারি আনন্দ দিত। ও লিখেছে……'বেশ কাটছে এখানে। সবাই এখানে আপন হয়ে উঠেছে, ভালবাসতে আরম্ভ করেছে আমাকে। ডাক্তার রোগী সবারই আনন্দ আমার সঙ্গে রসিকতায়। এক এক সময় মনে হয় বেশ আছি—শহরের রক্তাক্ত কোলাহলের বাইরে এই নির্জন, শ্যামল ছোট্ট একটু দ্বীপের মত জায়গায় বেশ আছি। কিন্তু তবুও আমার শিকড় গজিয়ে উঠতে পারে নি, বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-সমৃদ্ধ হাতছানি সকাল সন্ধ্যায় ঝলক দিয়ে ওঠে তলোয়ারের মত। এখন আছি বদ্ধ-দীঘির জগতে; যেখান থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে মাছের মত, কর্মচাঞ্চল্যময় পৃথিবীর স্রোতে। সকালের আশ্চর্য অদ্ভুত রোদ্দুর কোন কোনদিন সারাদিন ধরে কেবলই মন্ত্রণা দেয় বেরিয়ে পড়তে; শহর-বন্দর ছাড়িয়ে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলের সবুজে মুখ লুকোতে দেয় অযাচিত পরামর্শ। সত্যিই অসহ্য লাগে কলকাতাকে মনের এইসব মুহূর্তে।……" (সুকান্ত-সমগ্র: পত্রগুচ্ছ)

কলকাতার অবস্থা তখন কেমন? সারা বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন চলছে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। তার ঢেউ মুহুর্মুহু কলকাতার তীরে এসে লাগছে। এখানেও জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। বারবার দাঙ্গা আর কারফিউ।

এই দাঙ্গার কথা সুকান্ত এখানে বসে এত আনন্দঘন পরিবেশেও ভুলতে পারে নি একবারও। এখান থেকে ও আমায় লিখেছিল ওর অনবদ্য ছন্দোময় কবিতা দেওয়ালীর শুভেচ্ছা "দেওয়ালী" কবিতাটি।

এখানে আমরা যেতাম। আমি, মেজদা, সুশীলদা। জায়গাটা মুসলমান অধ্যুষিত বলে সুশীলদা দু'একজন মুসলমান বন্ধু সঙ্গে করে নিয়ে যেত বলে শুনেছি।

দাঙ্গা এবং কারফিউ-এর তাড়নায় ওখানে নিয়মিত দেখা করতে যাবার অসুবিধার জন্যই সম্ভবত সুকান্তকে মাস খানেক বাদে বাড়ী নিয়ে এল সুশীলদা। এই বাড়ীতে বসেই ওর চিকিৎসা চলবে রেড-এইড-কিওর হোমের চিকিৎসকদের দ্বারা। বাড়ী এসে দু'চারদিন সুকান্ত চুপচাপ শুয়ে কাটাল—মাঝে মাঝে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখা হল, রাখা হল জ্বরের চার্ট। তারপর একটু সুস্থ হতেই জ্বর সারতে না সারতেই আবার শুরু হয়ে গেল বাইরে বেরুনো। আবার পুরানো দৈনন্দিন জীবনে কাজের মাঝে ডুব দিল সুকান্ত আবার মাইলের পর মাইল পথ হাঁটা।

আগে বাড়ীর গুরুজনদের এড়িয়ে চলতো সুকান্ত। এবার সে এড়িয়ে চলতে শুরু করল আমাদের। আমাকে, রমাকে ঘেলু-খোকন সবাইকে। এমন কি যে মেজবৌদি আর পিসীমা, মেজদা আর নতেদা ওকে এত ভালবাসত—তাদেরও সুকান্ত নিজের রোগের কথা শরীরের কথা বলা বন্ধ করে দিল।

আবার শুরু হল ঘুরে ঘুরে জ্বর আসা। কখনও বাড়ে কখনও কমে। একেবারে ছেড়ে যাওয়া আর বড একটা হয় না। সুকান্তর এর ফাঁকেই কাজ করে চলেছে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আমরা ছাডা চিকিৎসকেরাও সুকান্তকে নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে চলেছেন পরিপূর্ণ বিশ্রামের। কারুর কথায় যেন সুকান্ত মন দিত না। হয়ত নিজে শরীরের চেয়ে পার্টির কাজের স্বাধীনতা পত্রিকার আর কিশোর সভার হাতছানি ওকে বিশ্রাম নিতে দিত না।

দুরন্ত শিশু যেমন সারাদিন হুড়োহুড়ি করে সন্ধ্যায় মার আঁচলের তলায় এসে আশ্রয় নেয় সুকান্তও তেমনি মাঝে মাঝে এসে বিছানা নিত, যখন তার আর ঘুরে বেডাবার শক্তি ও সামর্থ্য নিঃশেষে শেষ হয়ে যেত। দু চারদিন বাড়ীতে বসে থেকে জ্বর মুক্তি হলেই বা দুর্বলতা কাটলেই আবার বাইরের আহ্বান তাকে ঘরছাড়া করতো।

একদিন এই ব্যাপারে আমাদের বাড়ীতে ওর সঙ্গে হয়ে গেল প্রচণ্ড এক তর্কবিতর্ক। ওকে বোঝালাম যে, যদি ও এভাবে চলে তবে সংসারে কারুর সাধ্য নেই ওকে বাঁচাতে পারে। রাগ করলাম ওর এ ধরনের ছেলেমানুষিতে এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজে। এবং ও চলে যাবার সময়, ভালো করে কথা পর্যন্ত বললাম না, আমি এত রেগে গিয়েছিলাম আমাদের অনুরোধ না রাখায়, আমাদের কথা না শোনায়। তারপরেই বাড়ী ফিরে ওর আবার জ্বর এল, যেটা ওর ভাষায় "অনেক দিন পরে জ্বর এল," কারণ ও ধরে নিয়েছিল যে ও সুস্থ হয়ে গেছে ; কিন্তু বারবার এই অবহেলা আর অনিয়ম ওর জীবনীশক্তিকে ক্ষয় করে ফেলছিল, ধ্বংস করে ফেলছিল ওর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা। তাই সম্ভবত এবারের জ্বরে ওর এলো অনুশোচনা, আমাকে লিখলো ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪৬ সালে,

"সেদিন যেমন কারো প্রভাবে বা ইঙ্গিতে প্ররোচিত না হয়েই নিজের বিবেকবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তোকে রাগিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম, আজো তেমনি বিবেকের পাড়নে এখন বাড়িতে বসে রয়েছি, যখন খোকনের ওখানে যাবার কথা।

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক'দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে ওখানে, যার ফলে কাল রাত্তিরে অনেকদিন পরে জ্বর এল। তাই আমাকে এখন সাবধান হতে হবে। ডাক্তারের কথামত পরিপূর্ণ বিশ্রামই আমার দরকার। তাই আবার বন্ধ করে দিলুম সুস্থ লোকের মতো ঘোরাফেরা।

আশা করছি দু'ব্যাপারেই তুই আমাকে নির্দোষ মনে করবি।"

এখানে 'দু'ব্যাপারেই' কথাটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম ব্যাপার হচ্ছে আমার রেগে যাওয়া আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে খোকনের ওখানে চতুর্ভুজের বৈঠকে সুকান্ত হাজির হতে পারবে না। সে ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। কারণ সে অসুস্থ।

আসলে কোন কাজের ভার কারুর ওপর দিয়ে চুপ করে থাকাটা ছিল ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ। যতক্ষণ না সে কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে শান্তি কোথায় ওর। দু'একদিন বাড়ী বসে থাকলেই অনেক কাজ জমে যায়। সেগুলো শেষ

করার জন্য নিজের অপটু শরীরের কথা ভুলে ও আবার বেরিয়ে পড়ে। ফলে বিশ্রামটা কখনও সম্পূর্ণ হয় না।

এসময়ে কিন্তু বাড়ীর অগোছাল ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। কারণ সুশীলদার বিয়ে হয়ে গেছে দু'বছর আগে। নতুন বৌদি এসে সংসারের ভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। সংসারের চারিদিকে এসেছে শ্রী, একটা স্বাভাবিকতা আর বিশেষ করে সবার মনে এসেছে নতুন উদ্যম আর আত্মবিশ্বাস। এখন সুকান্ত পেতে পারে নিয়মিত দরদভরা হাতের পরিবেশন, আশা করতে পারে আন্তরিকতা। এখন বাড়ীতে সময়মত না ফিরলে কখনও কখনও অনুযোগও শুনতে হয় না, এমন নয়। এতে বিশেষ কোন ফল অবশ্য হয় না। কারণ নতুন বৌদি বেলা দেবী মানুষটা খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির আর একটু স্বল্পভাষী। তাই জোর করে কোন কাজের বা অনিয়মের বিরুদ্ধে লড়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আর এ সময়ে সুকান্তর বাইরে বেরিয়ে যাবার নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। সুকান্তর রাস্তামুখী মনকে যেন আর ঘরমুখী করা গেল না। দু'চারদিন বাড়ীতে বাধ্য হয়ে বন্দী থাকলে ওর যেন হাঁপ ধরতো। মন পালাই পালাই করতো।

জ্বর হলে যখন ও বাধ্য হয়ে বাড়ীতে থাকতো, তখন আমরা যেতাম। ভারী খুশি হতো সুকান্ত। কখনও কখনও নিজে অসুস্থ থাকলেও কোকো তৈরী করে খাওয়াতো আমাদের। আর যখন বিশেষ কেউ না থাকতো ওর শয্যাপাশে, তখন নানা ধরনের বই থাকতো। একেবারে চুপচাপ শুয়ে থাকাটা ছিল ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু কবিতা রচনা চলতো সব সময়ে, ও সুস্থই থাক আর জ্বরেই পড়ুক।

ওর জ্বরটা ঘুরে ঘুরে আসছিল বারবার। একেবারে ছেড়ে যাওয়ার ব্যবধানও যেন ক্রমশ কমতে লাগলো। রোগটা যে কি তা যেন একটা বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে আটকে রইলো। সুকান্ত এই কথা লিখেছিল একটা চিঠিতে, ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর নয়। ওকে বড় দুর্বল করে তুলছিল। ক্রমশই ওর জীবনীশক্তির জমার খাতায় খরচ লেখা হচ্ছিল।

এর আগে যে চিঠিখানার কথা উল্লেখ করেছি, তার পরে এমন জ্বরের আসা যাওয়ার মাঝে আরো একটা মাস কেটে গেল।

এবারে ডাক্তারেরা সন্দেহ করলেন সুকান্তর হয়তো টি. বি. হয়েছে। কারণ টি. বি.-র সঙ্গে ওর রোগের বেশ মিল আছে। সুকান্ত আমায় লিখলো ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে একটা চিঠি, "আমার রোগ এমন একটা বিশেষ সন্দেহজনক অবস্থায় পৌঁচেছে, যা শুনলে তুই আবার 'চোখে বিশেষ এক ধরনের ফুল' দেখতে পারিস। ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি। কাজেই আগামী 'চতুর্ভুজ বৈঠক' আমার বাড়িতে বসবে, অরুণের বাড়িতে নয়। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করেছি। তুই শনিবার সোজা আমার বাড়িতেই আসবি।

আর একটা কথা: আমি খোকনকে চিঠি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, রোগের ঝামেলায়; তুই দিয়েছিস তো?"

সুকান্তর এত অসুস্থতার মধ্যেও কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপারে ওর উৎসাহ তখনও যথেষ্ট রয়েছে। শুধু ওর অসুখের জন্য, বাইরে যাবার অক্ষমতায় আসর ওর বাড়ীতে বসবে। গত এক বছর ধরে নানা অসুখে বারবার যখন ও বিছানা নিচ্ছে, তখন এই ধরনের উৎসাহ সম্ভবত কমে যাবার কথা। কিন্তু ওর চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। ও ছিল এমনি প্রাণচঞ্চল, এমনি অধ্যবসায়ী।

যা বলছিলাম। ডাক্তার টি. বি. সন্দেহ করায় বুকের এক্স-রে নেওয়া হল। এবারেও রেড-এইড-কিওর হোম সাহায্য করল। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না, অথচ রোগেরও উপশম হল না। সুশীলদার সন্দেহ গেল না— আবার একখানা এক্স-রে নেওয়া হল, কিন্তু এবারেও পাওয়া গেল না কিছুই।

যেহেতু পেটের গোলমালও ছিল সঙ্গে, তাই বুকের কোন দোষ খুঁজে না পেয়ে ডাক্তাররা পেটের অসুখের চিকিৎসা করছিলেন। আয়রন সমৃদ্ধ ট্যাবলেট খাওয়ান হ'ত ওকে। কিন্তু সে ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ত সুকান্ত। এতো যন্ত্রণা যে এক এক সময়ে তার চোখে জল এসে পড়ত। ওর সামনে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখা বড় কষ্টকর। কিন্তু মনে আমাদের সান্ত্বনা যে, সুকান্ত সেরে উঠবে একটু যদি কষ্ট হয় হোক। তখন তো আমরা জানি না ভুল চিকিৎসা চলছে। কিন্তু রোগ তখনও ধরা পড়ে নি।

কিন্তু ওর এতখানি অসুস্থতার মধ্যেই চলেছে সাহিত্য সাধনা। ছেলেবেলায় ও বহু বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়ে ফেলেছিল। আমরা যখন লাট্টু, ঘুড়ি, গুলি এসব খেলায় মেতে উঠতাম ও তখন কিন্তু ভারী বিরক্ত হত। ও পছন্দ করতো নতুন নতুন রাস্তায় আর পার্কে মাঠে ময়দানে বেড়িয়ে বেড়ান, আর ভালবাসত নদীর বা লেকের ধারে ঘুরতে। আগেই বলেছি ওর ছিল দুরন্ত বই পড়ার নেশা। তাই ওর সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের যোগাযোগ হয়েছিল ভাষান্তরিত অবস্থায়। কিন্তু এখন ইংরাজী মূল সাহিত্যের ওপর ওর ঝোঁক এলো। শুধু পড়া নয় ছোট ছোট ইংরাজী রচনার দিকেও ওর মন গেল। এ সময়ে কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী খুব আসতেন সুকান্তর কাছে। সুকান্ত তখন তাঁর কাছে পাঠ নিতো—বড় বড় ইংরাজ কবির কবিতা আর শেক্সপীয়ারের নাটক এই ছিল পড়বার মূল বিষয়। প্রবল আগ্রহে সুকান্ত এর রস গ্রহণে তখন ব্যস্ত, যদিও সে তখন জ্বরে শয্যাশায়ী এবং মাঝে মাঝে পেটের ব্যথায় কাতর। আমাদের উপন্যাসের শেষ বৈঠক এখানেই হয়েছিল।

সেজমেসোমশাই এ সময় মন স্থির করলেন সুকান্তকে নিয়ে নিজে পুরীতে যাবেন এবং বেশ কিছুদিন ওখানে রেখে পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং চিকিৎসার দ্বারা ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে নিয়ে আসবেন। তাঁর বিশ্বাস এ জ্বর শুধুমাত্র দুর্বলতার জন্য। শুধু সুকান্ত বাইরে যাবার মত আর একটু সুস্থ হলেই তিনি এ কাজে হাত দেবেন বলে স্থির করলেন।

কিন্তু সুকান্তর সুস্থ হবার পথে নানারকম বাধা আসতে লাগলো। কলকাতা তখন আত্মঘাতী দাঙ্গার কবলে পড়ছে বারবার। কলকাতার নানা অংশ, বিশেষ করে বেলেঘাটা তখন ঘন ঘন কারফিউ আওতায় আসছে। কখনও কখনও বিরামহীন ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টা কারফিউ-এর ধাক্কায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন তখন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেখানে স্তব্ধ, সেখানে রোগীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তার কথা দিয়েও সময়মত আসতে পারতেন না, কারফিউ-এর ঝামেলায়। ঠিক তেমনই ওষুধ কেনাও ছিল এক দারুণ সমস্যা। কারণ যে সব ওষুধ ওকে খেতে দেওয়া হত তা সব সময়ে বেলেঘাটায় পাওয়া সম্ভব হতো না। আর

তা ছাড়া কারফিউর পাল্লায় পড়ে দোকানপাটও সব বন্ধ। লোকের রাস্তায় বেরুন তো অসম্ভব। ফলে ঠিকমত দেওয়া যায় না পথ্য এবং বলবর্ধক পানীয়। কারফিউর বাইরে যে সব বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সাহায্য নেওয়া ছাডা আর কোন উপায় ছিল না—এ সব জোগাড করবার জন্য। কিন্তু তাদেরও ত' আসতে হবে কারফিউর ফাঁকে ফাঁকে। এমনি চলছিল। এই পরিস্থিতিতে নতেদা এসে সুকান্তকে শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। কারণ সেখানে কারফিউর ঝামেলা নেই, আর তা ছাড়া সুকান্ত, মেজবৌদি আর পিসীমার সান্নিধ্য আর সেবা পাবে। পাবে আমাদের সাহচর্য—আমি, ঘেলু, রমা আর কখনও বা খোকন। এসে ওর মনের হতাশা কেটে যাবে। সুস্থ হবে সুকান্ত সুচিকিৎসায় আর সুব্যবস্থায়।

সুকান্ত ২০নং নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাডী ছেড়ে শ্যামবাজারে চলে গেল—১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে। ঠিক তারিখটা এখন আর মনে করতে পারি না। সেই তার শেষ যাওয়া—আর ফেরে নি ওখানে কোনদিন।

এখনও বাড়ীখানা একটা বিরাট স্মৃতি নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত পথিক চলছে তার পাশ দিয়ে। যারা সুকান্তর নাম শুনেছে তারা অনেকেই কিন্তু এ বাড়ীটা চেনে না। বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ বাংলায় যাবার মালগাডীর লাইন। তারও কত স্মৃতি মনে মাখানো। ওখানে এই লাইনের ধারে বসে আমি, সুকান্ত, অরুণ আর খোকন ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেছি। কত তুচ্ছ কারণে কখনও আমরা অকারণ পুলকে উল্লসিত হয়েছি, আবার কখনও বা অল্পেই হয়েছি ক্ষুব্ধ। কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে একটার পর একটা সমস্যা—যুদ্ধ, ঝড, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা নানারকম রাজনৈতিক আন্দোলনের বিক্ষোভ। আমরা তার ফাঁকে ফাঁকে এখানে মিলিত হয়েছি, আলোচনা করেছি কত কথা।

এই বাড়ীটার কত কথাই আজ মনে পড়ে। সুশীলদার বিয়ে হয়েছে এ বাড়ীতে। নিরানন্দ পরিবেশে এসেছে আনন্দের জোয়ার। নিষ্প্রদীপ কলকাতায় এ বাড়ীতে আলোর ঝলমলানি।

যেখানে সুকান্তর জন্ম হয়েছিল আমাদের মামাবাড়ীর সেই ৪২নং মহিম

হালদার স্ট্রীটের বাড়ীটা রাস্তা পড়ায় ভেঙে ফেলা হয়েছে ক'দিন আগে। আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি যখন আমাদের মনকে ক'রে রেখেছে ভারাক্রান্ত, তখন এখানে লেখা হচ্ছে নতুন ইতিহাস। ভবিষ্যৎ পৃথিবী জানতেও পারবে না যে, এখানে কবি সুকান্ত তার ছেলেবেলাটা কাটিয়েছিল। সে বাড়ীর আজ আর কোন চিহ্নও রইল না।

কিন্তু যে বাড়ীতে সুকান্ত জীবনের শেষ কটা বছর কাটিয়েছিল, লিখেছিল তার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো, সে বাড়ী আজও ঠিক তেমনি কিছুটা জীর্ণ অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। একে কি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখা যায় না?

ছিলাম বাগবাজারে এখন চলে এসেছি মানিকতলার নজরুল সরণীতে। আমার যাওয়া-আসার পথ নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, তাই এই বাড়ীর কাছ দিয়ে নিত্যই আমাকে চলতে হয়। এই বাড়ীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কথাই না ভাবি, কত স্মৃতিই না আমাকে উতলা ক'রে তোলে, মনে হয় এখনও হয়তো ওপরে গেলে পাব সুকান্তর সহৃদয় অভ্যর্থনা। ওর চোখ নেচে উঠবে পুলকে এখনি, ফিরে পাব আমাদের হারানো দিনগুলো।

সে চলে গেছে। রেখে গেছে আমার জন্য স্মৃতির ভার। কোথায় সে আর কোথায় আমি। জীবনের শুরুতে দু'জনে একসঙ্গে চলতে গিয়ে কখনও কি এমনি পরিণতির কথা ভেবেছিলাম?

শ্যামবাজারে পিসীমার বাড়ীতে সুকান্ত ছিল একতলায় বাইরের ঘরে। সারাদিন ওর কাছে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। তাই সম্ভবত ওকে বাইরের ঘরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরিষ্কার ঝকঝকে বিছানায় কখনও শুয়ে, কখনও বসে বা আধশোয়া অবস্থায় ওকে দেখা যেত। জামা-কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজবৌদির কল্যাণময় স্পর্শ। সারাদিনে নানা কাজের ফাঁকে মেজবৌদি এসে দেখে যেতো। পিসীমা খোঁজ নিতেন বারবার। ওরা রাগ করতেন—এতো লোকজন এলে বিশ্রাম হবে কেমন করে।

আমরাও আসতাম সুকান্তর কাছে রোজই। এই অগণিত দর্শনার্থীর ভীড়ে আমরা যেন কেমন হারিয়ে যাচ্ছিলাম বলে মনে হত। মনে হত সুকান্ত আমাদের চেয়ে কত বড়। জনসাধারণের কত প্রিয়। কখনও কখনও

আমাদের অভিমান হত। ওকে অনেক সময়ে বলেছি, "তুই আর এখন আমাদের সুকান্ত নেই, তুই একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।" ও মৃদু মৃদু হাসতো। এমনও দিন গেছে যে ওর কাছে এসেও ওর সঙ্গে কথা বলা হয় নি। রাত্রির দিকে অবশ্য সুকান্তর ঘরে ঘরোয়া আসর বসত। তখন মেজবৌদি, রমা, পিসীমা, ছোটবৌদি—এরা ছাড়াও মেজদা এবং নতেদা বাড়ী ফিরে আসতো এবং এই আসরে যোগ দিত। তখন কত হাসির কথা, মজাদার গল্প আর নানারকম আলোচনা হত। সুকান্তর দিনগুলো এখানে আনন্দময় পরিবেশে বেশ ভালই কাটছিল।

মেজদার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অগণিত। বাস্তবিক, মেজদা যেমন আমাদের মধ্যে তেমনি তার বন্ধুমহলেও খুবই প্রিয়। মেজদা ব্যবস্থা করলেন তার বন্ধুবান্ধব আর চিকিৎসকদের দিয়ে সুকান্তকে পরীক্ষা করবার। রোগ তখনও ঠিকমত ধরা পড়ে নি। মাঝে মাঝে জ্বর হয়, পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা—এই সব হচ্ছে উপসর্গ। এর ফল হিসাবে সুকান্ত তখন খুবই দুর্বল। ডাক্তার রাম অধিকারী এবং ডাক্তার তাপস বোস এই দুজন প্রখ্যাত চিকিৎসক সুকান্তকে পরীক্ষা করেছিলেন।

এতোদিনে ধরা পড়লো সুকান্তর রোগ—ইনটেস্টিনাল টি. বি.। সমস্ত অন্তর আমাদের হায় হায় করে উঠলো। এতদিন ওর অসুখটাকে আমরা সাধারণ পেটের পীড়া বা দুর্বলতা-জনিত জ্বর বলে মনে করেছিলাম, ভাবছিলাম একটু ভালোমত চিকিৎসা আর বিশ্রাম ওকে সুস্থ করে তুলবে। আরও ভেবেছিলাম—সুকান্ত এতদিনে ওর নিজের শরীরের প্রতি অবহেলার ফল বুঝতে পেরেছে এবং তাই আমরা নিশ্চিত ছিলাম এবারে সেরে উঠলে, সুকান্ত আর হাঁটাহাঁটি, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর খাওয়া-দাওয়ায় অবহেলা করবে না। বাড়ীর হালকা আবহাওয়াটা যেন ভারী হয়ে উঠলো। সবাই শুনে চিন্তিত হল, সুকান্ত পড়েছে মারাত্মক রোগের কবলে। আড়ালে আড়ালে গুরুজনদের ফিসফিসানি যেন আমাদের আরও শঙ্কিত করে তুললো।

শুরু হল সুকান্তকে যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে পাঠানোর তোড়জোড় আর চেষ্টা। সুকান্ত শুনল তার রোগের কথা। কিন্তু ব্যাপারটাকে ও খুব সহজভাবেই গ্রহণ করলো।

আমাদের উপন্যাসখানা নাড়াচাড়া ক'রে একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ দেখিয়ে বললো—"উপন্যাসটা ইচ্ছে করলে এখানেই শেষ করা যায়।" ও বললো যদি আমরা চাই তো তখনই ও সেটা কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারে। আমি যখন বললাম—'সে, ব্যস্ত হবার কি আছে?' তখন ও একটু চিন্তা করে বললো, 'আচ্ছা তবে থাক; সুস্থ হয়ে ফিরে এসে যা হয় করা যাবে। তখন ঘষে মেজে কোন পত্রিকাতে দিলেই হবে।'

সুকান্তর অসুখের খবর দেশে আনলো প্রবল আলোড়ন। বন্ধু-বান্ধবদের যাওয়া-আসা আরও বেড়ে গেল। বেড়ে গেল চিঠিপত্র আসা। মেজবৌদির কড়া নজর এড়িয়ে সুকান্ত দু'চারখানা চিঠির জবাব তখনও লিখেছে, অনেকেই তখন সুকান্তর জন্যে আনতো নানা রকম উপহার। সুকান্ত ফুল ভালবাসত, তাই অনেকেই নিয়ে আসতো ফুল।

মেজদার চেষ্টা এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় সুকান্তকে পাঠান হল যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে। এখানে L. M. H. Block-এর এক নম্বর বেডে সুকান্ত আশ্রয় নিল। তারিখটা আমার মনে পড়ে না, তবে এটা ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ।

কথা হল এখানে একটু সুস্থ হলে সুকান্তকে পাঠানো হবে আজমীরের স্যানিটোরিয়ামে। চেষ্টা চলতে লাগলো যাতে ওখানে একটা শয্যার ব্যবস্থা করা যায়।

হঠাৎ ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর সীমানা পেরিয়ে সুকান্ত যেন এক বৃহৎ জনতার সংসারের একজন হয়ে গেল। আমরা ছাড়াও সুকান্তকে নিয়ে অনেকেই চিন্তা করতে শুরু করলো, আসতে লাগলো অনেক সাহায্য আর সহযোগিতা। কবি-অনুজ অশোক তার 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লিখেছে: "সুকান্তর অসুখের খবরে সাড়া জাগলো—কবিকে বাঁচাতে হবে। এ ব্যাপারে অগ্রণী হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী অলকা উকিলের সহযোগিতায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের (মিত্র) সাহায্যে টাকা তুলতেও দেরি হল না তাঁর। বিলম্বে হলেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফ্‌ফর আহমদ ও অন্যান্যরা সুকান্তর চিকিৎসার কথা ভাবতে

শুরু করেছিলেন তখন—চেষ্টা চলছিল তাঁকে আজমীড়ের একটা স্যানিটো-রিয়ামে পাঠানোর।

সুকান্তর অসুখ বাংলা দেশের সুধীজনদের কতখানি উদ্বিগ্ন করেছিল তা অনুমান করা যায় বিষ্ণু দে-র লেখার এই উদ্ধৃতিটুকু থেকে: '...তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালুম সুকান্তর অসুখের কথা, অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না শুনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়ে টাকা তোলার কথা বললেন। যামিনী রায় মহাশয় বললেন, ডাক্তার রাম অধিকারীকে নিয়ে যাবেন......। সুকান্তর কথা বলতে গিয়ে যামিনীদা বলে উঠলেন, ওর মতো ছেলেরা সব বাংলা দেশে মরে যাবে, তবে যদি দেশের লোকের যন্ত্রণা কাজে পরিণত হয়। আমাদের উচিত ওকে বাঁচানো, কিন্তু ওরা সব মরে গিয়ে যদি দেশকে বাঁচায়।...'

শ্যামবাজারে ডাক্তার রাম অধিকারী সুকান্তকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন ডাক্তার তাপস বোস। সেখানে সুকান্ত ছিলেন তাঁর মেজদা রাখাল ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে, মেজবৌদির শুশ্রূষাধীন। এখানেও বন্ধুবান্ধবদের অনেকে দেখে যেতেন তাঁকে, চিঠিতে জানাতেন শুভেচ্ছা। ছাত্রনেত্রী অলকা মজুমদার উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন একটি দামী কলম, রমাকৃষ্ণ মৈত্র দিয়েছিলেন লুই আরাগঁ-র ইংরেজিতে সদ্য প্রকাশিত কবিতা ও অন্যান্য রচনার একটি সংকলন। রাশিয়ার এক যুব-প্রতিনিধি দলের নেতা ওলগা জেৎচেৎকিনা এসে দেখা করেছিলেন সুকান্তর সঙ্গে। দেশে ফিরে ওলগা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে বই লেখেন তার একটি অধ্যায় জুড়ে আছে সুকান্তর কথা।......

...সেই তরুণ বয়সে দুরন্ত ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামরত সুকান্তর সব থেকে বড় সান্ত্বনা ছিল দেশের লোকের ভালবাসা। সুকান্তকে জীবনের আশ্বাস দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকেই। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কবিতা লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার:

'আমরা চাঁদা তুলে মারবো সব কীট;
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।

বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ ?
কে গাইয়ে জয়গান ?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত।'

হঠাৎ চারদিক থেকেই স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিলেন সুকান্ত। পৃথিবীর নানা ভাষায় তখন তাঁর কবিতা ছাপা হচ্ছে। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত আধুনিক বাংলা কবিতার ইংরেজি সংকলনে কনিষ্ঠ কবি হয়েও স্থান পেয়েছেন তিনি। 'দি বুকম্যান' প্রকাশনী থেকে তাঁর প্রথম কবিতার বইও ছাপা হচ্ছে দ্রুত-তালে। চারজন বিশিষ্ট কবির একটি ছড়ার সংকলন 'ঘুমতাড়ানী ছড়া'র জন্য সুকান্তর লেখা নিয়েছেন 'ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস'।"

হাসপাতালে দুটি সমস্যা আমাদের চিন্তিত করে তুললো। প্রথমটা হচ্ছে সেবা-যত্নের অভাব, যদিও সুকান্ত পেয়িং বেডের রোগী ; কিন্তু তার দিকে নজর দেবার অবকাশ কোথায় ডাক্তার, নার্স আর জমাদারদের। সব হাসপাতালে যা হয়, এখানেও তার অন্যথা হল না। পয়সা ছাড়া এরা বোধহয় আর কিছু জানে না, চেনে না। ডাক্তার ভালো করে সময় দেয় না—রোগীর অবস্থা জানবার, নার্সরাও করে অবহেলা—আর হাসপাতালের বেড প্যান নাড়াচাড়া করে জমাদাররা চড়া বকশিশের জোরে। বাড়ীর সুস্থ পরিবেশ আর মেজবৌদি, পিসীমার শুশ্রূষা এখানে কি করে আশা করা যাবে ? পাছে সুকান্তকে আরও কষ্ট দেয়, এই অবহেলার কথা বলাও যাচ্ছিল না জোর করে। শুধু মাঝে মাঝে এদের হাতে পয়সা গুঁজে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না মেসোমশাই, মেজদা আর সুশীলদাদের।

আর দ্বিতীয় সমস্যা হল—সুকান্তর পেটটা কিছুতেই ধরছিল না—তাই যখন প্রভূত পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার দরকার, তখন কোন রকম বলকারক খাদ্য বা পানীয় দেওয়া যাচ্ছিল না, কারণ তাতে পেট খারাপ হচ্ছিল বারবার।

এই সব কারণে আর বিশেষ করে শ্যামবাজারের সেই আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশ থেকে বাইরে আনায় সুকান্তর অসুখ এখানে এসে বেড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে আর উঠতেই পারছিল না। অতি দ্রুত তার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু সুকান্তর মনের জোর এতে এতটুকু কমে নি, আত্মসম্মানবোধ তখনও সমান রয়েছে। এই সময়ে স্বাধীনতা পত্রিকায় একটা আবেদন বেরিয়েছিল সুকান্তর রোগের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে। এত রোগের মধ্যেও সুকান্তর স্বাধীনতা পড়ায় বিরাম ছিল না। এই আবেদন পড়ে সুকান্ত খুবই অসন্তুষ্ট আর ক্ষুব্ধ হল। তার রাগ কিছুতেই পড়ে না। যখন স্বাধীনতার তরফ থেকে তাকে আশ্বাস দেওয়া হল যে কবির নামে বেশী করে যে অর্থ সাহায্য আসবে তা দিয়ে পার্টির অন্যান্য রোগীদের সাহায্য করা হবে, তখন কবি খুশি হল। সুকান্তর ম্লান পাণ্ডুর মুখে দেখা গেল সুমধুর হাসি।

যে সুকান্ত চিরজীবন নিজের সম্বন্ধে এত অবহেলা করেছে, যার মনের ইচ্ছা বা বাসনা ছিল চিরকাল অজানা, সে যেন এখানে এসে এই অবহেলা আর অনাদরে অতিমাত্রায় ব্যথিত হয়েছিল। তাই প্রকাশ করেছিল তার অন্তিম বাসনা।

জেঠিমাকে অর্থাৎ আমার পিসীমাকে যাদবপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে তার দেখাশুনো আর সেবা যত্নের জন্য। চেষ্টা চলতে লাগলো কেবিন ভাড়া পাবার। পিসীমা একদিকে যেমন ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা, তেমনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের স্ত্রী। আজীবন তিনি পরম নিষ্ঠাভরে পূজা-অর্চনার মধ্যে কাটিয়েছেন। মাতৃহীন কবি সুকান্তর প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তাই যেইমাত্র তিনি জানলেন সুকান্তর বাসনা—নিজের শত কাজ, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা (বিশেষ করে পূজা-অর্চনার ব্যাপার, কারণ হাসপাতালের পরিবেশে এসব কাজ সম্ভব নয়) বর্জন করে তিনি মন স্থির করলেন, তিনি যাবেন—সুকান্তর কাছে থাকবেন, দেখবেন তাকে, সেবা করবেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্তি দেবেন সুকান্তকে। মেজবৌদির পক্ষে সংসার ছেড়ে বাইরে গিয়ে

থাকা সম্ভব নয়। তবু মেজবৌদিও মনে মনে ঠিক করলো, কেবিন ভাড়া নিলে সেও যাবে, থাকবে বেশীক্ষণ সুকান্তর কাছে; কারণ হাসপাতালের রোগীদর্শনের বাঁধা সময়ে অসুস্থ কবির সঙ্গে কটা কথাই বা বলা যায়।

বাস্তবিক এ এক সমস্যা। আমাদের থাকা ছিল অল্প-সময়ের জন্য। হাসপাতালের নিরানন্দ আর নীরস করুণ পরিবেশে আমাদের উপস্থিতিতে কবির মনে যে আনন্দ সৃষ্টি হত তার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিক। এতে যেমন তার তৃপ্তি ছিল না, তেমনি ছিল না আমাদের শান্তি। কিন্তু হাসপাতালের নিয়ম মেনে চলাই ছিল যুক্তিযুক্ত। দর্শনার্থীরা অবশ্য বেশী কথা সুকান্তকে বলতে মানা করত আর সুকান্তর বিছানার চারপাশে ভীড় করে ঘিরে মৃদুমন্দ আলোচনা করত। তাদের সে সব কথায় মাঝে মাঝে কবির ম্লান কাতর মুখে কখনও কখনও হাসির ঈষৎ রেখা ফুটে উঠতো।

কখনও কখনও এ. পি. দেওয়া হত। তখন সৃষ্টি হত এক বিচিত্র পরিবেশের। কারণ এ. পি. দিলে রোগীর কথা বলা ছিল নিষিদ্ধ।

এমনি একটা দিনে সুকান্তর মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে শেষবারের মত গেলুম আমি, সঙ্গে খোকন। সেদিনের স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিল সে—আমাদের দেখে অতি ক্ষীণ হেসে উঠে বসলো। ওর চিরোজ্জ্বল চোখ দুটো যেন আর তেমনি করে নাচলো না—চোখের উজ্জ্বলতা যেন খানিকটা নিষ্প্রভ বলে মনে হল। কোন কথা হল না—আমাদের সঙ্গে কোন কথা হল না কবির। কারণ এ. পি. দেওয়া হয়েছে। একটা কাগজে লিখে জানালো, তাকে এ. পি. দেওয়া হয়েছে, কথা বলা বারণ।

আমাদের তিনটি হৃদয় কাছাকাছি রয়েছি; কিন্তু কথা নেই কারুর সঙ্গে কারুর, চুপচাপ আমরা পরস্পরকে দেখছি। আমরা দেখছি কবিকে, তার চেহারার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছি রোগের গভীরতা আর রোগীর অবস্থা। আর রোগী তার মনের গভীরতা নিয়ে আমাদের চোখের চাহনীর মধ্যে যেন খুঁজছে, বুঝবার চেষ্টা করছে তার তখনকার অবস্থা। একটু আগে ওকে আমরা ধরে শুইয়ে দিয়েছি। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি আর ভাবছি কত কৃশ হয়ে গেছে কবি, কত ছোট

দেখাচ্ছে তাকে বিছানায়। কিন্তু আশ্চর্য ওর প্রাণ-প্রাচুর্য, চোখেমুখে কাতরতাকে যেন ও প্রাণপণে সরিয়ে রাখতে চাইছে। চোখমুখের স্বাভাবিক হাসিতে যেন বোঝাতে চাইছে,

"এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে।"

আমার হাতে এগিয়ে দিল তার যে প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তার কয়েকটি ফর্মা। সাদা পুরু কাগজে কালো ছাপা অক্ষরে আবিষ্কার করলাম আমার চেনা অনেক কবিতাকে। 'বুকম্যান' এই বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল। এটাই কবির প্রথম কবিতার বই—'ছাড়পত্র'। যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলাম। এবারে খোকনের হাতে এগিয়ে দিলাম এই ফর্মাগুলো। খোকন কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ফেরৎ দিল। আমাদের আলোচনা চললো—এক তরফাভাবে আমি আর খোকন ওর সঙ্গে কথা বলে চলেছি—আর ও শুধুই শ্রোতা। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটা কথার উত্তর দিচ্ছে, সামনে রাখা কাগজ-পেন্সিলের মাধ্যমে। এক সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমরা দু'জনে আবার দু-এক দিনের মধ্যে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

বাড়ীর বড়দের মুখে তখন একই আলোচনা। যদি সুকান্তর পেটটা একটু ধরানো যেত তবে চিকিৎসাটা ঠিকমত করা যেত—এই নাকি চিকিৎসক-দের অভিমত। বাইরে দিয়ে খাওয়ানো যখন অসম্ভব হল, তখন গ্লুকোজ ইঞ্জেকৃশন দেওয়া হোল। এই রোগা শরীরে ফোঁড় ফাড়িতে কবির কষ্ট যেন আরও বেড়ে গেল।

চিকিৎসা বিজ্ঞান এদেশে তখনও যথেষ্ট উন্নত হয় নি, প্রচলিত হয় নি বর্তমানের কয়েকটা বাঘা বাঘা ওষুধ। তাই পেটের গোলমাল কবিকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলছিল।

কিন্তু যে কবি সবার মনে যুগিয়েছে সাহস—দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষকে শুনিয়েছে আশ্বাস আর লড়াই করে বাঁচার অনুপ্রেরণা—তার তো ভেঙে পড়লে চলবে না। রোগীকে আমরা কি সান্ত্বনা দেব? রোগী নিজেই নিজেকে তৈরী করেছে কঠিন লড়াইয়ের জন্য; মনে আছে দুরন্ত আত্ম-

বিশ্বাস আর বাঁচবার বাসনা। আর তা ছাড়া গত প্রায় দু-বছর ধরে বারবার অসুখে পড়ে ওর মন থেকে যেন আগের ভয়টাও কেটে গেছে। তাই বাঁচবার দুরন্ত বাসনায় সে লড়াই করে চলেছে। মৃত্যুর এক দিন আগেও তাকে দেখে মনে হয় নি যে, সে আর বাঁচবে না। আগের বিকেলেও তার বাড়ী থেকে সুশীলদা এবং অন্যান্য ভাইরা গেছে, দেখা করে এসেছে তার সঙ্গে যথা নিয়মে। সুকান্তও যথারীতি ওদের কথার জবাব দিয়েছে, কথা বলেছে স্বাভাবিক উৎসাহে, খবর নিয়েছে সবার।

১৩৫৪ সালের ২৯ শে বৈশাখ, ঘেলু আমার অফিসে ফোন করে দিল চরম দুঃসংবাদ—সুকান্ত আজ সকালে এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ওকে বললাম যে মাত্র দু'দিন আগে আমি আর খোকন গিয়েছিলাম সুকান্তর কাছে, তখন তো একথা একবারও মনে হয় নি যে সুকান্তর জীবনের শেষ দিন এত কাছে এসে গেছে।

সুকান্ত লোকজন ভালবাসত। সে ছিল ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু হাসপাতালে যখন তার চরম সংকট ঘনিয়ে এসেছে, তখন কেউ ছিল না তার পাশে। সকালের দিকে তাকে মৃত বলে আবিষ্কার করা হয়েছে।

মার কাছে শুনেছি, আমার সেজমাসীমা সুকান্তকে তার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসতো। তাই মার বিশ্বাস সেজমাসীমাই সুকান্তকে তার কাছে টেনে নিল।

কথাটাকে ঠিকমত বিশ্বাস না করলেও মনটাকে বড় নাড়া দিয়ে যায়; কিন্তু ভাবি সুকান্তকে আমরা তো কম ভালবাসি নি—তবে আমাদের মায়ার বন্ধন সে কেমন করে ছিন্ন করলো?

সুকান্তর স্বীকৃত কবি প্রতিভা আর অকাল মৃত্যু তাকে দিয়ে গেল অসাধারণ জনপ্রিয়তা। বিদ্যুতের মত ক্ষণিকের দর্শনে সবাই যেন স্তব্ধ, বিহ্বল।

আমার জন্য সে রেখে গেছে তার শুভেচ্ছা তাই নিয়ে আমি আমার স্মৃতি রোমন্থন করি। কখনও আবেগে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, বন্ধু-হারানোর বেদনায় আনমনা হয়ে উঠি, আবার কখনও বা হতাশায় ভেঙে পড়ি। আমার মনের মধ্যে সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মত মাঝে মাঝে বেজে ওঠে সুকান্তর শুভেচ্ছার কথাকটি:

‘সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা ,
তবু তোব বঙচঙে সুমধুব চিঠিব জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তেব প্লাবনে
যদিও সর্বদা তোব শুভ আমি চাই মনে মনে,
তবুও নতুন ক’রে আজ চাই তোর শান্তিসুখ,
মনের আঁধারে তোর শত শত প্রদীপ জ্বলুক ।’

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	বর্তমান পাঠ	শুদ্ধপাঠ
৪৪	৫	ভাব	সুকান্তর
৭৮	৯	কাজী নজরুল ইসলাম	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
১৪৪	৯-১০	পারমিট লাভের আশায	লাভের আশায়
১৪৬	৪	Buffle-wall	Baffle-wall
১৭৫	১২	ঝড় থাকলে	ঝড় থামলে
১৯০	৪	বলেছেন	বলেছে
১৯৪	২	মেজমাসিমার	সেজমাসিমার
১৯৫	১৩	মনে ছিল কিনা	মনে ছিল কিনা সন্দেহ
১৯৮	৮	বললাম সে ব্যস্ত	বললাম, সে, 'ব্যস্ত